



# ଅବନ୍ୟ-କୁହେଲୀ



ଶ୍ରୀଦଶଲୀପଦ ଘଟକ

ମୁଦ୍ରଣକ ପ୍ରକାଶନୀ

୧୦୬, ବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଶ୍ରୀ. କଟକାତା

# ঐশ্বর্যী তৃপ্তি দেবী

২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

।

প্রথম মুদ্রণ

মহালয়া

১৩৫৬

মূল্য চার টাকা

প্রকাশিকা—

ঐশ্বর্যী তৃপ্তি দেবী

ভারত বুক এজেন্সি

২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা

মুদ্রা

ঐগোরচ

নিউ মহাম

৬৫৭, ক

কটি

দ্বিতীয় সাহিত্যিক

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ( ক্যাক্টাব্ )

শ্রীচরণকমলেশ

যে স্বপ্ন ছিলো মোর মানসের কুহেলিকাতে

আরণ্যকের অন্তরালে,

হে গুণি, তোমার রসিকচিত্র-আলোকপাতে

সেই স্বপ্নের দীপ জ্বালালে ।

রসের স্রষ্টা, রসিকবন্ধু, তোমার হাতে .

দিলাম এ দীপ সমর্পিয়া ;

আমার মনের পুষ্পাঞ্জলি দিলাম সাথে,

দিলাম আমার মুগ্ধ হিয়া ॥

সেইধর

কালীপদ





মানুষের জীবনে প্রেম শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, পরমার্থ লাভের পথও। সভ্যতার আলোকে বা অসভ্যতার অন্ধকারে, নাগরিক বিলাসে বা আরণ্যক আবাসে প্রেম অবাধগতি; কিন্তু মানুষের আচারগত আইন আর হৃদয়গত বৃত্তিতে যে বিরোধ, তার সুনিপুণ অভিব্যক্তিই সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য সামগ্রী।

ভারতীয় উপক্ৰাস 'অরণ্য কুহেলী' আরণ্যক অধিবাসীদের প্রেমজীবনের সেই সংঘাত-আলেখ্য;—হিংসা-দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে প্রেমের বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা,—মানুষের অন্তর-মহাস্রোতের অবিদ্যমান ইঙ্গিত।

## এক

শাঁওতাল পাড়ার সর্দার রাবণ মাঝি, তার মেয়ের বিয়ে। সাত-  
গানের হলোড় পড়ে গেছে আজ ক'দিন থেকে, সারা পাড়া বিয়ের  
অনন্দে মেতে উঠেছে। আঁটা অবস্থা রাবণ মাঝির, দস্তুর মত জমি-  
জমার নালিক; তার উপর সে রামপুর মৌজার 'প্রধান'; মস্তাজীরিসঙ্গে  
যে কয়েক বিঘা জেলজমি এরা তিনপুরুষ ধরে ভোগ ক'রে আসছে  
তারও আর বড় কম নয়। খাঁটা লোক এই রাবণ মাঝি, শাঁওতাল  
হলে যথেষ্ট তার নাম ডাক আছে, ছ' পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তাদের  
নাড়ল বলে রাবণ মাঝিকে নাগ ক'রে চলে। তারই মেয়ের বিয়ে,  
দাঁকজনক একটু হবে বৈকি! মেয়ের বিয়ের চূড়ান্ত আয়োজন করেছে  
রাবণ। আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই, জীবনের যা-কিছু সখ-আহ্লাদ—  
—কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা—একমাত্র ওই মেয়েটাকে নিয়েই। তার  
যে কি যা-তা ক'রে সেরে দেওয়া চলে!—নিম্নের কাজ রাবণ মাঝি  
রে না।

জাতি-কুটুম্ব যে যেখানে ছিলো সব্বাক্ষেই যথারীতি নিমন্ত্রণ ক'রে  
জে গিয়ে তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে' কয়েকদিনের জন্ত ধরে' নিয়ে  
সঙ্গে রাবণ মাঝি, বাদ দেয়নি সে কাউকেই। রাবণ মাঝির ঘর-বার

গম্ গম্ করছে লোকের ভিড়ে। পাড়া-প্রতিবেশী মাঝি-মোষেনের দল মজলিস জমিয়েছে বিয়ে-ঘরে এসে; নাচগান আর হাড়িয়া \* চলছে পুরাদমে। লোকজনের হাঁক ডাক, নাচগানের সোরগোল, আর বরকারি বাজনার শব্দে সাঁওতালপাড়া আজ গুলজার।

বরপক্ষ এসে পৌঁছে গেছে সময় থাকতে। গাঁয়ের বাইরে প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় ছুপুর বেলা থেকেই আস্তানা গেড়েছে এসে বরিয়াতের † দল। সন্ধ্যার আগে তাদের গাঁ ঢুকবার নিয়ম নাই, কেনেবাড়ীর জলসওয়া শেষ হলে তবে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হবে; সে পর্যন্ত বরপক্ষকে গাঁয়ের বাইরে অপেক্ষা ক'রে থাকতেই হবে। অবশ্য বরযাত্রীদের রীতিনীতি ভোজের আয়োজন ক'রে দিয়েছে রাবণ মাঝি, কলমকাঠি চালের ভাত—তরি-তরকারি রন্ধন পেঁয়াজ—আর সেই সঙ্গে গোটাটিনেক খাসিকরা তাজা শ্যোর। হাঁড়া হাঁড়া পচুই মদ ঘাসমনয়ে পৌঁছে গেছে বরিয়াতদের ডেরায়। কুড়ি-চারেক বরযাত্রী স্তূতির নেশায় মশগুল হয়ে চারদিক থেকে বরকে ওরা ঘিরে রেখেছে। বটতলার রীতিনীতি হলো চলছে ছুপুর থেকেই, মাঝে মাঝে বাজনা বাজছে জোর শব্দে—মাদল, লাগরা, জয়ঢাক, চড়পটি, রামসিঁটা, মদনভেড় ‡। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ হাত পা নেড়ে বাজনার বোল আউড়ে যাচ্ছে মুখে মুখে, কেউ কেউ বা অতিরিক্ত নেশা ক'রে মাতাল হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বরকর্তা চাঁদরায় মাঝি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বরযাত্রীদের—এবার তাদের তৈরি হতে হবে, বিয়ের 'লগন' কাছিয়ে আসছে।

\* হাড়িয়া—পচুই মদ।

† বরিয়াত—বরযাত্রী।

‡ মদনভেড়—একরকমের বৃহদাকার ভেঁপু।

চৈত্রেয় সন্ধ্যা। 'সুখব বাহা' \* বহুক্ষণ ঢলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশ  
বেয়ে; দূরে ওই ঝাঁটপাহাড়ের আড়াল থেকে ফাঁকে ফাঁকে উকি  
মারছে তার রোশনাই ঝিলিক। পাহাড়ের চূড়াগুলো কে'দেন সিন্দুর  
দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে। মল্ল ফুলের গন্ধ মেখে ফুর ফুর ক'রে বয়ে  
যাচ্ছে চৈতালী মিঠে হাওয়া।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, সময়টি বড় ননোরম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে যে ছোট  
নদীটা কালো পাথরের চাতাল ভেঙ্গে ঝির ঝির ক'রে বয়ে গেছে  
একেবারে কাটি-জঙ্গলের গা বেঁবে,—তারই কিনার থেকে একটানা  
নাদলের শব্দ ভেসে আসছে তালে তালে যেন তাল দিয়ে,—দিং দাহাতাং  
—দিং দাহাতাং—হিঁ তাড় দিং দাহাতাং....

কনেবাড়ী থেকে মেয়েরা সব জল সহিতে গেছে নদীধারের টেঁড়াধূলে।†  
নানাবয়সী শাঁওতালদের নেয়ে,—ভিড় ক'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সব  
ছোট নদীর শুকনো বালির বুকে; অসংখ্য তাদের পায়ের দাগ ধাবড়  
হয়ে ফুটে উঠেছে শাদা ধপ্পে বালির উপর। মেয়েদের আহোদ-  
আহ্লাদ আর হাসি-খুশিতে নদীর ঘাট কলমুখর। মহা আনন্দে চলছে  
তাদের 'দা-বাপলা'‡ উৎসব। মেয়েদের আজ সাজসজ্জাই কত। পরনে  
ওদের হলুদ রঙের শাড়ী, খোঁপায় গোঁজা হরেক রঙের ফুল, গোখে  
কাজল, কপাল ভরা লাল সিন্দুরের টিপ। হাসি যেন ঠোটে ওদের  
লেগেই আছে। বিশেষতঃ ওই লজ্জাভীক কোনলম্বভাব তরুণ বয়সী  
শাঁওতালীনের দল, পাহাড়ী দেশের মুন্সিমতী বাহুকরী এয়া; সেখে

\* সুখব বাহা—সুখ্যাদেব।

† টেঁড়া—নাচে থেকে উপরে জল তুলবার জন্য লোহার তৈরী পাত্র।

‡ টেঁড়াধূল—জল সরবরাহের জন্য তৈরী ছোট খাল।

§ দা-বাপলা—জল সওয়া।

শ্রীকালীপদ ঘটক



এদের মায়া, বুকে এদের মধু। এরা জানে মনের কোণে হৃদয়কে  
কেমন ক'রে জ্বিয়ে রাখতে হয়, এরাই জানে কিসের জোরে আনন্দকে  
আলো-হাওয়া-ফুলের মতই চারদিক থেকে অনায়াসে লুটে নেওয়া যায়।  
এদের দেখে মনে হয় যেন দুঃখ এদের জীবন থেকে বাতিল।

বর্ষীয়সী একটি মেঝেন, তরুণীদের তাড়া দিয়ে বললে,—চটপট  
এবার 'দা-বাপলা' শেষ করতে হবে। এখানকার স্ত্রী-আচার শেষ না  
হলে বর-কনের বিয়েই হবে না। অঙ্ককার ঘনিয়ে আসবার আগেই  
মাড়োয়ার \* তাদের ফিরতে হবে। বরিয়াতদের বাজনার শব্দ শুনতে  
পাওয়া যাচ্ছে, ওরাও হয়ত তৈরী হয়ে গেছে এর মধ্যে।

'দা-বাপলা' শেষ ক'রে 'দংসিরিং' † গাইতে গাইতে মেঝেনের দল  
নদীধার থেকে ধীরে ধীরে গায়ের দিকে এগিয়ে চললো। মধ্য  
ভোমগুলো আর একবার জয়টাকে কাঠি দিলে জোর, একজোড়া। রানসিগা  
আর গোটাকয়েক মদনভেড় জোরশব্দে একসঙ্গে বেজে উঠলো,  
—ভে—ভে—ভুর্-বু-বু—।

।

গাঁবাইরে বটগাছের তলায় বর তখন গা-বাড়া দিয়ে পালকীর উপর  
উঠে বসেছে।

রাবণ মাঝি অত্যন্ত বাস্তব। একমাত্র মেয়ে তার ছুলালী, আজ তার  
বিয়ে। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, বয়স এখন আঠারো। রূপ আর স্বাস্থ্য  
কানায় কানায় ভরে উঠেছে ছুলালীর সারা অঙ্গ বেয়ে। দস্তুরমত খরচ  
খরচা ক'রে ভাল ঘরে ভাল বর ছুলালীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে রাবণ

\* মাড়োয়া—ছাঁদনাতলা।

† দংসিরিং—বিয়ের গান।

মাঝি, যেহে তার স্বখে থাকবে। বিয়ের লগন ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে, সজাগ হয়ে উঠলো রাবণ মাঝি; বরিয়াতদের স্বরে তুলিতে হবে।

জল সয়ে এয়োরা সব বাড়ী ফিরছে। রাবণ মাঝি সদর দোরে দাড়িয়ে জোরে একটা হাঁক দিলে,—কিষ্টু—হেই কিষ্টু !

কিষ্টু মাঝি রাবণেরই প্রতিবেশী, রাবণ মাঝির একান্ত অন্তঃগত। চুটি খেতে খেতে পাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো কিষ্টু। রাবণ মাঝি বললে,—শীগুগির যা দেখি, বরিয়াতদের এগিয়ে নিয়ে আয়, কুলিমুড়ায় খেল করবার ব্যবস্থা কর এবার। তীর, ধলুক, ঢাল, তরোয়াল পাঠি-সোটা ঠিক আছে ত সব ?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—সবই ঠিক আছে সদ্ধার, আমি শুধু একটা কথা ভাবছি,—ওরা যদি সত্যি সত্যি এসে পড়ে---

রাবণ মাঝি বললে,—ওরা কারা ? ভালুকপোতার লোক ? তাদের ত আমি জবাব দিয়েছি—ভালুকপোতায় বেটীর বিয়ে আমি দিব না।

কিষ্টু মাঝি বললে,—ওরা কিন্তু বলে সদ্ধার, আগে নাকি ওইখানেই বিয়ের কথা হয়েছিলো, দুলালী তখন ছোট। তোর স্বপ্নের নাকি নিজে ওদের কথা দিয়েছিলো।

রাবণ মাঝি জবাব দিলে,—বিলকুল সব বাজে কথা, আমি ওসব মানি না। সকালবেলা আজ ভালুকপোতার লোককে আমি জানিয়ে দিয়েছি—এ-বিয়ে আমি বন্ধ করতে পারি না। তুই যা—বরিয়াতদের এগিয়ে নিয়ে আয়।

কিষ্টু মাঝি একটু চিন্তিতভাবে বললে,—আমি খবর পেলুম সদ্ধার, বিয়ে বন্ধ না করলে ওরা নাকি বথেড়া করবে।

রাবণ নাকির ভ্রতু'টো কুক্ষিত হয়ে উঠলো, বললে,—বখেড়া! তুই ক্ষেপে গেলে নাকি কিষ্টু, রাবণ নাকির সামনে এসে বখেড়া করবে কোন্ বেটা?

কিষ্টু নাকি মাথা চুলকে বললে,—কিন্তু সদার, উত্তাজ টুয়াই নাকি লোকটা ভয়ানক একরোখা, ইস্তক সে দাবি ক'রে আসছে তার নাতির বিয়ের কথাবার্তা নাকি এইখানেই ঠিক হয়ে আছে তেরদিন আগে থেকে; এই কথাটাই জোর গলায় সে গেয়ে বেড়াচ্ছে আর পাঁচজনের কাছে।

রাবণ নাকি হো হো ক'রে হেসে উঠলো, বললে,—টুয়াই নাকি—কিষ্টুকেই উত্তাজ টুয়াই নাকি! কিন্তু কোনো জোরই খাটবে না তার রাবণ নাকির কাছে; আমাকে সে ভালরকমই চেনে। যা তুই—সে-সব আমি বুঝবো এখন, বরিয়াতনের ঘরে তোলা এনে।

মেয়েরা সব নদীধার থেকে জল নইতে সইতে এসে গা ঢুকলো। সরিয়াত বা কন্তাপক্ষের আরও কতকগুলি নাকি-নেবেন ঢাল, তরোয়াল, তীর, ধনুক, লাঠি, বর্শা হাতে নিয়ে 'দা-বাপলা' উৎসবে গিয়ে যোগ দিলে। বরপক্ষ সদলবলে কুলিমুড়ায় এসে পৌঁছে গেছে বাগ্‌ভাও বাজিয়ে। কন্তাপক্ষের নাকি নেবেনরা অশ্বশৃঙ্গ হাতে নিয়ে অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গিমা পা ফেলতে ফেলতে বরপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দল দু'টি পরস্পর সম্মুখীন হতেই কন্তাপক্ষ জোর গলায় বলে উঠলো—'হরিবল—হরিবল হে'—।

বরপক্ষও গেয়ে উঠলো একই সুরে—'পাওরা বল—পাওরা বল হে'—  
কন্তাপক্ষ—'হরিবল—পাওরা বল হে'—।

বরপক্ষ—'শিব বল—শিব বল হে'—

তুই দলের বাজনদারদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হই গেছে। বরিয়াতনের নদনভেদ বেছে উঠতেই সরিয়াত বা কন্তাপক্ষ

রামসিঙায় ফুঁ দিলে খুব জোরে, সিঙার শব্দে মদনভেড় একেবারে তলিয়ে গেল। বরিয়াত পক্ষের দশখানা পালক লাগানো মঘয়া ঢাক চড়বড় শব্দে ঢাকীর কাঁধে লাফাতে লাগলো, সরিয়াত পক্ষের ঢাকের আওয়াজকে একেবারে ঢেকে দিলে এরা। কোনপক্ষই কিস্তি হার মানবে না, ঢাকীদের লক্ষ লক্ষ ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগলো। মাদল আর লাগরা বাজছে সমান তালে তাল দিয়ে। সমবেত বাজের তালে তালে বরিয়াত আর সরিয়াত দল অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে কুলির মাঝে খেলতে আরম্ভ করেছে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায়ে। এও একরকম সাঁওতালদের নাচ, এ নাচের তাৎপর্য—বরপক্ষ যেন জোর করে কনেবাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে চায়, কনেকে তারা গায়ের জোরে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সামনা-সামনি লড়াই দিয়ে। কন্তাপক্ষ তা বরদাস্ত করতে রাজি নয় মোটেই; তীর, ধনুক, লাঠি, পোঁটা নিয়ে বরপক্ষকে তারা বাধা দিতে আরম্ভ করেছে। এ এক রকমের যুদ্ধাভিনয়, বিয়ের সময় সাঁওতালদের এই রেওয়াজ, এটা তাদের শাস্ত্র-মতে বিয়েরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বরপক্ষ কন্তাপক্ষের বাড়ী ঢুকবার আগে এইভাবেই তাদের অভ্যর্থনা করবার নিয়ম।

লড়াই করার ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কয়েক পাক খেলার পর উভয় পক্ষে ‘জোহার’ \* হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দুই দলই পরস্পরকে সাঁওতালী কায়দায় নমস্কার জানালে। রাবণ মাঝি যথারীতি ‘সালাম’ দিলে বরকর্তাকে। বরকে নিয়ে বরিয়াত দল রাবণ মাঝির সদর দোরে গিয়ে দাঁড়ালো। টুশকী মেঝেন—রাবণ মাঝির বো—কতকগুলি মেয়ের সঙ্গে গুড়-জল হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো,—জামাইকে মিষ্টিমুখ

\* জোহার—সন্ধি।



করাতে হবে। জামাই দেখে ভারি খুশি হইলেন। যেমন তার দোহারী শক্তপোক্ত চেহারা, তেমনি তার গাথের গড়ন, বয়সও খুব বেশি নয়—এক কুড়ি চার। সকলের মুখেই এক কথা—জামাই খুব ভাল হয়েছে, দুলালীর মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এই ছেলেকেই মানায়। বরের নামটিও খুব চমৎকার,—মোহন টুডু।

মেয়েরা সব চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো বরকে। বরের পা ধোয়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে কণ্ঠাদান পর্যন্ত বাবতীর অস্থগ্নান মনর দোরেরই শেষ করতে হবে। কণ্ঠাদানের পর গাঁটছড়া বেঁধে বরকনে যাবে মাজুয়ায়, তিনপাক ঘুরবে ছাঁদনা তলায়, তারপর হবে 'গুড়ভাত' বা মিষ্টিমুখ।

নিষ্ঠে সুরে আড়াশী আর মাদল বাজছে। একদল মেয়েন পরম্পরের হাতে হাতে ছাঁদ লাগিয়ে 'দংসিরিং' গাইতে গাইতে বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে দাঁওতালী নাচ। এদের স্বী-আচার শেষ হতেই একটি দশ বারো বছরের ছেলে,—সম্পর্কে সে বরের শালা,—বরের মাথায় দিলে একটা হলুদ রঙের পাগড়ী বেঁধে। চারদিক থেকে আনন্দে সব হৈ হৈ শব্দে চীৎকার ক'রে উঠলো, বাজনার হঠাৎ বাজনার আওয়াজ আর একটুখানি বাড়িয়ে দিলে।

রাবণ মাঝি ঘুরে ফিরে চারদিক তদ্বির করে বেড়াচ্ছে। বরকন্ডার পাশে বসে খানিকটা পচুই মদ সে চোঁ চোঁ করে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার উঠে পড়লো,—কণ্ঠাদানের সময় হয়েছে।

কিষ্টু মাঝি গুদিক থেকে চুপি চুপি এগিয়ে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো। কিষ্টুর মুখে চোখে কি যেন একটা আশঙ্কার ভাব। চাপা গলায় বলে উঠলো কিষ্টু,—সদ্ধার, ওরা এসে পড়েছে। ভালুকপোতার প্রায় তিনকুড়ি দাঁওতাল এসে জমা হয়েছে নহল বাগানে। ওরা বলে...

রাবণ নাঝি চোখ তেড়ে বললে,—বলুক, যা খুশি তাই বলতে দে  
ওদের,—রাবণ নাঝি পরোয়া করে না।

রাবণ নাঝির মুখের চেহারা দেখে হঠাৎ চমকে গেল কিষ্ট,  
পরক্ষণেই আবার সে বলে উঠলো—কিছু সন্দার, একদল লাঠিয়াল ওরা  
সঙ্গে নিয়ে এসেছে, হয়ত গায়ের জোরেই বিয়ে ওরা বন্ধ করতে  
চাইবে।

রাবণ নাঝির কপালের রেখাগুলো ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।  
এক মুহূর্ত কি ভেবে নিলে রাবণ, তারপর ধীরকণ্ঠে বললে,—সুখন  
নাঝিকে একবার ডাক দেখি।

এ পাড়ার দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় সুখন নাঝি, রাবণের অমুগত। তাকে  
ডেকে এনে দল পাকিয়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো বখেড়া বিরোধী  
কিষ্ট নাঝির মনঃপূত নয়। তাই সে আমতা আমতা ক'রে বললে,—ওদের  
সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিলে হতো না সন্দার!

রাবণ নাঝি জবাব দিলে,—সুখনকে আগো ডাক ত—তারপর বোকা  
বাবে, ততক্ষণ বিয়েটা আমি চটপট সারিয়ে দি।

রাবণ নাঝি বরিয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বিনীত ভাবে  
বললে,—এবার তাহলে কনে আনতে আজ্ঞে করা হোক।

বরকণ্ঠা খুশী হয়ে বললে,—ই ত—আর বিলম্ব কেনে, কৈ হে  
বাঁবুড়ে ঠাকুর। \*

রত্ন নাঝি শ্যঙতালদের পুরোহিত, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বরের  
কাছে দাঁড়ালো সে। ওরই কাঁধের উপর চড়ে কণ্ঠা গ্রহণ করতে হবে  
বরকে। কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে আছে একদল

---

\* বাঁবুড়ে ঠাকুর—পুরোহিত, বায়ন।

মেঝেন। তাদের মধ্যে একদল এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে,  
—কৈ হে ভৈরব কই—ভৈরব,—ডর লাগছে নাকি ?

ডর ভয়ের কারণ কিছু নাই। বরপক্ষ থেকে তিন জন মাঝি একটি  
ডালা হাতে ক'রে কনের দিকে এগিয়ে এলো হাসতে হাসতে, সম্পর্কে  
এরা তিনজনেই কনের ভাস্বর। কনেকে এরা ডালার উপর বসিয়ে  
তিন জনে ধরাধরি ক'রে কাঁধের উপর তুলে বরের একেবারে সামনে  
গিয়ে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝির মেঝেন বরগু ডালা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো  
একপাশে। রাবণ মাঝি বাবুড়ে ঠাকুরকে তাড়া দিয়ে বললে,—দাও  
দাও,—এবার মেল ক'রে দাও।

দাঁড়াতালদের পুরোহিত রত্ন মাঝি খানিকটা গুঁড়ি বেয়ে কাঁধের  
উপর চাপিয়ে নিলে বরকে। ভাস্বরের ঘাড়ের কনে এবং পুরুতের ঘাড়ের  
বর, আসনানেই ওদের চারচকুর মিলন হলো। মেঝেনরা সব ছল্লোড়  
ক'রে উলু দিয়ে উঠলো।

রাবণ মাঝি আর বরকর্তা পূর্ণঘট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'লোটা-দা'  
অন্ত্যায় সম্পন্ন করবার জন্য। সেই লোটোর জলে আন্দের শাখা চুবিয়ে  
বর কনে পরস্পরকে তিনবার জল ছিটিয়ে দিলে। মেঝেনরা সব একসঙ্গে  
চারদিক থেকে শব্দ করে উঠলো,—সিঁদুর দান—সিঁদুর দান—

বর তার দান হাতের বড়ো আঙ্গুলের ভগায় কড়ে আঙ্গুলটা ঠেকিয়ে  
সিঁদুরের থান থেকে খানিকটা সিঁদুর তুলে নিলে। সিঁদুর দান শেষ  
হলেই বিয়ে একবারে পাকা। চারদিক থেকে শব্দেই এই বিশেষ  
মুহুর্তটির অপেক্ষায় একদৃষ্টে চেয়ে আছে বরকনের দিকে। মাদল লাগরায়  
সিঁদুর দানের বাজনা ধরেছে। পিছন দিক থেকে কে একটা লোক  
জোর গলায় হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো,—হঁসিয়ার, হঁসিয়ার, রাবণ  
মাঝি ! ভাল চাস ত সিঁদুর দান বন্ধ ক'রে দে'।

দূরে একদল সাঁওতাল এসে জমা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্রবেগে ছুটতে ছুটতে এসে রাবণ নাঝির সামনে দাঁড়ালো। বনের হাত থেকে শালপাতে মোড়া সিঁড়রের থানটা হঠাৎ ছিটকে পড়লো নাটির উপর। রাবণ নাঝি পিছন ফিরে চেয়ে দেখে—ভালুকপোতার টুয়াই। টুয়াই নাঝির দিকে খানিক আগিয়ে এসে রাবণ নাঝি বলে উঠলো,—তার মানে ?

টুয়াই নাঝি জবাব দিলে,—এ মেয়ের হরকবাদি হয়ে গেছে বারো বছর আগে, ভালুকপোতার গোটা গাঁয়ের লোক সাক্ষী আছে। বেটীর বিয়ে তোকে সেইখানেই দিতে হবে, কথা দিয়ে গেছে তোর শ্বশুর।

রাবণ নাঝি চোখ তেড়ে বললে,—ছ' বছরের মেয়ের হরকবাদি, কেউ কোথাও শুনেছে ! ও শুধু একটা ছেলে খেলা, ও সব আমি মানি না।

টুয়াই নাঝি জোর গলায় বললে,—আমরা কিন্তু মানি ; ভালুকপোতার টুংরা নাঝির সঙ্গে বেটীর বিয়ে তোকে দিতেই হবে, এ বিয়ে তুই বন্ধ করে দে।

বছর পচিশের যোগা লিকলিকে একটা কুৎসিৎ ধরণের লোক-লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ভালুকের একটা বাচ্ছাকে টানতে টানতে টুয়াই নাঝির কাছে এসে দাঁড়ালো। ছুলালীর দিকে চেয়ে হিহি ক'রে একবার হেসে উঠলো লোকটা, হাসতে হাসতে বললে,—আমি—আমি তোর বর, ও নয়—আমি।

রাবণ নাঝি আঁ কুঁচকে বললে,—এ কে ?

টুয়াই নাঝি জবাব দিলে,—এরই নাম টুংরা নাঝি, এই আনার নাতি—তোর আসল জামাই।

রাবণ মাঝির সর্কাক বিধিয়ে উঠলো, তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলো  
রাবণ,—এরি হাতে আমাকে বেঁটা দিতে হবে ?

টুয়াই বললে,—নিশ্চয়ই, আজই—এই মজলিসেই।

রাবণ মাঝির আর সহ্য হলো না, হাতের পূর্ণ ঘটটা একপাশে  
নাখিয়ে রেখে ছুঁকার করে উঠলো রাবণ মাঝি,—স্থখন ! স্থখন !

খেলোয়াড় স্থখন মাঝি প্রকাণ্ড এক লাঠি হাতে দাঁড়ালো এসে  
টুয়াই মাঝির সামনে। টুয়াই মাঝি বুক ফুলিয়ে বলে উঠলো,  
—থবরদার।

দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এলো রাবণ মাঝি নিজে। টুয়াই মাঝি  
বললে,—আজ তুই ধরম খেলালি রাবণ মাঝি, কিন্তু আমাদেরও জ্ঞান  
কবুল—এ বিয়ে আমরা কিছুতেই হতে দিব না।

পিছন দিকে চেয়ে জোরগলার একটা ডাক দিলে টুয়াই মাঝি,  
—লপ্সা, লপ্সা !

টুয়াইয়ের সাড়া পেয়ে কুড়ি তিনেক শাওতাল কড়ের বেগে ছুটে  
এলো তীর ধমুক লাঠি দৌঁটা হাতে নিয়ে। টুয়াই মাঝি ছকুন  
দিলে,—দাঁড়া সব এইখানটায় সার দিয়ে। ভাল কথায় যদি না হয়,  
কনে আমরা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাব।

চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অস্থান বন্ধ হয়ে  
গেল সিঁতুর দানের মুখে। আকস্মিক এই সোরগোলের মধ্যে নাচ-গান  
আর নাদলের আওয়াজ খেমে গেল হঠাৎ এক মুহূর্তে।

রাবণ মাঝি এতখানি ভাবতে পারেনি। শাওতালদের সন্টার দে,  
এ তল্লাটের পাচখানা গারের মাথা। তার মেয়েকে জোর করে' বিয়ের  
আসর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে,—রাবণ মাঝি বেঁচে থাকতে ! খেলোয়াড়  
স্থখন মাঝির দিকে চেয়ে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ,—হাঁটা এদের

এখান থেকে, ঠেঙ্গিয়ে বেবাক দূর ক'রে দে, টুয়াই মাঝিকে জানিয়ে দে  
রা রাবণ মাঝি কারো চোখ-রাঙানিকে ভয় করে না, দরকার হলে  
পাক্কা হাঙ্গামা করতেও সে জানে।

সুখন মাঝি দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ালো, রীতিমত লাঠিসোটা আমদানি  
হয়ে গেছে এদের মধ্যেও। টুয়াই মাঝির দল আরও খানিকটা এগিয়ে  
শেলো সদর্পে, আজ তাদের জান কবুল, মান খুইয়ে কেউ বাড়ী ফিরে  
পাবে না।

চারি দিকে হঠাৎ একটা হলস্থল পড়ে গেল। বরপক্ষও রীতিমত  
ক্ষল হয়ে উঠেছে, এ অপমান শুধু রাবণ মাঝির একলার নয়, তাদেরও।  
চালুকপোতার বিরুদ্ধে বরিয়াত পক্ষও ক্ষেপে উঠলো, দুলালীর সঙ্গে  
মোহনের বিয়ে তাদেরকে দিতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। বরিয়াত  
আর বরিয়াত পক্ষ একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝির দল বাঘের  
দ্রুত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো টুয়াই মাঝির দলের উপর।

বরকর্তা বুদ্ধ চাঁদরায় মাঝি একপাশে চুপচাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে  
ছিলো। ব্যাপারটা বুঝতেই তার কিছুক্ষণ কেটে গেছে। শশব্যস্তে  
ছুটে গিয়ে দুই দলের মাঝখানে হঠাৎ দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল  
চাঁদরায় মাঝি, জোর গলায় সে বলে উঠলো,—থবরদার।

উভয় পক্ষই থমকে গেল হঠাৎ। রাবণ মাঝি বরিয়াত হয়ে উঠেছে,  
বরকর্তার সামনে গিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো সে, চাঁদরায়  
মাঝি বাধা দিয়ে বললে,—আমরা চাই বিচার; লড়াই আমি হতে দিব না।

টুয়াই মাঝি সোৎসাহে বলে উঠলো,—সাস হাডাম—সাবাস!  
আমরা শুধু বিচার চাই,—হোক বিচার—এই মজলিদেই।

চাঁদরায় মাঝি প্রবীণ লোক, সাওতাল মহলে তার যথেষ্ট মান-খাতির  
আছে। রাবণ মাঝি বা টুয়াই মাঝির চেয়ে সামাজিক সন্ত্রন তার কম কিছু

নয়। মোহন মাঝির কাকা এই চাঁদরায় মাঝি, এ অঞ্চলের নামকরা একজন বিচক্ষণ লোক। এতবড় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা তার সামনে সে কোনমতেই ঘটতে দেবে না। দুই দলের মাঝিখানে দাঁড়িয়ে চাঁদরায় মাঝি আর একটা হাক দিলে,—খবরদার।

সুখন মাঝির হাতের লাঠি আসমান থেকে নেমে এলো মাটির উপর। ভালুকপোতার নাম করা লাঠিগাল লপ্সা মাঝি মুখ নীচু করে দাঁড়ালো একপাশে। রাবণ মাঝি একটু আশ্চর্য হলো, টুয়াই মাঝি একদৃষ্টে চেয়ে আছে চাঁদরায় মাঝির মুখের দিকে। চাঁদরায় মাঝির ইঙ্গিতে উভয় দলই ক্ষণ কালের জ্ঞা শুরু হয়ে গেল।

রাবণ মাঝি জিজ্ঞাসা করলে,—বিয়ে কি তা হলে বন্ধ থাকবে?

চাঁদরায় কিছু বলবার আগেই টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—নতুন ক'রে লগণ বেঁধে ও মেয়ের আবার বিয়ে দিতে হবে, এই হলো পাওতালী আইন।

ছালালীর মানার বাড়ী ভালুকপোতায়। রাবণ মাঝির খস্তর বেঁচে থাকতে কোন্ কালে নাকি ছালালীর হরকবাঁদি করে গেছে ভালুকপোতায়। রাবণ মাঝি কিন্তু বিশ্বাস করে না ও সব কথা, এতবড় একটা অছায়া—দাবি সে মেনে নিতে পারে না। চাঁদরায় মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো রাবণ,—তুই কি বলিস কুটুম্ব, এরি নাম কি পাওতালী আইন?

চাঁদরায় মাঝি হঠাৎ কোন জবাব দিলে না। টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—তোকেই আমরা মেনে নিচ্ছি, দে' তুই এর বিচার ক'রে।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—আমার কথা কি শুনবি তোরা?

রাবণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে,—আলবাৎ শুনবো।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—তোকে আমরা ভেরে দিলুম, নেহ তুই বিচার ক'রে দে'।

চাঁদরায় মাঝি সমবেত আর সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—তোরা কি বলিস, তোরাও এতে রাজি ত ?

সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানালে,—চাঁদরায় মাঝির বিচার তারা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। চাঁদরায় বললে,—বদ্ তাহলে চুপচাপ সব শাস্ত হয়ে, আনাকে একটু ভেবে দেখতে দে।

রাবণ মাঝির সদর দোরে বিরাট এক মজলিস বসলো। চাঁদরায় মাঝিকে বসিয়ে দেওয়া হলো, মাঝখানে একটা খাটিয়ার উপর। টুয়াই আর রাবণ মাঝি নাচুলির উপর বসে পড়লো চাঁদরায়ের দু' পাশে।

সম্ভার অঙ্ককার ঘনিযে এসেছে। কিশ্টু মাঝি রাবণের ঘর থেকে দুটো নগবাতি জেলে এনে মজলিশের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিলে কাঁটাল গাছের ডালে। ভিন্ন দলের মাতব্বরদের মধ্যে যুক্তি তর্ক ও বাকবিতণ্ডা আবার শুরু হয়ে গেল, কোন পক্ষই অপর পক্ষকে স্বীকার ক'রে নিতে চায় না। টুয়াই মাঝির এক কথা, রাবণ মাঝির মেয়ে নাকি বাগদত্তা, স্ততরাং টুয়ার সঙ্গেই তার বিয়ে দিতে হবে। রাবণ সে কথা স্বীকার করবে না, মেয়ের বিয়ে সে আজই দেবে—মোহন মাঝির সঙ্গে, চাঁদরায় মাঝির অহুমতির অপেক্ষা নাত্র। অন্তান্ত বরপক্ষীয়েরাও রাবণ মাঝির সঙ্গে একমত, দুলালীর সঙ্গে মোহনের বিয়ে, আজ—এই রাত্রেই।

চাঁদরায় মাঝি গম্ভীর ভাবে বসে আছে খাটিয়ার উপর। সমস্তা খুব গুরুতর, কোন পক্ষের অহুকুলে সে রায় দেবে স্থির করা কঠিন। নেহ কথা বলতে গেলে কোন পক্ষের দাবীকেই হঠাৎ একেবারে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চাঁদরায় মাঝি কান খাড়া ক'রে শুনে বেতে লাগলো উভয় পক্ষের বক্তব্য। যেনন করেই হোক এ সমস্যার সমাধান তাকে করতেই হবে।



উভয় পক্ষের বাকবিতণ্ডা ও চাঞ্চল্যের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। বরের নাম ধরে উভয় পক্ষই চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে,—মোহন, না, টুংরা? টুংরা, না মোহন? এরা বলে—মোহন ওরা বলে—টুংরা। চারিদিকে হুন্সা ক্রমশঃ বেড়ে চললো। চাঁদরায় মাঝি তাড়াহাড়ি উঠে দাঁড়ালো, হঠাৎ সে জোরগলায় বলে উঠলো—মোহন!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আবার শূন্য হয়ে গেল। মোহনের নান শুভে রাবণ মাঝি ও বরিয়াত পক্ষ কিছু খুশী হয়ে উঠেছে। টুয়াই মাঝি কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলো,—মোহন, না, টুংরা?

চাঁদরায় মাঝি মোহনকে লক্ষ্য ক'রে ডাক দিলে,—ইদিকে আয়।

চাঁদরায় মাঝির রায় সকলে যেনে নিতে বাধ্য, উভয় পক্ষ কথা দিয়েছে, টুয়াইয়ের দল কিছু হতাশ হয়ে পড়লো।

বিয়ের বব মোহন মাঝি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চাঁদরায় মাঝির সামনে দাঁড়ালো। চাঁদরায় মাঝি আর একটা হাঁক দিলে,—টুংরা,—ই দিকে।

উৎসুক জনতা আর একবার চোখ ফেরালো চাঁদরায় মাঝির দিকে। টুংরা ভালুকর বাচ্ছাটাকে টানতে টানতে চাঁদরায় মাঝির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো—মোহন মাঝির পাশে।

সমাগত সকলকে লক্ষ্য ক'রে চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—এদের দু'জনের মধ্যে থেকে দুলালীর বর আমাকে বেছে দিতে হবে,—কেনন?

রাবণ মাঝি একটা ঢোক গিলে বললে,—ই কুটুখ!

টুয়াই মাঝি শুধু ঘাড় নাড়লে একবার।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—দু'জনকেই এদের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় যে জিততে পারবে—দুলালীকে বিয়ে করবে সেই।

রাবণ ও টুয়াই মাঝি একসঙ্গে বলে উঠলো,—পরীক্ষা ?

চাঁদরায় বললে,—হাঁ—তীর ধনুকের পরীক্ষা, নিশান আমরা ঠিক করে দিব, দূর থেকে তীর দিয়ে বিঁধতে হবে সেই নিশানকে। শেষ পর্যন্ত ঠিকমত নিশান যে বিঁধতে পারবে—রাবণ মাঝি মেয়ে দেবে তার হাতে।

এরপর আর কথা নাই, টুয়াই মাঝি সানন্দে সম্মত হলো, রাবণ মাঝি একটু গম্ভীরভাবে বললে,—বেশ, তাই হোক।

মোহনের দিকে এবার চোখ ফেরালে চাঁদরায় মাঝি, বললে,—তোরা এ সম্বন্ধে রাজি আছিস ত ?

মোহন মাঝি হঠাৎ কোন জবাব দিলে না। ডুলালীকে সে ভালবাসে, তর আগে থেকেই ভালবাসে। মনে মনে সতাই একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো মোহন। টুংরাকে সে ভাল করেই জানে, রোগা লিকলিকে বাবা-গোবা কুংসিং ওই চেহারা, কিন্তু কাঁড়ধেনুকে হাত তার পাকা। স্ত্রীজ টুয়াই মাঝির চেলাদের মধ্যে সব থেকে সেরা শিকারী ওই টুংরা মাঝি। ওর সঙ্গে কাঁড়ধেনুকে পাল্লা দেওয়া মোহনের পক্ষে সহজ কথা নয়। কিন্তু তবু সাঁওতালের ছেলে হয়ে কাপুরুষের মত কাজ করবে না মোহন, পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে। ঘাড় নেড়ে মোহন সম্মতি জানালে, চাঁদরায় মাঝির প্রস্তাবে সে রাজি আছে।

চাঁদরায় মাঝি খুশী হয়ে বলে উঠলো,—বহুত আচ্ছা।

তারপর সে জিজ্ঞাসাদৃষ্টিতে তাকালো একবার টুংরা মাঝির দিকে, বললে,—তুইও এতে রাজি আছিস ত ?

টুংরা মাঝির কিছুমাত্রই আপত্তি নাই এতে, ওর মিটমিটে চোখ 'টো' খুশিতে ভরে উঠলো, সাগ্রহে বলে উঠলো টুংরা,—কাঁড়ধেনুকটা নিয়ে আসবো নাকি ?

চাঁদরায় মাঝি বললে,—আজ না, পরীক্ষা হবে আজ থেকে ঠিক একমাস পরে, তোরা এর মধ্যে যতটা পারিস তৈরি হয়ে নে। বেশেদ মাসের শেষদিন ‘পঞ্চ গেরানী’ সাওতাল ডেকে ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুলালীর আনি বিয়ে দিব তার সঙ্গে—সেইদিন যে তীর ছোঁড়ায় জট হতে পারবে।

ভালুকপোতার সাওতালরাই খুশী হলো বেশি। কন্যাপক্ষও বিন স্বিধায় মেনে নিলে চাঁদরায় মাঝির রায়। রাবণ মাঝি একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে, ‘এতক্ষণ ধরে’ কি যেন সে ভাবছিলো। চাঁদরায় মাঝি রাবণের দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—তুই যে কোন কথা কইছিস না রাবণ, এতে তোর কোন আপত্তি নাই ত ?

রাবণ মাঝি সজাগ হয়ে উঠলো, মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে মাঙ্গ সঙ্গে বলে’ উঠলো রাবণ,—কি যে তুই বলিস কুটুম্ব, তোর কথার উপর কথা কইতে যাবে রাবণ মাঝি ! একবার যখন তোকে মেনে নিয়েছি, তখন আর কথা কি ! দিখিনী উন্টে গেলেও রাবণ মাঝি ধরম পোষণের না ; কথা কয়ে কথার খেলাপ আজ পর্য্যন্ত করেনি কখনো রাবণ মাঝি।

চাঁদরায় মাঝি বলে উঠলো,—মেলা, তবে হাত মেলা টুয়াই মাঝির সঙ্গে।

চারিদিকে একটা আনন্দের সাদ্রা পড়ে’ গেল। রাবণ মাঝি খানিকটা চুন তামাকুল গুঁজে দিলে টুয়াই মাঝির হাতে। টুয়াই মাঝি কাণে গোঁজা শালপাতার চুটিটা রাবণ মাঝির ঠোঁটের কাছে ধরে’ দিলে টুংরা সাওতাল মোহন মাঝিকে ভালুকের নাচ দেখাতে আরম্ভ করেছে। মাটির উপর ছোট একটা লাঠি নিয়ে ঠুকতে ঠুকতে নিজের মনেই আউড় ঘাচ্ছে টুংরা,—ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্—নাচ রে বেটা...ধুক্ ধুক্.....

টুংরার টানা হেঁচড়ায় ভালুকের বাচ্চাটা একবার কৌঁ কৌঁ শব্দে ভেঁকে উঠলো।

রাবণ মাঝি চাঁদরায় আর টুয়াই মাঝির সামনে হাতজোড় করে বললে, —আজ আর কাউকে ছেড়ে দিব না আমি, আমার ঘরে আজ খুদকুঁড়ো দু'টো খেয়ে যেতে হবে সকলকেই।

চাঁদরায় মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—ভোজ? তা ভোজের যোগাড় ত হয়েই আছে, কি বল উস্তাজ!

টুয়াই মাঝি হো হো করে হেসে উঠলো। রাবণ মাঝি বাজনায়দেরের তালি দিয়ে বললে,—বাজা রে সব বাজা, লাগরা বাজা—মাদল বাজা—চলুক তার সঙ্গে সারারাত বরে লাচ-গান আর হাড়িরা।

বাজনার শব্দে সাঁওতালপাড়া আবার গুলজার হয়ে উঠলো। দুলালী তখন হলুদরাজা বিয়ের শাড়ীখানা প্যান্টে ঘরের মধ্যে একটা খাটিরার উপর চুপচাপ মুগ্ধ ভাবে শুয়ে পড়েছে।

## দুই

কুকলিরা নদীর এপার আর ওপার। এপারে রানপুর, ওপারে মুসককটা; এপারে দুলালী, ওপারে নোহন। মাঝখানে ব্যবধান ক্রোশ-মানেকের মধ্যেই। এপারের কয়েকটি সাঁওতালী গ্রাম ওপারের কয়েকটি গ্রামীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দীর্ঘকালের আত্মীয়তাস্বন্ধে। এপার আর ওপার নিয়ে এদের যে পঞ্চাশ বা 'পঞ্চগেরামী'—এঞ্চলের বৃহত্তর সাঁওতালী সমাজে তার মান-মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ড় কম নয়। সামান্য দিনমজুর থেকে আরম্ভ করে অবস্থাপন্ন চাষী হ'ল প'র্যন্ত অনেকগুলি সাঁওতালের বাস কাছাকাছি এই কয়খানা গাঁয়ের

মধ্যে। ঘুসকুকাটা গ্রামখানা ছোট, কয়েকঘর বাড়ি সাঁওতালের বাস;  
 কিন্তু অবস্থা কারো খারাপ নয়, দু'দশ বিঘা জমি-ভায়গা সকলেরি আছে।  
 এ গাঁয়ের শ্রামরায় মাঝি, মোহন মাঝির বাবা, এ অঞ্চলের নামকরা  
 লোক ছিলো। নিজের হাতে দু'টি কেটে, হাল বেয়ে তিন তিনখানা  
 লাঙ্গলের জমি একলা সে থামাল ক'রে গেছে। কোনকিছুর অভাব  
 ছিলো না তার, লক্ষ্মী ছিলো শ্রামরায় মাঝির ক্ষেত থামাবে বাধা।  
 ছেলেটাকে গড়ে-পিটে মানুষ ক'রে তুলবার জন্তু কি আগ্রহই না ছিলো  
 শ্রামরায় মাঝির, কিন্তু ছেলে তার মনের মত হয়ে উঠেনি। শ্রামরায়  
 ছিলো পাকা চাষা, গায়ে-গতরে খেটে-খুটে মাটির বুকে সে সোনা  
 ফলাতে জানতো। কিন্তু ছেলেটা তার অল্প ধরণের, চাষবাসে তার  
 ঝোক ছিলো না মোটে, সাংসাদিক কাজকর্মে নিষ্ঠা ছিলো একেবারে  
 কম। মোহন মাঝির স্বভাবটা বরাবর একটু সৌখীন ধরণের। হরত  
 বা শ্রামরায় মাঝি গোড়ার দিকেই একটু ভুল করেছিলেন, মোহনকে সে  
 ছেলেবেলায় লাঙ্গল দরা না শিখিয়ে পাশের গাঁয়ের একটা পাঠশালা  
 তাকে ভর্তি করে দিয়েছিলো। বই-পুঁথি বগলে নিয়ে প্রত্যহ সে এক-  
 দেড়কোশ পথ হেঁটে বছরখানেক আনাগোনাও করেছিলো, কিন্তু  
 লেখাপড়া ভালরকম শিখতে পারেনি মোহন, প্রথম ভাগের দু'একখানা  
 পাতা উল্টেই পাঠশাল যাওয়া সে বন্ধ করে দেয়। অবশ্য শ্রামরায় মাঝির  
 তাতে আপসোসের বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি, ছেলে যে তার দিক  
 পিড়াদের \* ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলো এবং ছাপা পুঁথির বাংলা আখরগুলো  
 একে একে বিলকুল সে চিনে কেলেছিলো বহুব্যা- এর মধ্যেই, এইটাই  
 তার পক্ষে ঢের। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি দরকার, অর্থাৎ গুরু-বাছুরের  
 তত্ত্বাবধান থেকে আরম্ভ করে ক্ষেত-থামারের যাবতীয় কাজকর্মে

\* দিকু পিড়া—বাঙ্গালী ভুললোক।

বিশেষভাবে মনযোগ দেওয়া,—সেই দিকটাই একেবারে এড়িয়ে গেল মোহন। আকৈল বুদ্ধির অভাব ছিলো না তার, কিন্তু এসব কাজে বরাবরই ঝোঁক কিছু কম ছিলো। ছেলেবেলা থেকেই মোহন একটু আনন্দপ্রিয়, আড়বঁশী আর মাদল নিয়েই হরুদয় সে মেতে থাকতো।

সাংসারিক বিষয়কর্মে ছেলের অনমনোযোগ দেখে শ্রামরায় মাঝি সে-বার বেশ খানিকটা শানিয়ে দিলে মোহন মাঝিকে। জোয়ান ছেলে, বাপের বুড়ো বয়েসে বিশেষ যদি কোন কাজেই না এলো, তাহলে তার থাকা না থাকা সমান কথা। অবশ্য নিজের জন্তে কোনদিনই ভাবতে হয়নি শ্রামরায় মাঝিকে, মোহনেরি ভবিষ্যৎ ভালোর জন্তে গড়ে পিটে তাকে নাগ্নস করে নিতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু মোহন ছিলো একেবারে থামথেরালী, সংসারের ধরাবাঁধা নিয়ম কানূনের মধ্যে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে কোন মতেই চলতে পারতো না। এইসব নিয়ে বাপ বেটার মধ্যে মাঝে মাঝে বাকবিতণ্ডা হতো প্রায়ই। শ্রামরায় মাঝির কাছ থেকে বেশ একচোট ধমক খেয়ে রাতারাতি সেদিন বাড়ী থেকে চম্পট দিলে মোহন। তিনটি বছর মোহনের আর খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাণীগঞ্জের একটা কয়লাকুঠি থেকে শ্রামরায় মাঝি নিজে গিয়ে বহুকষ্টে ধরে নিয়ে আসে মোহনকে। মোহন সেখানে কয়লা কাটতো, মালকাটার কাজে মোহন পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুসককাটার শ্রামরায় মাঝির ছেলে—দু পাচটা মুনশ-মানের খাটিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যার বসে থেতে কুলোয়, দেশ ছেড়ে সে ভিন্ন মূলুকে কয়লা কাটতে যাবে কোন্‌ জুখে। বুড়ো বাপের অল্পরোধ শেষ পর্যন্ত ঠেলতে পারেনি মোহন, মালকাটার কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার তাকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

শ্রামরায় মাঝি নারা যাওয়ার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব মোহন মাঝির ঘাড়ে পড়লো। একটু একটু করে সব কিছুই আবার গুছিয়ে নিলে মোহন। শ্রামরায় মাঝির ভাই চাঁদরায় মাঝির সংপর্কান্বর্শে মোহন আবার দেখতে দেখতে ভাল ছেলে হয়ে উঠলো। রানপুরের রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে মোহনের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ওই চাঁদরায় মাঝি। ছেলেটাকে কোনরকমে একবার সংসারী করে দিতে পারলে কতকটা সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। শ্রামরায় নারা যাওয়ার আগে মোহন মাঝির ভালমন্দের ভার সে চাঁদরায় মাঝির হাতে ন্যে দিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে ঢুলালীর সঙ্গে মোহনের পরিচয় হয় কুলভান্ধার হাটে। মোহন গিয়েছিলো একজোড়া দামড়া কিনতে, হাটে গিয়ে তার রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা, সঙ্গে ছিলো ঢুলালী। রাবণ মাঝিকে মোহন চিনতো, মোহন মাঝির বাপের সঙ্গে রাবণ মাঝির জানাশোনা ছিলো খুবই। এ অঞ্চলের নামকরা লোক রাবণ মাঝি, মোহন ওদের বরাবরই জানে। একটা কথা শুধু জানা ছিল না মোহন মাঝির, রাবণ মাঝির মেয়েটা দে এর মধ্যে এতখানি বড় হয়ে গেছে, কোন দিন তা লক্ষ্য করেনি মোহন। ছোটবেলা থেকেই ঢুলালীকে সে দেখে আসছে, রানপুরের মেঝেনদের সঙ্গে ভোর বেলা উঠে ছোট একটা চূপড়ি হাতে নদীর ধারে ছাতু তুলে বেড়াতো সে বর্ষার দিনে, মোহন রেতো নদীর নানায় কাড়া চরাতে, মোহনের বয়স তখন চৌদ্দ কি পনেরর বেশি নয়, গোথোচোপি ওদের দেখা হতো প্রায়ই। তারপরেও হাটে ঘাটে ফেরা ময়দানে আরও কতবার দেখা হয়েছে তার ঢুলালীর সঙ্গে, আর পাঁচজনের সঙ্গে দেখা দ্বারা হয়। পরক্ষণেই আবার তাকে ভুলে যেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি মোহনের, বহুদিন থেকে ঢুলালীর কথা সে একবারেই ভুলে গিয়েছিলো। কুলভান্ধার হাটে বহুদিন পরে দেখা, মোহন হঠাৎ চিনতে পারেনি

ঢুলালীকে, রাবণ মাঝি নতুন করে আবার আলাপ করিয়ে দেয়।  
 ঢুলালীকে দেখে মোহন যেন অবাক হয়ে গেল। রোগা লিক্‌লিকে  
 পেটমোটা ছোট্ট একটা মেয়ে, মাথায় খাটো চুল, পরনে একটা জোলাঘরের  
 ফেড়ানী, কুনকুন শব্দে বাঁকল বাজিয়ে সারাবর্ষা নদীর ধারে ছাত্তু তুলে  
 বেড়াতে। তার মধ্যে আজ এতখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করে সত্যিই যেন  
 বিস্মিত হলো মোহন। ঢুলালীর সারা অঙ্গ বেয়ে বয়সের বান যেন  
 কুলে কুলে ছেপে উঠেছে। স্বন্দর মুখখানি তার ছাপ মেয়ে বসে গেল  
 মোহন মাঝির মনে।

দামড়া কিনতে হাটে গেছে মোহন। পাছে তাকে আনাড়ি ভেবে  
 পাইকাররা চড়া দর হাঁকে—তাই রাবণ মাঝিকেও সে সঙ্গে নিয়ে নিলে।  
 অভিজ্ঞ লোক রাবণ মাঝি, গরু কাড়ার মর্ষ তার ভালরকমই জানা  
 আছে। পাইকারদের কাছ থেকে বেশ ভাল দেখে একজোড়া দামড়া  
 গরু সে পছন্দ করে কিনে দিলে মোহন মাঝিকে। দামড়া দুটো খুব  
 চমৎকার, বয়েস মোটে ছাঁদাত, লক্ষণ বেশ ভাল আছে, একটা বছর  
 পিছুহালে চলিয়ে নিলে আট দশ বছর আর দেখতে হবেনা, একদেড়  
 খানা লাঙ্গলের জমি অনায়াসে এরা চষে মেড়ে থামাল ক'রে দেবে।  
 দামড়া দুটো খরিদ ক'রে ভারি খুশী মোহন মাঝি, হালের হেতের এগন  
 না হলে কি চলে! দামও ডের শস্তা হয়েছে, রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা  
 না হলে মোহন হয়ত আজ ঠকেই যেত।

একসঙ্গে ওরা ঘুরে ঘুরে হাটবাজার সারতে লাগলো, ঘুরতে ঘুরতে  
 বেলা হয়ে গেল অনেকখানা। "এটা ওটা কেনা কাটার মাঝ খানে আড়  
 চোখে চোখে চেয়ে দেখে ঢুলালী—মোহন যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে  
 ওর মুখের দিকে। নিজের মনেই ঢুলালী শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।  
 কিন্তু ভয়নক এ অত্যাচার কথা, ঢুলালীর দিকে বার বার এমন ভাবে



• তাকাতো এতটুকু লজ্জা করেনা মোহনের! ছালালী আবার তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়।

হাট থেকে বেরোবার আগে সাঁওতালী মাদল একটা কিনে নিলে মোহন, সেই সঙ্গে মকর বাঁশের গোটা তিনেক আড়বাঁশীও। কিনবার আগে মাদলটা সে নিজের হাতে বাজিয়ে একবার পরখ ক'রে নিলে, চমৎকার আওয়াজ উঠছে। একটা মনিহারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেলমালা কিনছিলো ছালালী, মাদলের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে সে চেয়ে দেখে বাজনদার স্বয়ং মোহন মাঝি। ছালালীর চোখে চোখ মিলতেই মাদলে আর একটা ঘা দিয়ে ফিক ক'রে হেসে উঠলো মোহন। বেলমালার দান দিয়ে ছালালী ওখান থেকে সরে পড়লো।

হাট থেকে ওরা বাড়ী ফিরলো এক সঙ্গেই। কুরুলিয়া নদীর বাঁকে এসে ডান হাতি ঘুস্ককাটার পথ ধরলে মোহন, বাবণ মাঝির পিছু পিছু এগিয়ে চললো ছালালী—রানপুর দিকে বাবার বাঁ-হাতি স্ফুড়ি পথটা ধরে'। মোহনের মনটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল, পা যেন তার গাঁয়ের দিকে এগোতে চায় না। কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে একবার তাকালো মোহন, ছালালীও নাঝে নাঝে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দূর থেকে কাকে যেন লক্ষ্য করছে। মোহনের বুকটা যেন দুলে দুলে উঠতে লাগলো। দূরে একটা পলাশ বনের মাঝখানে ওরা আড়াল হয়ে যেতেই নদীর ধারে ধম্কে থানিক দাঁড়ালো মোহন—ছোট একটা মহল গাছের নীচে। মোহনের চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর, কি যেন একটা তীব্র নেশার ঘোরে মনটা তার মাতাল হয়ে উঠেছে।

—আরে হুই, ধানক্ষেতে গরু লাগলো যে।

দূর থেকে কার ডাক শুনে চমক ভাসলো মোহনের। পিছন ফিরে সে চেয়ে দেখে তার নতুন কেনা দামড়া ছোটো হাঁসদাদের বাকুড়িতে

নেমে বেপরোয়া ধান খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের লাঠি-  
গাছটা উঁচিয়ে ধরে চীৎকার ক'রে উঠলো মোহন,—যাই—যাই শালার  
দামড়াকে, কুথাকার বেওড়া গরুরে!

গরু দুটোকে আবার পথ ধরিয়ে মাদলে আর একবার চাট দিলে  
মোহন। গরুর গলায় ঘুড়ুর গাঁথা চামড়ার পেটি জড়ানো। মাদলের  
আওয়াজ পেয়ে দামড়া দুটো জোর কদমে হাঁটতে আরম্ভ করলে। বাম্  
বাম্ শব্দে গরুর গলায় ঘুড়ুর বাজছে, মোহন তাদের পিছু পিছু মাদল  
বাজিয়ে গুন্ গুন্ শব্দে একটা গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে  
চললো।

মোহনকে সংসারী করবার জন্ত কিছু দিন থেকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা  
ক'রে আসছে চাঁদরায় মাঝি। অভিভাবক হিসেবে চাঁদরায় মাঝির এটা  
কর্তব্য, ভাইপো আর ছেলে ধরতে গেলে পৃথক নয়। যদিও তাদের  
ঘর সংসার জমিজমা মার হাড়ি হেঁসেল পর্য্যন্ত বহুদিন আগেই পৃথক হয়ে  
গেছে—জানবায় মাঝি বেঁচে থাকতেই, তবু আজো লোকে জানে ওরা  
এক গুপ্তি, একই বাড়ীর সামিল। মোহনের একটা বিয়ে দিয়ে সংসারের  
খোঁটায় যতক্ষণ না তার মনটাকে শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া যায় ততক্ষণ  
পর্য্যন্ত স্বস্তি নাই চাঁদরায় মাঝির। দু'চারটে মেয়েও এর আগে দেখা হয়ে  
গেছে, কিন্তু মোহনের তরফ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি বলেই  
চাঁদরায় মাঝি বেশি দূর আর এগুতে পারেনি। কুলডাক্তার হাট থেকে ফিরে  
আসার পর মোহন একদিন নিজেকে থেকেই জানিয়ে দিলে চাঁদরায় মাঝিকে  
—বিয়ে করতে সে রাজি আছে, আর বিয়ে যদি করতেই হয় ত ওপারের  
ওই রামপুর গাঁ খানাই প্রশস্ত, রাবণ মাঝির মেয়েটাও দেখতে শুনতে  
এমন কিছু মন্দ নয়।

চাঁদরায় মাঝি মনে মনে এঁচে নিলে সবই। পরের দিনই রাবণ মাঝির কাছে লোক পাঠানো হলো। রাবণ মাঝি একটি ভাল ছেলের সন্ধানে ছিলো, মোহনের মত ছেলে পেয়ে বর্ত্তে গেল সে। কয়েক দিনের ভিতরেই রামপুর আর ঘুসকুকাটার মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।

চাষের কাজে নতুন ক'রে মন দিয়েছে মোহন। ক্ষেত ভর্তি সোনার ফসল থৈ থৈ করছে মোহন মাঝির জোলজমিতে। দু'বেলা সে নদীর ধারে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়ায় আল কেটে কেটে জল ধরিয়ে। ঘন সবুজ ধানের শীষে থেকে থেকে দোল দিয়ে যায় দমকা হাওয়া, মোহনের মন সেই সঙ্গে ঢুলতে থাকে ঢুলালীর কথা স্মরণ ক'রে।

ওপার থেকে বেলা পড়লে মেঘেরা সব কলসী কাঁকে জল ভরতে আসে এই নদীর ঘাটে, দূর থেকে চেয়ে থাকে মোহন। এর মধ্যে আরও কয়েকবার চোখোচোখি দেখা হ'য়ে গেছে তার ঢুলালীর সঙ্গে, এই ঘাটেই সে জল মিতে আসে। ইচ্ছা থাকলেও লোকের ভিড়ে ঢুলালীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পায় না মোহন, ঢুলালী তাকে দূর থেকেই চোখের ভাষায় জানিয়ে দিয়ে যায়—মোহনকে সে ভালবাসে, মোহনকে সে চায়।

মোহনের যেদিন 'পাগড়ী খোলা' হয়, ঢুলালীর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সেই দিনই। নির্দিষ্ট ব্যবস্থানত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে হাটে গিরেছিলো মোহন, ঢুলালীকেও ওর আত্মীয় স্বজনেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। হাটের এক প্রান্তে মাথার একটা হলদে রঙের পাগড়ী বেধে চুপচাপ একধারে বসে ছিল মোহন। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মোহনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঢুলালী তার মাথা থেকে হলদে রঙের সেই পাগড়ীটা খুঁদে দিলে নিজের হাতে। এর মানে—মোহনকে তার পছন্দ। কনে

সতর্কণ নিজের চোখে বরকে দেখে পছন্দ না করছে, ততর্কণ ওদের বিয়ে হতে পারে না। এই ভাবে তাই বিচ্ছেদ আগে পরস্পরের দেখাশুনা আর পাগড়ী খোলার ব্যবস্থা, গাঁওতালদের এই নিয়ম।

সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে মোহনের বাড়ীতে নাচগানের ছল্লোড় পড়ে গেল, উৎসব চললো সারারাত ধরে। মোহন মাঝির কাকা চাঁদরায় মাঝি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কুটুম্বদের ভোজ খাওয়ালে প্রচুর। পরের মাসে 'নোরা' ডেকে 'লগন বাঁধা' হলো, চৈত্রের শেষ দিন রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে মোহন মাঝির বিয়ে।

বিয়ের দিন কিন্তু আকস্মিক ভাবে ওলট পালট হয়ে গেল সবই। হঠাৎকোনোভাবে গাঁওতালরা এসে এমন এক বথেড়া বাধালে যে সিঁহুরানের মুখে বিয়েটাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এমনটা যে ঘটতে পারে দুশ্চিন্তার ভাবতে পারেনি মোহন। কোথাকার এক অপদার্থ আত্মপোষণ বথেড় একটা ছোকরা এসে ছুলালীকে হঠাৎ বিয়ে করতে চায়। এইখানেই মনে হয়েছিল মোহনের টুংরা মাঝির গলাটা চেপে ধরে দিলে তার ঠাই ঠাই করে গোটা কয়েক চড় কবে দিয়ে ছুলালীকে বিয়ে করার সখ তার জন্মের মত মিটিয়ে দেয়। কিন্তু মোহন সেখানে বিয়ের পর, সব দিক দিয়েই হাত পা তার বাঁধা। বিশেষতঃ চাঁদরায় মাঝি নিজে খন মধ্যস্থ হয়ে মজলিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যা হোক একটা বিচার করে দিলে, তখন তার উপর আর কোন কথাই চলতে পারে না। মোহনের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক না কেন, যার পাচজনের নতই চাঁদরায় মাঝির ব্যবস্থা তাকে বেনে নিতে হলো। গাঁওতালের ছেলে হয়ে তার ধনুকের পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করবে সে কেমন করে!

বিয়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রামপুর থেকে ফিরে এসে ধনুকে একটা নতুন করে ছিলা পরিয়ে নিলে মোহন। তীর আর হাবড়গুলোর

পালক পান্টে বেশ শক্ত ক'রে কোড়ার স্ততো দিয়ে আগাগোড়া বেঁধে  
 নিলে। লাঙ্গলের একটা ডাল ফালকে টুকরো ক'রে কাটিয়ে কামা-  
 শালা থেকে গোটা কয়েক নতুন তীর ও গড়িয়ে নিলে মোহন; শরকাটি  
 বাড়ীতেই ছিলো, কাড়ধেতুকের যাবতীয় সরঞ্জাম একদিনের মধ্যেই তৈরি  
 ক'রে নিলে বেবাক। এই একমাসের মধ্যে যেমন ক'রে হোম  
 তৈরি হতে হবে মোহনকে, নিশান তাকে বিধতেই হবে। টুংরাতে  
 হারাতে না পারলে দুলালী একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে মোহনের  
 মোহন সে-কথা ভাবতেও পারে না। যতবড় তীরন্দাজই হোক টুংর-  
 পরীক্ষায় মোহনকে জিততেই হবে, যেমন ক'রেই হোক।

নদীর ধারে ছোট্ট একটা পাহাড়ের নীচে নির্জন মাঠের এক প্রান্তে  
 একটা নিম্ন গাছকে নিশান ক'রে তীরধনুক নিয়ে মোহন মাঝি শুরু করত  
 কঠোর সাধনা। সকাল বিকাল নিঃশব্দে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে  
 তীরধনুক হাতে নিয়ে, একাগ্র মনে নিম্নগাছের গুঁড়িটাকে লক্ষ্য করে  
 থেকে সে তীরের পর তীর ছুঁড়তে থাকে। সংসারের কাজকর্ম একেবারে  
 ভুল গেল মোহন, তীরধনুক হয়ে উঠলো তার একমাত্র সঙ্গী। নিশান  
 যে তাকে বিধতেই হবে।

বৈশাখের মাঝামাঝি, বেলা আর বেশী নাই, সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে  
 সারাদিন তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে আঙ্গুলের ডগায় টনটনে ব্যথা হলে মোহনের,  
 তবুও সে নিশানা লক্ষ্য ক'রে পাহাড়ের ধারে বসে বসে  
 ক্রমাগত তীর ছুঁড়ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, চান্দ্রাবের সাড়াশব্দ নাই  
 মোহন ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। মাটির উপর হাঁটু গেড়ে নিম্নগাছের  
 গুঁড়িটাকে লক্ষ্য ক'রে ধনুকের ছিলায় জোর ভক্তি সে দিলে অপর  
 একটা টান, ডালটাকে বিধতে হবে। তীরের ডগা থেকে নিশান পড়লো  
 মোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন চুষকের মত দৌঁটে গেছে কাল্পনিক এক সরল

যায়। ছিলা থেকে মোহন তীরটা যেমন ছাড়তে যাবে, অমনে হঠাৎ  
 ছন দিক থেকে মোহনের চোখ দুটো কে হুঁহাত দিয়ে চেপে ধরলে।  
 ছন হঠাৎ চমকে উঠলো, তীরটা আর ছাড়া হলো না। তাঁড়াতাড়ি  
 হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, দুলালী তার মুখের  
 ক চেয়ে খিল খিল করে হাসছে। মোহনও একচোট হেসে  
 লো দুলালীকে দেখে, তারপর সে একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠলো,  
 কোন্ দিক দিয়ে এলি, কেউ দেখতে পারনি ত ?

দুলালী বললে,—না, জল ভরতে এসে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।  
 মোহন একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—এমন করে তুই আসিস না  
 গলী, তোর বাপ যদি কোন রকমে জানতে পারে—ভয়ানক কিস্ত  
 ঝল হবে তখন।

দুলালী বললে,—মা সেদিন জানতে পেরেছে, পাড়ার একটা মেয়ে  
 মি ক'রে বলে দিয়েছিলো।

মোহন বললে,—বিয়ের আগে আনাদের মেলামেশা কোন রকমেই  
 বে না, সমাজের নিষেধ। টুয়াই মাঝি জানতে পারলে এই নিয়ে  
 ত একটা গোলমাল করতে পারে।

দুলালী একটু নাক সিটকে বললে,—বয়ে গেল, টুয়াই মাঝিকে ডরাই  
 কি !

মোহন একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—কিস্ত দুলালী—

দুলালী হাসতে হাসতে বলে উঠলো,—কাঁড় চালা, থামলি যে ?

মোহন বললে,—আজ আর থাকগে, ছিলা টানতে টানতে  
 ঝুললো ঝুয়ে গেল। টুংরাকে আমি হারিয়ে দিব দুলালী, নিশ্চয়  
 রিয়ে দিব।

দুলালী খুশী হয়ে বললে,—পারবি ত—ঠিক পারবি ?

সগর্বে জবাব দিলে মোহন,—পারবো না? সকাল বিকেল নদীর ধারে এসে করছি কি তবে! টুংরাকে যে হারাতেই হবে।

দুলালী বললে,—কদ্দূর তোরা অভ্যেস হলো আজ একবার পরীক্ষা দে দেখি। মাটির এই কলসীটা মাথায় নিয়ে হুইখানে গিয়ে দাড়াই আমি, দূর থেকে তুই তীর মেয়ে কলসীটা কই ভাঙ দেখি।

মোহন একটু বিস্মিত ভাবে বললে,—কলসি, তোরা মাথার উপর?

দুলালী বললে,—নিশ্চয়ই, নৈলে কেনন ক'রে জানবো যে টুংরাকে তুই হারাতে পারবি?

মোহন বললে,—না—না—তোরা মাথার উপর দিয়ে তীর অর্ধ কোন মতেই ছুঁড়তে পারবো না; তার চেয়ে বরং একটা কিছু নিশান—

দুলালী বললে,—এই আমার নিশান; এই নিশান তোকে বিধ্বস্ত হবে, আমার হুকুম।

মোহন আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো,—কি যে তুই বলিস দুলালী, দৈবাত্ম যদি কোন রকমে—

দুলালী একটু হেসে বললে,—তীরটা আমাকে বিধে কেলে? ভান্ন ত, তীর থেয়ে আমি মাটির উপর নুটিয়ে পড়বো তোরা চোখের সামনে মরবার আগে হাসতে হাসতে তোরা কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাব; অত্ন একটি মেয়ে এসে তোরা গলায় আবার নালা দেবে, আমাকে তখন ভুলে যাবিনা ত?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—তোকে না গেলে আমি বাচবো না দুলালী, এ কথা তুই ভাল করেই জানিস, তবু তুই আমাকে এমন কথা বলতে পারলি!

হাসতে হাসতে ছালাঙ্গী বললে,—সত্যি ? সত্যি তুই বাচবি না মাকে না পেলে ? কিন্তু টুংরাকে যদি হারাতে না পারিস ? তাহলে স্ত্রী বিষ খেয়ে মরবো আমি, এই তোকে বলে রাখলুম ।

ছালাঙ্গী মোহনের ডান হাতটা চেপে ধরলে, তারপর আবার লে যেতে লাগলো,—পরীক্ষায় তোকে জিততে হবে মোহন, যেমন ক'রে ঠিক হারাতে হবে টুংরা মাঝিকে, নৈলে আমাদের কোন উপায়ই ।

ছালাঙ্গীর স্পর্শে মোহনের দেহ-মন রোমাঙ্কিত হয়ে উঠলো । ছালাঙ্গীর খর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে উঠলো মোহন,—জানি ছালাঙ্গী, আমাদের রা জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু নির্ভর করছে সেই নকার ফলাফলের উপর । তুই শুধু একটিবার আমার চোখের সামনে ডান, তোর ওই সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে নিশান আমি ক'রে নেব, টুংরা মাঝির সাধ্য নাই সেদিন আমাকে টলায়, আমি জিতবো—নিশ্চয় জিতবো ।

ছালাঙ্গী সায় দিয়ে বললে,—নিশ্চয়ই জিতবি, আমি জানি তুই নিশ্চয়ই জিতবি ।

ছালাঙ্গীর কথায় মোহনের মনের জোর আরও খানিকটা বেড়ে গেল । ছালাঙ্গী বললে,—কিন্তু তার আগে আমার সামনে তোকে শিক্ষা দিতে হবে একদিন, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে ।

মোহন বললে,— তাই দিব, বিয়ের ঠিক আগের দিন । তুই দেখে ল ছালাঙ্গী, যে হাতে মোহন মাঝি মাদলে চাটি মেরে গানের আসর নাচের দেয়, যেহাতে সে আড় বাঁশীর ছুটো দিয়ে বরমাঝি স্বর ভাঁজতে দেয়,—সেই হাতে সে কাঁড় চালাতেও জানে । এমন কাঁড় আমি লাভ—বা দেখে তুই অবাক হয়ে যাবি ।



নির্জন নদীতীর। অবাক বিশ্বয়ে চেয়ে থাকে ছালালী আর  
 পরস্পরের মুখের দিকে। বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সূর্য্যের সো-  
 আলোয় রঙিন হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। পাহাড়ের উপর  
 কুঁড়ি ফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে ফুরফুরে হাওয়ায়। ছালালী মোহ-  
 নার উপর ডান হাতটা এলিয়ে দিয়ে বললে,—মোহন, চল না  
 পাহাড়ের উপর ঘুরে আসি।

মোহন বাহাত দিয়ে ছালালীকে জড়িয়ে নিলে, বললে,—যাবি,  
 চল। থাক এইখানে আমার কাঁড় দেখুকটা পড়ে, তোর কলসি  
 ততক্ষণ পাহারা দিক, কি বল?

হো হো করে হেসে উঠলো ছালালী।

নদীতীরে ছোট্ট একটি পাহাড়। রকমারি গাছপালায় নীচে  
 উপর পর্যন্ত সমস্তটা ঢাকা। পাহাড়ে উঠবার সঙ্কীর্ণ সরুপথ  
 বিলকুল এঁদের চেনা। পাহাড়ের প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি পুরা  
 গাছ, ছায়ায় ঢাকা কালো পাথরের বেদী, সব কিছু এরা চোখবুজে  
 দেখতে পার। পাথরের চাতাল ভেঙ্গে কিছুটা দূর উপর দিকে উ-  
 গিয়ে ছালালী হঠাৎ বসে পড়লো একটা কুসুমগাছের নীচে, বলল  
 —আর আমি হাঁটতে পাচ্ছি না, এইখানে একটু বসি।

মোহন বললে,—সেকি, উপরে উঠবি না?

ছালালী কুসুমগাছে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লো, বললে,—উ-  
 পা ছুটো কনকন করছে।

মোহনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে ছালালী।  
 মোহন বললে,—না—সেটি হবেক নাই, উপরে তোকে উঠতেই হবে  
 এন্দুর যখন এসেছি তখন টুই পর্যন্ত তোকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে  
 আমি!

মোহন হঠাৎ দু'হাত দিয়ে পাঁজাকোলা ক'রে ছালালীকে তুলে  
পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে উপর দিকে উঠে যেতে লাগলো।  
সে মোহনকে শব্দ ক'রে আঁকড়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে উঠলো,  
ডা—ছাড়া—করিস কি মোহন, ছাড়া।

মোহন বললে,—ছাড়বো কিস্কে, একেবারে হুইখানে গিয়ে ছাড়বো।  
ছালালীকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটা কালো পাথরের  
লের উপর বসিয়ে দিলে মোহন। ছালালী তাড়াতাড়ি বুকে পিঠে  
ডা টেনে দিয়ে বললে,—তুই যেন একেবারে কি, একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান  
ক।

মোহন শুধু একবার ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর সে  
কগুলো কুঁড়ি ফুল তুলে এনে নিজের হাতে গুঁজে দিলে ছালালীর  
পায়। মোহন বললে,—একটা গান গা'না ছালালী, বেশ ভাল দেখে  
টা 'দং সিরিং'।

ছালালী বলে উঠলো,—ইং—দং সিরিং না আর কিছু, দং সিরিং আমি  
হিতে পারবো না। লাগড়ে সিরিং শুনিবি? বাহা, ডাহার, শালুই,  
শুনিবি বল?

মোহনের কোলে মাথা রেখে ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়লো ছালালী  
ধরের চাতালটার উপর। মোহন ধীরে ধীরে ছালালীর মাথায় হাত  
লিয়ে দিতে লাগলো, বললে,—লাগা তবে একটা লাগড়ে সিরিং।

গুন্ গুন্ ক'রে একটা গান ধরলে ছালালী, গলাখানি তার চমৎকার।  
গালালীর গানের স্বর মোহনের অন্তরের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ছুঁয়ে ছুঁয়ে  
পূর্ব এক পুলক দোলায় মোহনকে যেন দোল খাওয়াতে লাগলো।  
মোহন হঠাৎ বলে উঠলো,—বড্ড ভাল হয়ে গেছে ছালালী, আড়াশীটা  
আজ নিয়ে আসতুম।

দুলালীর গানের সঙ্গে মোহনের আড়বাঁশী, সত্যিই চমৎক  
হতো।

স্বপ্নাবিষ্টের মত দুলালীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একদ  
চেয়ে আছে মোহন। বাইরের জগৎ যেন হারিয়ে গেছে ওদের কাছে  
হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে সামনের গাছপালা ঝুলোকে শোঁ  
শক্ষে তুলিয়ে দিয়ে গেল; ঈশান কোনে মেঘ উঠেছে, মোহনের হঠাৎ  
চমক ভাঙলো। আকাশের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল  
মোহন,—এই বেলা চল পালাই।

দুলালী তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। কালবৈশাখীর মেঘ তখ  
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে নেমে এল  
পাহাড় থেকে। মাটির কলসিটা কঁকের উপর তুলে নিয়ে দুলালী ব  
উঠলো,—তাড়াতাড়ি এবার ঘরে ফিরতে হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে—অ  
পালাই।

কাঁড় পেগুকাটা কঁকের উপর তুলে নিলে মোহন। কন্ কন্ শ  
হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো। কলসি কঁকে দুলালী তখন ছুটতে আস  
করেছে, ঝড়বৃষ্টির গতিক দেখে মোহন আবার পিছন থেকে ডাক দি  
দুলালীকে। দুলালী একটু থমকে দাঁড়ালো, মোহন তাড়াতাড়ি ছু  
গিয়ে বললে,—আর, একটুখানি থেমে যা,—ভিজ়ে যাবি যে; ও  
কুঁড়েটায় গিয়ে ঢুকে পড়ি চল।

দুলালী মাথায় ঝানিক কাপড় টেনে দিয়ে বললে,—তাই চল, জ  
না ছাড়লে আর যেতে পারবো।

নদীর ধারে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। ধানক্ষেতে পাহারা দেবার জ  
কয়েক মাস আগে ওটা তৈরি করা হয়েছিলো। ধান উঠে যাওয়া  
পর থেকে এমনি ওটা ফাঁকাই পড়ে আছে। মোহন আর দুলালী

ত ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়লো কুঁড়ের মধ্যে। ঝড়ের দোলায় থেকে  
ক'লে উঠতে লাগলো কুঁড়েখানা, আশপাশের ফুটো দিয়ে  
শৌ শবে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকতে আরম্ভ করেছে। দরজার আগুড়টা  
র থেকে টেনে ধরে' একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে  
ন। কালবৈশাখীর ঝড়, কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক আবার করসা  
গেল। দুলালী বেন এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, এবার তাকে  
ফিরতে হবে,—ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে।

দোরের আগুড়টা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে মোহন। বাইরে তখন  
কার ঘনিয়ে এসেছে, কোঁটা কোঁটা বৃষ্টি পড়ছে তখনো।

নদীর ওপার থেকে জোরগলায় হঠাৎ কে হেঁকে উঠলো,—দুলালী—  
লী আছিস—ও দুলালী!

দুলালী আর মোহন চমকে উঠলো ছুঁজনেই। রাবণ মাঝির গলার  
গাজ, দুলালীকে সে খুঁজতে এসেছে।

কুঁড়েঘরের বাইরে এসে দুলালীকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো মোহন।  
হা সেই অন্ধকারে দূর থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কিন্তু  
গবে চুপ চাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত ধরা পড়ে যেতে  
। দুলালী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—আমি এবার পালাই—ওই  
দিয়ে, তুই ও শিগ্গীর বাড়ী চলে যা।

মোহন বললে,—অন্ধকারে একলা যাবি কেমন করে, আমি না  
ধানিক দাঁড়িয়ে দিয়ে আসি।

দুলালী বাদা দিয়ে বললে,—না—না—একলা আমি ঠিক যেতে  
বো।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো দুলালী।  
ছুঁইয়ের পাশ দিয়ে শরমানার ধারে ধারে গুঁড়ি বেয়ে সে এগিয়ে

চললো বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। এপারে মোহন মাঝি ধান ক্ষেতের  
আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠলো গিয়ে সদর রাস্তায়।

ওপার থেকে রাবণ মাঝি থেকে থেকে ডাক দিচ্ছে,—দুলালী—দুলালী !

দুলালী তখন রামপুরের ধারে, মোহনও প্রায় ঘুসরুকাটার  
কাছাকাছি।

## তিন

টুশকী মেঝেন, দুলালীর মা। দুলালীর বিয়েটা হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ার  
পর থেকে টুশকী একটু মনমরা হয়ে পড়েছে। মোহনের মত ছেলে  
দৈবাৎ যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর আপসোসের শেষ থাকবে  
না। টুশকী মেঝেন জানে—দুলালী আর মোহন দু'জনেই ভালবাসে  
দু'জনকে। টুংরার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে হলে কল তার কোন দিক  
দিয়েই ভাল হবে না। দুলালীর মুখে হাসি নাই, সংসারের কাজ-কশ্মে  
উৎসাহ তার দিন দিন যেন কমে আসছে। দুলালীর মনের ভাব  
টুশকী মেঝেন বুঝতে পারে সবই, দুলালীর সে মা। কিন্তু বুঝেও কিছু  
করবার তার উপায় নাই, রাবণ মাঝির গোঁ, যে কথা সে মুখ দিয়ে  
একবার বের করবে, তার আর নড়চড় হবার উপায় নাই। সেদিন যদি  
জোর করে মোহনের সঙ্গে দুলালীর বিয়ে দিয়ে দিতো রাবণ, কি করতো  
টুয়াই মাঝি ! কিন্তু সালিসের বিচার রাবণ মাঝি মেনে নিয়েছে, ব্যস—  
আর তাকে টলায় কে। ভুলেও সে একবার ভেবে দেখলে না মেয়েটার  
কথা। টুংরার সঙ্গেই যদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিতে হয় দুলালীর,  
মেয়েটা যে কোনমতেই স্থখী হতে পারবে না—রাবণ মাঝি সে কথাটা

একবারও ভেবে দেখলে না। টুশকী মেঝেন এর জন্ত কত ঝগড়া করেছে রাবণ নাঝির সঙ্গে, রাবণ নাঝি কিন্তু নির্বিকার, টুশকীর কথায় অক্ষিপ করে না রাবণ ; যা করবার সে ঠিকই করে যাবে।

দুলালীর বিয়ের দিন আবার কাছিয়ে আসছে। নতুন ক'রে উত্তোগ আয়োজন সব কিছুই আবার করতে হচ্ছে টুশকী মেঝেনকে ; মেয়ের বিয়েতে নিশ্চেষ্ট থাকা তার কোন রকমেই চলে না, মেয়ের যে সে মা, সংসারের সকল দায়িত্ব যে তারই উপর।

কতকগুলো নোরান ধান সিদ্ধ ক'রে এক জায়গায় শুকিয়ে রেখেছে টুশকী মেঝেন, ধান ভেনে চাল করতে হবে বরিয়াতদের ভোজের জন্ত। লোকজনের সমারোহ আগেরবারের চেয়ে এবার অনেক বেশি হবে, বরযাত্রী আসবে প্রায় ডবল, ঘুদুরুকাটা আর ভালুকপোতা—লোক-সংখ্যায় কোন দলই কম হবে না। রাবণ নাঝি তাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে ডবল মাত্রায়, সে দিক দিয়ে কোন ক্রটি করা চলবে না। টুশকী মেঝেন রাবণ নাঝির ব্যবস্থা মত উত্তোগ আয়োজন ক'রে যাচ্ছে সবই, কিন্তু ভিতর থেকে সে যেন বেশ সাদা পাচ্ছে না। কদিন থেকে বাঁ-চোখটা তার নাচছে, লক্ষণ বেশ ভাল মনে হয় না শকীর ; কে জানে, মেয়েটার বরাতে যে শেষ পর্যন্ত কি আছে !

পাড়ার দু'টি মেয়ে রাবণ নাঝির টেকিশালায় টেকির উপর চড়ে ন ভানছে, টেকির গড়ে হাত বুলুচ্ছে দুলালী। টুশকী মেঝেন টেকির ক পাশে বসে কুলো দিয়ে চাল ঝাড়ছে, সামনে তার রাশিকৃত হয়ে ঠেছে তুখ আর কুঁড়ো। ক্যাক ক্যাক ক'রে শব্দ উঠছে টেকির যা দুটো থেকে। তারই তালে তাল দিয়ে ভানাড়ীরা গান ধরেছে,—  
ওতালদের ডাঙ্গানিয়া গান। দুলালীও গেয়ে যাচ্ছে ওদের সুরে হর মিলিয়ে। টুশকী মেঝেন একমাত্র শ্রোতা, গান শুনতে শুনতে

কত কথাই ওর মনে হচ্ছে। তারও একদিন ছিলো, বয়েস কালে নাচ আর গান নিয়ে সেও একদিন মেতে থাকতো। 'ছাতা পরবের' মেলায় টুশকী মেঝেনের নাচ দেখে রাবণ মাঝি তাকে পছন্দ ক'রে এসেছিলো। সেই বছরই ফাগুন মাসের শেষের দিকে শালুই পূজোর ঠিক আগের দিন রাবণ মাঝির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। রাবণ মাঝি তখন কি সুন্দর মাদল বাজাতো। সে আজ প্রায় দেড়কুড়ি বছর আগের কথা, টুশকী যেদিন নতুন বৌ সেজে রাবণ মাঝির ঘর করতে এসেছিলো। টুশকীর শশুর বুড়োর আমলে পাচ বিঘা ডাঙ্গা জমির চাষ ছিলো মোটে। রাবণ মাঝি নিজের হিম্মতে আজ পাচ খানা লাঙ্গলের মালিক। বড় কোঠাঘরপানা যেখানে তোলা হয়েছে ওখানটার আগে শৃঙ্গোরের খোঁয়াড় ছিলো, ছোট একটা চান্দাঘরের পাশে। উঠানের একধারে কদম গাছের ছায়ায় ছোট ছোট দু'টি কালো রঙের নামড়া বান্ধা থাকতো, হালের হেতের। গোয়াল ঘরের পিছন দিকটা ছিলো ফাকা ডাঙ্গা। বুড়ো মাঝি—রাবণ মাঝির বাপ—কুন্ডি কলাই বুনতো। ওই ডাঙ্গাটার। কোন বছর বা খেটে খুটে দু'পাঁচসের পাওয়া যেতো, কোন কোন বছর মুরগী চ'রেই সাবাড় ক'রে দিতো বীজ শুক। বুড়ো মাঝি শেষে দিক ঘেরে ছেড়ে দিয়েছিলো কুন্ডি বোনা, বাড়ীর পিছনে খাঁ খাঁ করতো শুকনো ডাঙ্গাটা। সেই ডাঙ্গার চারিদিকে দেওয়াল তুলে মস্তবড় থামার ক'রে নিয়েছে রাবণ মাঝি, আজ আর তাদের অভাব কিছু নাই। ঘরসংসার গড়ে তুলতে কি খাটনিই না খেটেছে একদিন টুশকী মেঝেন। টুশকী নৈলে রাবণ মাঝির ঘর চলতো না একটি দিনও, টুশকী মেঝেনের কর্তৃত্ব বরাবর যেনে এসেছে রাবণ মাঝি। আজ কিন্তু ছালাসীর বিয়ের ব্যাপারে কোন কথাই শুনলে না সে টুশকী মেঝেনের, পাঁচজনের সাক্ষাতে যে স্বপ্ন একবার যেনে নেওয়া হয়েছে—তার

আর কোন নড়চড় হবার উপায় নাই, মেয়ের ভাগ্যে তাতে যাই  
না ঘটুক।

বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদ্দুর খা খা করছে সারা উঠান জুড়ে, বেলা  
প্রায় দুপুর। দো-বাড়ীতে লাল্লল দিয়ে রাবণ মাঝি বাড়ী ফিরলো।  
বলদ ভুট্টোকে দোর গোড়ায় খুলে দিলে রাবণ মাঝি, তারপর সে হাল  
জোঁয়াল আর জুড়নের দড়িগাছটা তুলে দিলে গিয়ে গোয়াল ঘরের  
আড়াচে। রাবণ মাঝির সাড়া পেয়ে টেকিশাল থেকে বেরিয়ে এলো  
হুলালী, পাতকুয়া থেকে এক ঘটা জল তুলে তাড়াতাড়ি সে রাবণ  
মাঝির হাতে দিলে। হাত পা ধুয়ে বড়ঘরের চালায় একটা চাটাই  
পেতে বসে পড়লো রাবণ, গা দিয়ে তার কল্ কল্ ক'রে ঘাম ঝরছে।  
হুলালী একখানা গামছা রাবণ মাঝির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,  
—খানিক বাওড় ক'রে দিব বাবা, গা-টা রোদে পুড়ে গেল যে।

রাবণ মাঝি গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে,—না—ত,  
কিস্কে উসব, আমাদের আবার রোদ আর বিষ্টি।

রাবণ মাঝি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে,—ই ভাল কথা, তোরা বেড়ি  
কাঁকুড়ে জালি ধরেছে; কাঁকুড় যা এবার ফলবে হুলালী—জালি পড়েছে  
একেবারে ঘুঙুর গাঁথা হয়ে। যাস কাল একবার নাঠদিকে, কাঁকুড়গুলো  
তোরা দেখে আসবি।

হুলালীর মুখখানা খুশির আমেজে ভরে উঠলো। আখবাড়ীর ধারে ধারে  
সখ ক'রে সে বেড়ি কাঁকুড়ের বীচি পুতেছে এবার নিজের হাতে। হুলালী  
খুব খুশী হয়ে বললে,—গোড়াগুলো খানিক কুঁড়ে দিয়ে এলি ত ?

রাবণ মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—বা রে, তুই খাবি কাঁকুড়, আর  
বুড়োহাবড়া গতর নিয়ে আমি মরবো মাটি কুঁড়ে ! সেটি হবেক নাই,  
তোরা গাছ তুই নিজে কুঁড়বি।



রাবণ মাঝি হো হো ক'রে হেসে উঠলো নিজের মনেই। হাতের কাজ ফেলে হৈ হৈ ক'রে ছুটে এলো টুশকী মেঝেন, পাতনার ভিজে ধানে মুখ ডুবিয়ে বলদ দুটো ধান খেতে আরম্ভ করেছে, কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ঢুলালী তাতাতাড়ি বলদ দুটোকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে গোয়াল ঘরে বেঁধে দিয়ে আঁটি কয়েক খড় ফেলে দিলে মুখের সামনে। টুশকী মেঝেন হেসেল ঘরে ঢুকলো গিয়ে রাবণ মাঝির পাক্সা ভাতের ব্যবস্থা করতে।

‘দা-মাড়ি’ খাওয়া শেষ ক'রে রাবণ মাঝি একটা শাণপাতাব চুটি ধরিয়ে বসে বসে টানছে। কিষ্টু মাঝি গোটা কয়েক ছাগলের গলায় লেয়ালির দড়ি দিয়ে বেঁধে পিছন দিক থেকে তাতা করতে করতে রাবণ মাঝির বাড়ী ঢুকলো এসে, ঢুলালীর বিয়ের দিন এগুলো কাছে লাগবে। রাবণ মাঝি ছাগল গুলোর দিকে চেয়ে মনে মনে গুনে নিয়ে বললে,—আর দুটো? সাতটার যে আমি দাম দিয়ে এসেছিলাম মাতলাকে।

কিষ্টু বললে,—ছাগল দুটো কম পড়ে গেল সদ্ধার, কাল রাত্তির বেলা মাতলা মাঝির দুটো ছাগল বাঘে ধরে নিয়ে গেছে, পাহাড় থেকে নাকি বাঘ নানছে রোজই।

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—এ্যা—বলিস কিরে! সেদিন গুনলুম বাবুপুরের কুলুদের একটা দামড়া মেরেছে, রথতলার চৌকিদারকে বাঘে নাকি আঙুলেছিলো সেদিন সদ্ধার সময়—মদ দোকান থেকে ফিরবার পথে। বাঘটাকে মারতে না পারলে ত বিলকুল ডামাডোল ক'রে দিবক দেখছি।

কিষ্টু বললে,—ও গায়ের মাঝিরা সেদিন উঠেছিলো পাহাড়ে, বাঘ কিন্তু মারতে পারে নাই। বাঘটা গুনছি ঝিঙেফুলি!

রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত ভাবে বললে,—এ্যা—ঝিঙেফুলি, তাহলে

ত মাছ মাঝবেক। চল একদিন জুটে পুটে সব, যেমন করে হোক।  
ওটাকে শেষ করতে হবে।

কিষ্টু মাঝি কাপড়ের খুঁট থেকে কয়েকটি টাকা বের ক'রে রাবণ  
মাঝির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—ছাগল দুটোর দাম মাতলা ফিরে  
দিয়েছে।

রাবণ মাঝি বললে,—তাহলে ? ছাগল যে আরও চাই।

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—ছাগল আমি দুটো ঠিক করে এসেছি  
সদ্যর, ধবোনার লছো মাঝির ঘরে ; কালই গিয়ে নিয়ে আসবো !

রাবণ বললে,—টাকা গুলো তবে তোরই কাছে রেখে দে।

কিষ্টু মাঝি আবার যত্ন ক'রে টাকা কয়েকটা বেঁধে রাখলে কাপড়ের  
খুঁটে। রাবণ মাঝি থানিকটা শুকনো তাম্বাক পাতার টুকরো আর  
শালপাতার গোটা দুই ফালি কিষ্টুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,  
—চুটি থা।

খইনির টুকরোটাকে গুঁড়ো করে শালপাতার নলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে  
চুটি বানতে লাগলো কিষ্টু। আগুন ঠেকিয়ে চুটিটা ধরিয়ে টানতে  
টানতে বললে—ডিংলে বেচবি সদ্যর ? ভান্ধাহীড়ের কায়েত ঘরে  
বিয়ে লেগেছে, কুড়ি দেড়েক ডিংলে চাই ওদের, কাল তোর কাছে  
ওরা লোক পাঠাবে।

রাবণ মাঝি চুটির দোয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—ডিংলে ত আমার  
দেওয়া চলবেক নাই, কুড়ি তিনেক ডিংলে পড়ে আছে মাঠে, দুলালীর  
বিয়েতেই বেবাক শেষ হয়ে যাবে।

কিষ্টু বললে,—আমিও ত সেই কথাই বললুম। কায়েতরা  
কি বলে জানিস ডিংলেকে ? বলে কুমড়ো, ডিংলেকে বলে  
কুমড়ো !

• নিজের মনেই হিহি করে হেসে উঠলো কিষ্টু। রাবণ মাঝি হাসতে হাসতে বললে,—বলিস কিরে, ডিংলেকে বলে কুমড়ো ; কুমড়ো ত দুগ্গো পূজার সময় বলিদান দেয় বাবড়ে ঠাকুররা।

হো হো ক'রে আর এক চোট হেসে উঠলো দুজনই। রাবণ মাঝি টুশকী মেঝেনকে একটা হাঁক দিয়ে বললে,—মদের ভাঁড়টা একবার আন দেখি।

পচুই মদ এরা বাড়ীতেই তৈরি ক'রে খায়। টুশকী মেঝেন একটা ভাঁড় হাতে ক'রে হেঁসেল ঘরে ঢুকলো গিয়ে মদ তৈরি করতে।

কিষ্টু মাঝির বৌ মহল দিয়ে কয়েক সের ধান নিয়ে গেল টুশকী মেঝেনের কাছ থেকে, রাবণ মাঝি দূর থেকে সেটা লক্ষ্য করেছে। কিষ্টুর দিকে চেয়ে রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—এখন থেকে মহল বেচছিস কেনে কিষ্টু ? বর্ষায় যে ওর দান উঠবে ডবল।

কিষ্টু মাঝি অভাবী লোক, অনেকগুলি কাছা বাছা ছেলে পিলে নিয়ে কিষ্টু একটু কাবু হয়ে পড়েছে। মহল না বেচে উপায় কি তার ! ধরতে গেলে আজ কাল ওদের মহল বেচেই কোনরকমে দিন চালাতে হয়। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে কিষ্টু,—কি করবো সম্ভার, মহাজনের দেড়ি শুধতেই ধান ক'টা সব কুরিয়ে গেল বেবাকু, ভয়ানক টানাটানি চলছে কিছু দিন থেকে।

রাবণ মাঝি একটু উম্ম কণ্ঠে বললে,—আনাকে সে কথা জানাস নাই কেনে ?

কিষ্টু মাঝি একটা ঢোক গিলে বললে,—গত বছরের দেবী তোর এখনো শুধতে পারি নাই, তার উপর—

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—তা বলে কি ছেলে পিলে গুলোনকে না খাইয়ে মারবি। মাপ খানেক ধান কাল নিয়ে যাবি এসে, আগন রাসে শোধ ক'রে দিস।

কিছু মাঝির মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। সময় অসময় বহু লোককেই ধার কর্জ দিয়ে দায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হয় রাবণ মাঝিকে, অভাবে পড়ে কেউ তার দ্বারস্থ হলে খালি হাতে তাকে ফিরতে হয় না প্রায়ই। রাবণ মাঝির অবস্থা খুব আঁটা, সেই সঙ্গে মনটাও তার খাটো নয় কোনদিক থেকেই।

কিছু আর রাবণ পালাপালি ক'রে নদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে।

দূর থেকে হঠাৎ কিসের যেন একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল, বহুলোক যেন একসঙ্গে চীৎকার করছে। ব্যাপারটা ধারণা করবার পূর্বেই পাশের গাঁয়ের জনকয়েক সাঁওতাল তীর ধনুক হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো। রাবণ মাঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি রে—সব ব্যাপার কি ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো একজন,—পাহাড় থেকে বাঘ নেমেছে সন্দার, আমরা ওটাকে তাড়া করেছি। তোরা শুদ্ধ ছুটে আয় সন্দার, বাঘটাকে ঘেরাও করতে হবে। হুই—হুই দেখ—হুই যাচ্ছে—পলাশ বনের ধারে।

রাবণ মাঝি পাড়ার লোকদের ছকুম দিলে,—শিগ্গীর যেন তারা বেরিয়ে পড়ে লাঠি ধোঁটা তীর ধনুক নিয়ে, এক লহনা আর দেরি করা চলে না, বাঘটাকে মারতেই হবে।

চটপট সব তৈরি হয়ে রাবণ মাঝির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো প্রায় কুড়ি চারেক সাঁওতাল। অগ্নাগ্র দলের সঙ্গে মিশে বাঘটাকে ওরা দূর থেকে তাড়া করতে লাগলো। একসঙ্গে সব হৈ শব্দে চীৎকার ক'রে চলেছে,—হেইয়ো—হেইয়ো—হেলে লে লে—লেলে লেলে হৈ—!

পলাশ বন পার হয়ে কাটিজঙ্গলের আশেপাশে গোটাকয়েক চক্রর ঘেরে বাঘটা তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেছে পাহাড় দিকে মুখ ক'রে। পিছন থেকে জনতার চীৎকার উঠছে,—হে-লে-লে-লে-লে-লে-লে-লে-হৈ—।

## চার

বাঘটাকে সেদিন তাড়া ক'রে ক'রে বণ্ঠে হারবাণ করা হলো, কিন্তু ওর নাগাল পাওয়া গেল না শেষ পর্য্যন্ত। এতগুলো লোকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বাঘটা যে কখন আশে পাশে চক্কর মারতে মারতে পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠে পড়লো—কিছুমাত্র বোকা গেল না। খোঁজ করতে করতে সন্ধ্যা লেগে গেল। অন্ধকারে পাহাড়ে উঠে লাভ নাই কোন, বাঘ মারা স্থগিত বেথে শিকারীদের সেদিন বাড়ী ফিরতে হলো।

পাহাড়ের চারিদিকে শালগাছের দুর্ভেজ জঙ্গল, নীচে থেকে আরম্ভ ক'রে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত সমস্তটাই গাছপালায় ঢাকা। পাহাড়ে উঠবার রাস্তা আছে দু'তিনটে, অতি সঙ্কীর্ণ সরু পথ দিয়ে খুব সাবধানে উঠে যেতে হয়। পাহাড়টা খুব বড় নয়, মাকানাকি। এ পাহাড়ে বড় বাঘ খুব কমই আসে, ভালুক, আধবাঘা, হেঁড়োল বা চিতাবাঘ মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। তরুণীর পাহাড় থেকে বড় বাঘও কখনো কখনো এসে পড়ে এক আধটা। কোনটা বা দু'চার দিন থেকে নিজের থেয়ালেই চলে যায় আবার অগ্নি পাহাড়ে, কোনটাকে বা চেষ্টা ক'রে তাড়াতে হয়। ওদের মধ্যে এক আধটা আবার সাঁওতালদের হাতে মারাও পড়ে যায়; এই হলদিগড়ের পাহাড়েই বাঘ এর আগে অনেকগুলোই মারা পড়েছে। পাহাড়ের চারিদিকে দু'এক মাইলের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো সাঁওতালদের বাস্তু, বাঘ এলে এদেরই হয় মুশ্কিল; মানুষ অবস্থা বড় বেশি মারা পড়ে না, কিন্তু গরুবাছুর ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় প্রায়ই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়ের উপর বাঘটাকে সেদিন ছেড়ে দিয়ে সাঁওতালরা বাড়ী ফিরে গেল। যুক্তি স্থির হলো পরদিন দুপুরবেলা দু'

চপানা গায়ের সাঁওতাল মিলে লাগরা বাজিয়ে সব পাহাড়ে উঠবে  
 য়ে। যন্ত একটা পাথরের হুঁদ আছে পাহাড়ের চূড়ায়, বাঘটা সম্ভবতঃ  
 এই হুঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অভ্যাগত জন্তুজানোয়ার এসে  
 ধারণতঃ আড্ডা নেয় ওই হুঁদটার মধ্যে। লাগরার শব্দ ক'রে বা  
 মাগা দিয়ে বাঘকে সেখান থেকে বের করতে হবে যেমন ক'রে হোক।  
 এটাকে কোন রকমে মারতে না পারলে কারো কল্যাণ নাই।

এর আগে সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে লোকজন এসে কতবার  
 গুলি ক'রে বাঘ মেরে গেছে এই হলদিগড়ের পাহাড়ে। ডের দিন আগের  
 কথা, সে-বার এক পুলিশের ইন্সপেক্টর এসেছিলেন হলদিগড়ে বাঘ  
 মারতে। সে একটা স্বরণীয় ঘটনা। এ অঞ্চলের জন তিরিশেক  
 চৌকিদার আর কুড়ি তিনেক সাঁওতালের ডাক পড়েছিলো শিকারের কাজে  
 মদত দিতে। ঠিক এমনি গ্রীষ্মকাল, পাহাড়ের চারিদিক লোকজন দিয়ে  
 ঘেরাও করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর সাহেবের ঘাড়ে বন্দুক, চারিদিক  
 থেকে বাজনার শব্দ করতে করতে দলবল নিয়ে তিনি পাহাড়ে উঠছেন,  
 পিছনে তাঁর থানার ছোট দারোগা, অর্থাৎ জমাদার সাহেব, তাঁর পিছনে  
 পুলিশের এক সর্দার; তাঁদের ঘাড়েও বন্দুক। আশেপাশে কয়েকজন  
 চৌকিদার বল্লম হাতে ইন্সপেক্টর বাবুদের ঘেরাও ক'রে চলেছে বাঘ  
 মারতে, সকলের দৃষ্টি সজাগ এবং সতর্ক।

বাঘ এই পাহাড়েই আছে, বাঘে বাঘে গর্জন শোনা যায়। হলদিগড়  
 গায়ের অনেকেই নাকি নিজের চোখে দেখেছে শ'ঘটাকে পাহাড়গোড়ায়  
 ঘুরে বেড়াতে, প্রকাণ্ড ঝিঙেফুলি বাঘ। গরু ছাগলও কয়েকটা মারা পড়ে  
 গেছে, বহু চেষ্টা ক'রেও বাঘটাকে কেউ মারতে পারে নি। সংবাদ পেয়ে  
 ইন্সপেক্টর সাহেব নিজে এসেছেন বাঘ মারতে। পাহাড়ের চারিদিক  
 লক্ষ্য করতে করতে লোকলব্ধর সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের উপর তিনি উঠে

• যেতে লাগলেন, খুব সাবধানে। যে কোন মুহূর্তে বাঘ হয়ত সামনে পড়তে পারে।

পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি উঠে গেছে শিকারীর দল, ঝোপের আড়াল থেকে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো,—বাঘ—বাঘ—ছজুর, ওই দেখুন বাঘ।

মুহূর্ত মধ্যে সজাগ হ'রে উঠলো সকলেই। সর্দার বাবুর ঘাড়ে ছিলো একটা বন্দুক, 'বাঘ' 'বাঘ' শব্দ শুনেই বন্দুকটা সেইদিকে উচিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে। 'গুড্‌ম' ক'রে একটা আওয়াজ হলো, ধপ্‌ ক'রে পড়লো কি একটা মাটির উপর; ঝোপের ওপাশ থেকে হঠাৎ চীৎকার উঠলো,—উঃ নাগো—গেলুম, সর্দার বাবু—এ আপনি কি করলেন সর্দার বাবু!

চমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। সর্দার বাবুর পা টলছে, শিকারে বেরোবার আগে মদ খেয়ে তিনি রীতিমত নেশা ক'রে এসেছেন। নেশার ঝোঁকে তিনি বাঘ বাঘ শব্দ শুনেই বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছেন, চোখ মিলে চাইবার আর অবসর পান নি। নেশার ঘোরে সর্দারবাবু টৌর হয়ে আছেন।

কাছে গিয়ে দেখা গেল একটা সাঁওতাল চৌকিদার আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটির উপর, বুক বেয়ে তার ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে, বন্দুকের গুলিটা এপার ওপার হয়ে গেছে বুকের মধ্যে। দেখা শুনে ইন্সপেক্টর বাবুর আঁকল গুড্‌ম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন,—ওরে নামা—নামা—পাহাড় থেকে একে নামা, শিগ্‌গীর হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

সর্দার বাবুর কোনদিকে ভ্রক্ষেপ নাই, টলতে টলতে তিনি এগিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেবের সামনে দাঁড়ালেন। ইন্সপেক্টর সাহেব বলে

লেন,—সদ্য—এ তুমি কি করলে সদ্য, কি সর্বনাশ—তোমার যে  
বার বন্দকের লাইসেন্স পর্যন্ত নাই।

সদ্যর হাত থেকে ছোট দারোগা বন্দুকটা কেড়ে নিলেন। আহত  
দাক্তার ক্ষতস্থানে বেশ শক্ত করে কাপড় বেঁধে ধরে পাকড়ে তাকে  
হাড় থেকে নানানো হলো নীচে। ক্রোশ তিনেক দূরে জেলাবোর্ডের  
হাট একটা হাসপাতাল, ডুলি করে কয়েকজন চৌকিদারের জিম্মায় সেই  
হাসপাতালেই লোকটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মানিবা সব এ ব্যাপারে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মৌজার  
গোমস্তা পচন মাহাতো পুলিশের লোকের বিশেষ অভ্যুত্থানজন, তাঁদেরি  
কাজে মদৎ দিতে এসেছে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে একান্তে চুপি চুপি  
ডেকে একটু ভীতকণ্ঠে বলে উঠলো পচন মাহাতো,—কাজটা খুব খারাপ  
হয়ে গেল হুজুর! আপনারা এফুনি এখান থেকে সরে পড়ুন, নৈলে  
সাঁওতালরা হয়ত হাঙ্গাম বাধাবে; যদি বাঁচতে চান—শিগ্গীর  
পালান।

টাই টাই করে বুক কাঁপছে ইন্সপেক্টর সাহেবের। হতভম্বের মত  
তিনি বলে উঠলেন,—শিগ্গীর পথ দেখাও গোমস্তা, কোন্ দিক দিয়ে  
পালাতে হবে দেখিয়ে দাও খুব শিগ্গীর।

গোমস্তা পচন মাহাতো ইন্সপেক্টর বাবুদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে  
চুপি চুপি পালিয়ে যাবার একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিয়ে চটপট সরে  
পড়লো নিজেও। ইন্সপেক্টর সাহেব আর বিকৃত্তি না করে ঘন জঙ্গলের  
মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে সেখান থেকে সরে পড়লেন দলবল সমেত।

সাঁওতালরা সব পাহাড়ের নীচে এসে এক জায়গায় জমা হতে  
লাগলো। চৌকিদারকে গুলি করার ব্যাপার নিয়ে সকলেই অতিনাত্রায়  
চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সকলের মুখেই এক কথা,—মালুম মারতে কে



ডাকলেক উয়াদিকে, বঁদুক ছুঁড়তে জানে না ত বাঘ মারতে এসেছিলো কেনে,—এই ধরণের আরও বহু মন্তব্য ।

সাঁওতালরা সব ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো, বললে,—মারবো আমরা সেই লোকটাকে—কাঁড় দিয়ে বিধে মারবো, যে আমাদের চৌকিদারকে গুলি করেছে । সাঁওতাল সর্দার গর্জে উঠলো রাগে, বললে,—ঘেরাও কর বেটাদের, চারদিক থেকে ঘেরাও ক’রে ফেল শিগ্গীর । বেটারা সব গেল কোন্ দিকে ?

একটা লোক এসে খবর দিলে,—হলদিগড়ের গোমস্তা পচন মাহাতো শিকারীদের চুপি চুপি পাহাড় থেকে সরিয়ে দিয়েছে ।

পাহাড়ের খুব কাছাকাছি হলদিগড় গ্রাম । বিষ্ণুক সাঁওতালের দল মরিয়া হয়ে ছুটে চললো গাঁয়ের দিকে মুখ ক’রে । গোমস্তাকে পাকড়াও করতে হবে আগে, পুলিশের লোকগুলোকে যদি সে আবার ধরিয়ে দিতে না পারে—ওকে আজ কেউ আস্ত রেখে বাড়ী ফিরবে না । ধরতেই হবে লোকগুলোকে যেমন করে হোক ; নাহুব মারার প্রতিশোধ তাদের নিতে হবে নাহুব মেরে, এই তাদের বিচার । পচন মাহাতোর ঘরবাড়ী ওরা চারদিক থেকে ঘেরাও করলে গিয়ে । গোমস্তা পচন মাহাতো এই রকমেরি একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলো । তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ঘরদোরে তালা বন্ধ করে দিয়ে পাচিল টপ্কে সে খিড়কি দিয়ে সরে পড়েছে সাঁওতালরা গিয়ে পৌছবার আগেই ।

গোমস্তাকে ধরতে না পেরে বিষ্ণুক সাঁওতালের দল আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলো । হলদিগড় থেকে বেরিয়ে তীব্রবেগে ওরা ছুটলো আবার জঙ্গলের পথ ধরে, পুলিশের লোকগুলোকে যদি কোন রকমে ধরতে পারা যায় । তীব্র-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ের বেগে ওরা ধাওয়া ক’রে গেল প্রায় ক্রোশ দুয়েকের উপর, কিন্তু শিকারীদের কোন সন্ধানই আর পাওয়া

গেল না। হতাশ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ফিরে আসতে হলো সাঁওতালদের। ফিরবার মুখে মাঝ পথে খবর পাওয়া গেল—আহত সেই চৌকিদারটা হাসপাতালে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়ে গেছে।

বাপারটা ঘটেছিলো বছর পনের আগে। বাঘ শিকার করতে গিয়ে মানুষ শিকার হলদিগড়ের ইতিহাসে বিশেষ একটা স্মরণীয় ঘটনা। তারপর থেকে বাইরের কোন শিকারী এ পাহাড়ে আর বাঘ মারতে আসেনি কেউ আজো। এবার যে ঝিঙেফুলি বাঘটা এসে গরু-ছাগল মারতে আরম্ভ করেছে চারিদিকে, যথাসময়ে এ সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে থানায়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত সার্কেলের সর্দার বাবু ঢোল সহরতে জানিয়ে দিয়েছেন,—বাঘটাকে যে মারতে পারবে—সরকার পক্ষ থেকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে। সাঁওতালদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে, শুধু পুরস্কারের লোভেই নয়—এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য একটা কাজের মধ্যে, এটা তাদের নেশা।

বাঘটাকে সেদিন পাহাড়ের উপর ছেড়ে দিয়ে সাঁওতালরা বাড়ী ফিরে গেছে। পরদিন দুপুর বেলা বেশ ভাল রকম তৈরি হয়ে একসঙ্গে সব পাহাড়ে উঠবার কথা। রাত্রে ভাল ঘুম হলো না টুংরা মাঝির, সারা রাত সে বিছানায় পড়ে পড়ে বাঘটার কথাই ভেবেছে। যে বাঘ তার চোখের উপর দিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় টুংরা মাঝির ঝাঁড় দেখুককে ফাঁকি দিয়ে—আবার তাকে খুঁজে বের ক'রে যতক্ষণ না একটা ধারালো তীর ওই বাঘের বুকে বসিয়ে দিতে পারছে টুংরা, ততক্ষণ সে কোনমতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। ভয়ানক শিকারী এই টুংরা মাঝি, শিকারের কাজে সাহস এবং দক্ষতা ওর অসাধারণ। লোকটাকে দেখতে এমনি হাবাগোবা, রোগা লিকলিকে কুশী একটা চেহারা, সংসারের সে বিশেষ কোন কাজেই আসে না; কিন্তু

- শিকারের বেলা টুংরা যেন অশ্রু নাহুয, ঝাঁড়খেছুকে হাত একেবারে পাকি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পাড়ার কয়েকটা ছোকরাকে ডেকে হেঁবে জোটাও করলে টুংরা, বাঘ মারতে যেতে হবে হলদিগড়ের পাহাড়ে। দুপুরবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা টুংরার পক্ষে অসম্ভব; বাঘটাকে দেখে অবধি হাত ওর নিশাপিশ করছে।

ভালুকপোতার কয়েকজন সাঁওতাল বেরিয়ে পড়লো টুংরা মাঝির সঙ্গে। বাঘ যদি বেরোয় মন্দ কি, মারতে পারলে গাঁয়ের একটা নাম যশ আছে। 'বীরসিরিং' \* গাইতে গাইতে টুংরার দল পাহাড়ে উঠলো। পাহাড়ের চূড়ায় মস্ত একটা পাথরের হুঁদ, কয়লা খাদের গ্যালারির মত। হাত আড়াইয়েক চওড়া হবে হুঁদটা, ভিতর দিকে অনেকখানা চলে গেছে সোঁজাশুজি ভাবে। টুংরার দল হুঁদের মুখে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সব চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। হুঁদের মাথায় পাথরের চূড়ার উপর জন দুই তিন সাঁওতাল তীর ধরুক হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তৈরী হয়ে থাকলো, বাঘ যদি বেরোয়, উপর থেকে তীর ছুঁড়বে। হুঁদের ভিতর মুখ বাড়িয়ে, যতদূর দৃষ্টি যায় টুংরা বেশ ভাল করে দেখে নিলে একবার, বাঘের কোন হদিস পাওয়া গেল না। লাগরা বাজিয়ে শব্দ করতে লাগলো ওরা, তবু কোন সাড়া নেই বাঘের। টুংরা বললে,—তাইতো রে, রাতারাতি বেটা ভেগে পড়লো নাকি ?

ওর একজন সঙ্গী বললে,—সম্ভব, লইলে বেটা এতক্ষণ বেগতো।

টুংরা আরও খানিকটা মুখ বাড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল হুঁদের ভিতর, কোন কিছুই দেখা গেল না। হুঁদের ভিতর সোঁজা খানিকটা গিয়ে ঝাঁ দিকে আরি একটা হুড়ুং চলে গেছে, সোঁজাশুজি সেখানটায় নজর চলে না।

---

\* বীরসিরিং—শিকারের গান।

ওই স্ফুটাই হলো জন্তু জানোয়ারের প্রধান আড্ডা, অন্ধি সন্ধি জানা আছে এদের সবই। টুংরা বললে,—খানিক পোয়া কর দেখি।

কতকগুলো শুকনো পালাপাত যোগাড় করে স্ত্রীদের মুখে দোরা করা হলো। শালগাছের ডাল ভেঙ্গে হাওয়া করতে লাগলো জোর ভরতি, সেই সঙ্গে চলতে লাগলো ‘বীরসিরিং’ আর রকমারি চীৎকার। বাঘের কিন্তু সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তাতেও। বহুক্ষণ খেটেখুটে টুংরার সঙ্গীরা সব শেষ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে ; বাঘ হয়ত পাহাড় থেকে সরে পড়েছে। টুংরা কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নয়, হঠাৎ সে বলে উঠলো,—ভিতর দিকের স্ফুট্টা একবার দেখে আসি আনি, দাড়া তোরা স্ত্রীদের মুখে।

কাজটা কিন্তু নিরাপদ নয় মোটেই, ভিতর থেকে জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে পড়লে পালাবার আর পথ পাওয়া যাবে না ; টুংরার সঙ্গীরা ওকে নিষেধ করলে স্ত্রীদের ভিতর ঢুকতে। টুংরা কিন্তু কোন কথাই কানে তুললে না, তাঁর ধনুকটা হাতে নিয়ে তাজাতাড়ি ঢুকে পড়লো স্ত্রীদের মধ্যে ; ওর সঙ্গীরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো স্ত্রীদের মুখে।

স্ত্রীদের ভিতর সোজা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকটায় যেখান থেকে স্ফুট্ট বেরিয়ে গেছে সেইখানটার গিয়ে গুঁড়ি বেয়ে ঝুপ ক’রে এক জারগায় বসে পড়লো টুংরা। ভিতর দিকটা ভয়ানক অন্ধকার, হঠাৎ কিছু দেখা যায় না। টুংরার সাড়া পেয়ে অসংখ্য মশা সাঁই সাঁই শব্দে একসঙ্গে ডেকে উঠলো স্ত্রীদের মধ্যে। কতকগুলো চানচিকে ঝটপট শব্দে পাখা নাড়তে নাড়তে স্ফুট্ট থেকে বেরিয়ে টুংরার মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে উড়তে আরম্ভ করলে বাইরের দিকে। গোটা কয়েক ঝাপটা এসে লাগলো হঠাৎ টুংরার গায়ে মুখে। টুংরা ঐসব গ্রাহ্য করলে না, স্ফুট্টের এক পাশে বসে ভিতর দিকটা সে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিসের যেন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এসে টুংরার নাকে ঢুকছে, নাকটা খানিক টিপে ধরলে টুংরা।

আবছা আলো অন্ধকারের মধ্যে টুংরার হঠাৎ চোখে পড়লো শাদা শাদা কাঠির মত কি যেন কতকগুলো চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। অন্ধকারটা আর একটুখানি কেটে গেলে স্পষ্টই দেখা গেল স্বড়ুংএর মধ্যে ঠাই ঠাই জমা হয়ে আছে স্তূপীকৃত জন্তুর হাড়। কোন কোনটা একেবারে টাটকা, খানিকটা ক'রে কাঁচা মাংস এখনও লেগে রয়েছে। স্বড়ুংএর মধ্যে আরও কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস টুংরার চোখে পড়লো,—ওদিকে একটা আস্ত শেরালের মাথা, এদিকে একটা গরুর ঠ্যাং, আশেপাশে গোটাকনেক ছাগলের শিং, নাঝগানটার কতকগুলো আদপচা নাড়িভুঁড়ি, এই সমস্ত একজায়গায় অল্পস্র জমে উঠেছে। সবগুলো মিলিয়ে স্থানটাকে একেবারে বীভৎস ও ভয়াবহ ক'রে তুলেছে। হলদিগড় পাহাড়ের এই স্ব'দটাই হলো বাঘ ভালুকের প্রধান আড্ডা, এ অঞ্চলের সকলের জানা আছে, দিন দুপুরে পর্য্যন্ত একলা কেউ ভয়ে এর কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু বাঘটা হঠাৎ গেল কোন্ দিকে? যার জন্তে টুংরা মাঝি এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে—তার যে কোন সাড়া শব্দই নাই। বাঘ হয়ত রাতারাতি অন্য কোথাও সরে পড়েছে, কিম্বা হয়ত আছে কোথাও এরি মধ্যে লুকিয়ে, জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। স্ব'দের একপাশে দাঁড়িয়ে শব্দ করতে আরম্ভ করলে টুংরা: —হিড়িক—হিড়িক—হেইও—হে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—

বাইরে থেকে টুংরার সঙ্গীরাও শব্দ করতে আরম্ভ করেছে,—হেইয়ো—হেইয়ো—হে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—লে—

টুংরা হঠাৎ চেয়ে দেখে স্বড়ুংএর ভিতর দিকে আগুনের ভাঁটার মত কি যেন দুটো জল্ জল্ করে জলছে। টুংরার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো, অন্ধকারে বাঘের চোখ ঠিক এমনি করেই জলে, কতবার দেখা আছে টুংরার। বাঘটা হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো, টুংরার সাড়া

পেয়ে জেগে উঠেছে। টুংরা হঠাৎ ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো  
ওর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে,—বাঘ—বাঘ—সুড়ুংএর মধ্যে বাঘ।

বাইরে সব তাড়াতাড়ি কাঁড়খেকু বাগিয়ে ধরে সূঁদের মুখ থেকে  
খানিক সরে দাঁড়ালো। টুংরার গলার আওয়াজ পেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে  
উঠে পড়লো বাঘটা, গৌ গৌ শব্দ করতে করতে সুড়ুং থেকে বেরিয়ে  
বাঘটা হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলে বাইরের দিকে। টুংরা কিন্তু  
বেঁচে গেল খুব, বাঘটা ওর গা বেঁসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল ওর সামনে  
দিয়ে, টুংরাকে হয়ত লক্ষ্যই করলে না। সুড়ুংএর ভিতর থেকে টুংরাও  
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাঘটার পিছু পিছু। বাঘ তখন সুড়ুং থেকে  
বেরিয়ে পাহাড়ের উপর ছুটতে আরম্ভ করেছে, প্রকাণ্ড ঝিঙেফুলি বাঘ।  
টুংরার সঙ্গীরা সব বাঘ দেখে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো, টুংরা মাঝি  
বাঘটার পিছন দিক থেকে শৌ ক'রে ছাড়লে একটা তীর। তীরটা গিয়ে  
বাঘের শিরদাঁড়াতে গেঁথে গেল ঘ্যাচ ক'রে। বাঘটা হঠাৎ পিছন ফিরে  
কখে দাঁড়ালো, সামনা সামনি ছাড়লে টুংরা আর একটা তীর, তীরটা  
এবার বিঁধলো গিয়ে ওর তলপেটে। বিব নাখানো ঝকঝকে ছুঁখানা তীর,  
চুটো তীরই যথেষ্ট। বাঘটা কিন্তু কাবু হলো না তাতেও, টুংরার দিকে  
প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে গর্জে উঠলো; চোখের পলক ফেলতে না  
ফেলতে টুংরাকে লক্ষ্য ক'রে বাঘটা মারলে এক লাফ। পাশে একটা  
ঝোপের আড়ে রূপ ক'রে বসে পড়লো টুংরা, আর এক লাফে বাঘটা গিয়ে  
ঝাঁপিয়ে পড়লো একেবারে ওর সামনে। টুংরার আর পালাবার পথ নাই,  
তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই বাঘটা গিয়ে ওর বুকের উপর জোর ভরতি  
বসিয়ে দিলে প্রকাণ্ড একটা থাবা। টুংরা হঠাৎ তীর ধরুকটা ফেলে দিয়ে  
ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের উপর, এ ছাড়া তার বাঁচবার আর কোন উপায়  
নাই; একলাফে বাঘটার পিঠের উপর চড়ে বসে গলাটা তার শক্ত ক'রে

চেপে ধরলে টুংরা,—বাঘ যেন আর কোন মতেই কামড় দিতে বা থাবা চালাতে না পারে। টুংরাকে পিঠে নিয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলে বাঘটা। টুংরার সঙ্গীরা সব তীর ধক্‌ক হাতে নিয়ে ধাওয়া করলে বাঘের পিছু পিছু, তীর ছুঁড়বার কিন্তু সন্ধ্যা বাওয়া গেল না। বাঘের উপর উগুড় হ'য়ে শুয়ে গলাটা তার ছ'হাত দূর শব্দ ক'রে চেপে ধরেছে টুংরা, তলপেটের ছ'পাশ থেকে পায়ে পায়ে ছাঁদ দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরেছে জোর ভরতি। শাওতালী তীর খেয়ে মরিয়া হ'য়ে ছুটে চললো ঝিঙেফুলি বাঘ, তার পিঠের উপর টুংরা যেন একেবারে ব'সে গেছে দাঁটে।

টুংরাকে নিয়ে হঠাৎ যে একটা এমনধারা কাজ হ'য়ে যাবে, এমনটা কেউ ভাবতে পারে নি। টুংরার সঙ্গীরা সব হুঁচকিতে ভরতে ছুটলো বাঘের পিছু পিছু, টুংরাকে কেনন ক'রে মুক্ত করা যায় এই চিন্তাই শুদের প্রবল হয়ে উঠলো।

বাঘটা পাহাড়ের নীচে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা নালায় নেনে উর্দ্ধ্বাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাঘের পিঠে টুংরা একদম দাঁটে আছে, একেবারে নড়ন চড়ন বিহীন। টুংরার সঙ্গীরা সব ভাবাব্যাক্য মেরে গেছে টুংরার কাণে দেখে, ঝোপের আড়াল থেকে একদৃষ্টে শুধু হা ক'রে চেয়ে আছে বাঘটার দিকে, তীর ছুঁড়বার উপায় নাই, দৈবাৎ টুংরাকেই জখম ক'রে ফেলে। নালায় এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বাঘটা শুধু উর্দ্ধ্বাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। টুংরার সাড়া শব্দ নাই।

ক্রমশঃ কিন্তু হাঁপিয়ে পড়লো বাঘটা কিছুক্ষণের মধ্যেই, পা-গুলো কাঁপতে লাগলো ধর ধর ক'রে, টুংরার বোঝা আর যেন সে বইতে পারছে না, মাতালের মত টলতে টলতে বাঘটা হঠাৎ ধপ্‌ ক'রে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। টুংরার সঙ্গীরা সব তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে উপযুগ্‌পরি

লাঠির আঘাতে বাঘের মাথাটা প্রায় খেঁতনে ফেললে, আর একজন তখন বলম দিয়ে বাঘটার পেটে ফুঁড়ে ধরেছে। টুংরার তীর খেয়ে এবোবারে নেতিয়ে পড়েছিলো বাঘটা, হুড়ের মধ্যে প্রাণ যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো—হাতাহাতি দিলে এরা শেষ ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই। টুংরার হাত দুটো বাঘের গলায় এমনভাবে সঁটে বসে গেছে যে টেনে তাকে ছাড়ানো যায় না। বহুকষ্টে টুংরাকে মুক্ত করা হলো, বুকটা ওর ভিজ্জে গেছে রক্তে; বাঘের থাবায় বেশ ঝানিকটা জখম হয়েছে। চৈতন্যের লেশ মাত্র নাই টুংরার; নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে, কিন্তু কথা কইতে পারছে না। টুংরার সঙ্গীরা ওকে নাড় দিয়ে জোর গলায় ডাকতে লাগলো,—টুংরা—টুংরা!

টুংরার সাড়াশব্দ নাই। গাছতলায় একটা গামছা পেতে টুংরাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। মুখে চোখে জল দিয়ে টুংরাকে হাওয়া করতে লাগলো ওর সঙ্গীরা সব। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর টুংরা আবার ধীরে ধীরে চোখ মিলে তাকালো। টুংরার সঙ্গীদের ধড়ে যেন প্রাণ এলো একক্ষণে, মরতে মরতে টুংরা খুব বেঁচে গেছে আজ।

ধীরে ধীরে টুংরা উঠে বসলো। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে টুংরা যেন অবাক হয়ে গেল। এর মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে; টুংরা ঠিক স্মরণ করতে পারছে না আবছা তার মনে হতে লাগলো কোথায় যেন তারা শিকার করতে বেরিয়েছে। পাশে হঠাৎ বাঘটার দিকে চোখ পড়তেই পরম উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো টুংরা, তাড়াতাড়ি সে ব'লে উঠলো,—এই যে বেটা ইখানে!

টুংরার বিব মাখানো তীর দুটো বাঘের গায়ে ফুটে রয়েছে তখনো। বিজয়ী বীরের মত বাঘটার গায়ে একটা পা চাপিয়ে আনন্দের আতিশয্যে হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো টুংরা।



টুংরার সঙ্গীরাও আনন্দে মশগুল হয়ে বাঘটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে লাগরা পিটিয়ে হঠাৎ নাচতে শুরু ক'রে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়তলি লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। শবর পেয়ে টুংরাই মাঝি ছুটে এসেছে, ভালুকপোতা গোটা গায়ের লোক তার সঙ্গে। চারিদিকে একটা চাকলোর সাদা পড়ে গেছে, সকলের মুখেই এক কথা,—টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে—ভালুকপোতার টুংরা মাঝি ঝিঙেফুলি বাঘ মেরেছে।

ভালুকপোতার সাঁওতালদের আনন্দ আজ দেখে কে। কতকগুলো জ্বলী ফুলের মালা গাঁখে পরিয়ে দিলে ওরা টুংরা মাঝির গলায়, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে তীরন্দাজ টুংরা মাঝির অভিনন্দন পর্ক সমাধা হয়ে গেল সাঁওতালী প্রথায়। বাঘটার পায়ে বেধে ছেঁদে শক্ত দেখে একটা শালগাছের সঙ্গে জড়িয়ে শৃঙ্গে ওটাকে ঝুলিয়ে নেওয়া হলো। সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে কাঁধের উপর বাঘটাকে তুলে নিয়ে মাদল লাগরা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা ক'রে একসঙ্গে সব হৈ হৈ ক'রে ভালুকপোতার পথ ধরে এগিয়ে চললো।

• মাঝখানে টুংরা মাঝি—বাঘটার ঠিক পিছনে, আগে পিছে কলম্পর জনতা; শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিজ্ঞোচিত ভারিচ্চি চালে সদর্পে হেঁটে চলেছে টুংরাই মাঝি নিজে। দশখানা গাঁ ঘুরিয়ে বাঘটাকে আর দেখিয়ে আসবে টুংরাই, সকলেই জাহুক, সকলেই শুহুক যে টুংরা মাঝি ঝিঙেফুলি বাঘ মেরেছে; তীরন্দাজ টুংরা মাঝি—ভালুকপোতার টুংরাই মাঝির নাতি। রাবপুর আর ঘুসককাটা—এ দুটো গাঁ ত ঘোরাতেই হবে।

রাবণ মাঝির বাড়ীতে যথারীতি আবার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে, আগামী কাল ছললীর বিয়ে। লোকজন এবার অনেকগুলি

হবে, যথাযোগ্য তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছে রাবণ। গাঁয়ের বাইরে একটা ফাঁকা ময়দানে লক্ষ্যভেদের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, মোহন আর টুংরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বর ঠিক হয়ে যাবে সকালের দিকে, দু' পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে; সন্ধ্যাবেলা বিয়ে।

মাড়োয়ার খড় চাপানো শেষ ক'রে পাস্তাভাত দুটো খেয়ে নিলে রাবণ, ক্ষেত থেকে এবার কুমড়োগুলো তুলে আনতে হবে। টুংরী মেঝেন সকাল থেকেই সংসারের কাজে ব্যস্ত, মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। কিষ্টু মাঝি একটা জাল ঢাকা দেওয়া চূপড়ির মধ্যে কতকগুলো মুরগী নিয়ে রাবণ মাঝির বাড়ী ঢুকলো। বিয়ে বাড়ীতে সকলেই আজ যে যার কাজে ব্যস্ত। দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। রাবণ মাঝি কিষ্টু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, —বাজনাটা কিসের রে, সকাল থেকে এত লাগরা বাজছে কেনে?

কিষ্টু মাঝি মুরগীর ঝুড়িটা দাওয়ার একপাশে নামিয়ে রেখে বললে,—বাঘটা আজ মারা পড়ে গেল সন্দার, মস্তবড় ঝিঙেফুলি বাঘ—টুংরা মাঝি দু'টি কাঁড়েই সাবাড় করে দিয়েছে।

রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—এঁা—বলিস কিরে, টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে, ভালুকপোতার টুংরা মাঝি?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—হাঁ সন্দার, ভালুকপোতার গাওতালরা বাজনা বাজিয়ে গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছে, বাঘটাকে নিয়ে এই দিকেই আসছে ওরা।

রাবণ মাঝি একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—হঁ।

উঠানের একপাশে কুয়ো থেকে ঘটা ক'রে জল তুলছিলো দুমালী, টুংরা মাঝির বাঘ মারার খবরটা শুনে হঠাৎ তার হাত কনকে

দড়িগুচ্ছ ঘটাটা গেল কুয়োর মধ্যে পড়ে, কুয়োরতলার ধপ্ ক'রে বসে পড়লো ঢুলালী।

রাবণ মাঝি একটু দূর নিয়ে কিছু দিকে চেয়ে আবার বলে উঠলো,—বাঘটা তা হলে নারা পড়লো, ভালই হলো,—কি বল?

কিছু বললে,—খুব ভাল হলো সন্দেহ, বিস্তর ক্ষতি করতে আরম্ভ করেছিলো বাঘটা। টুংরার কিন্তু কাঁড়ের জোর বলতে হবে, অতবড় বাঘটাকে দুটি কাঁড়েই—বাস্।

রাবণ মাঝি গম্ভীরভাবে আর একবার বলে উঠল,—হঁ।

ভালুকপোতার শোভাযাত্রা মাদল লাগরা বাজিয়ে রামপুরে এসে পৌঁছে গেছে। হৈ হৈ ক'রে সব রাবণ মাঝির দোরে এসে দাঁড়ালো। টুংরার গলার জুলা ফুলের মালা ঝুলছে, সঙ্গে তার ভালুকের বাচ্ছাটা, শিকল দিয়ে বাঁধা। নিজের গলা থেকে একটা মালা খুলে ভালুকের গলায় জুড়িয়ে দিচ্ছে টুংরা। বাজনার শব্দে রামপুর গাঁ-গানা তোলপাড় হয়ে উঠলো, বাঘটাকে এনে নানানো হাঙ্গা রাবণ মাঝির দোবের সাননে। ছোট ছোট ছেলেনেয়েরা থেকে আরম্ভ করে বুড়ো-বুড়ীরা পর্যন্ত যে দেখানে ছিলো—গাঁ ভেঙে সব ছুটে এলো বাঘ দেখতে। রাবণ মাঝি ঘর থেকে বেরিয়ে টুংরাই মাঝিকে আপ্যায়িত করলে। টুংরাই মাঝির আনন্দ আজ দেখে কে; টুংরা মাঝি বাঘ নেবোছে, শেয়াল নয়—হৈড়োল নয়—আদবাগা নয়—আন্ত একটা কিঙেফুপি বাঘ।

রাবণ মাঝি চেয়ে দেখে বাঘটার গায়ে টুংরা মাঝির তীব্র দুটো এখনো ফুটে রয়েছে। টুংরার দিকে চেয়ে একটু বিস্মিতভাবে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—নাবাস বেটা, সাবাস!

ভালুকের বাচ্চাটাকে টানতে টানতে রাবণ মাঝির সামনে এসে টুংরা একটা গড় করলে। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে টুংরাই মাঝি হাসছে। রাবণ মাঝির সঙ্গে খানিক আলাপ আলোচনার পর টুংরাই মাঝি বললে,—আজ তা হলে আসি সদ্ধার, তু' চারটে গাঁ এখনো ঘুরতে হবে।

রাবণ মাঝি কিষ্টু মাঝিকে একটা হাঁক দিয়ে বললে,—ওরে—খানিক গুড় জল, গুড় জল নিয়ে আর খানিক শিকারীদের জন্তে।

টুংরাই মাঝিকে আরও কিছুক্ষণ আটকে দিলে রাবণ মাঝি। কাঠকাটা রৌদ্রে লোকগুলো সব ঘেমে উঠেছে, একটুখানি গুড়জল না খাইয়ে রাবণ মাঝি ওদের ছেড়ে দেয় কেমন ক'রে!

টুংরাই মাঝিকে আর একটু বসতেই হলো। গোটা গাঁয়ের মাঝি মেঝেনরা ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সব বাঘ দেখতে। বাঘটাকে সদর কুলিতে নামানো হয়েছে। টুংরা মাঝি বাঘটার পাশে বসে ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। রাবণ মাঝির সদর দোর দিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজছে টুংরা, হয়ত সে আশা করেছিলো এই ফাঁকে ছলানীর সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে যাবে; কিন্তু না,—ছলানী এ পাশ মাড়ায়নি। টুংরার মনটা উসখুস করতে লাগলো।

রামপুরের মাঝি মেঝেনরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাবণ মাঝির দোরে। ধরের মধ্যে মুখ গোঁজ ক'রে চূপচাপ একধারে বসে আছে ছলানী। কপাট কোণে বসে বসে নিজের মনে কত কথাই সে ভাবছে। সকলের মুখেই টুংরার নাম, শুনতে শুনতে ছলানীর কান ঝালাপালা হয়ে গেল। টুংরা ছাড়া কি দেশে আর তীরন্দাজ নাই! মোহনও ত ইচ্ছে করলে মারতে পারতো বাঘটাকে, মোহনই বা টুংরার চেয়ে খাটো কিসে।

- একটা কথা কিন্তু ভেবে পায় না ছালালী, টুংরা যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি হারিয়ে দেয় মোহনকে ? তা হলে কি করবে ছালালী ? টুংরাকে বিয়ে করা তার পক্ষে যে অসম্ভব ; না—না—টুংরাকে সে কোনমতেই বিয়ে করতে পারে না, ছালালীর জীবন থাকতে নয়।

ঘরের এক কোণে চুপচাপ একটা মাদুর পেতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো ছালালী, মনটা তার ভাল নাই মোটেই।

টুংকী মেঝেন গোড়া থেকেই ছালালীর ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে আসছে, ছালালীর মনের কথা সে জানে। কিন্তু রাবণ মাঝির কাছে মুখ ফুটে কোন কথাই বলবার তার উপায় নাই, টুংকীর কথা গ্রাহ্য করে না সে।

বাইরে শোভাযাত্রার হৈ চৈ চলছে। টুংকী মেঝেন ধীরে ধীরে ছালালীর শিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, অতি কোমল কণ্ঠে টুংকী একটা ডাক দিলে,—বিটি!

ছালালী কোন সাড়া দিলে না, চোখ মিলে টুংকীর দিকে একবার চেয়ে আবার সে পাশ ফিরে গুলো।

ভালুকপোতার শোভাযাত্রা রামপুর থেকে বেরিয়ে ঘুসককাটার পথ ধরলে। দ্বিগুণতর উৎসাহে মাদল লাগরা পিটিয়ে এগিয়ে চললো ওরা কুকুলিয়া নদীর দিকে মুখ ক'রে। বাঘটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুসককাটা গ্রামখানাকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গ্রাম থেকে যখন বেরিয়ে গেল ভালুকপোতার দল—বেলা তখন পড়ে আসছে। মোহন মাঝি কাঁড় ধেহুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নদীধারের পথ ধরে, রোজ যেমন বেবোয়।

মনটা কিন্তু আজ ভাল নাই মোহনের। সকলের মুখেই টুংরার কথা, টুংরা একটা বাঘ মেয়ে দেশান্তর লোকের যেন মাথা কিনেছে। চেষ্টা করলে আর কেউ যে বাঘ মারতে পারে না, এমন কোন কথা আছে কি!

মোহন মাঝিই বা কম কি টুংরার চেয়ে? আজ যারা টুংরাকে মাথায় তুলে মাতামাতি করছে, তীরন্দাজ মোহন মাঝির সম্যক পরিচয় কালই তারা পাবে। একমাসকাল নদীর ধারে বসে বসে কাঁড় আর ধোতুক নিয়ে যে কঠোর সাধনা করে এসেছে মোহন, তার প্রমাণ সে দেবে ছলানীকে জয় ক'রে, এর জন্ত মোহন তৈরি হয়ে আছে।

ভাবতে ভাবতে নদীর ধারে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে চুপচাপ গিয়ে বসে পড়লো মোহন। কাল তার জীবনের সড়ীন এক অগ্নি পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে ছলানীর আশা তাকে ছাড়তে হবে ইহ জনমের মত।

নদীধারে বসে বসে ভাবতে লাগলো মোহন। থেকে থেকে কেবলই তার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগলো বিণ্ডেফুলি বাঘটার কথা। বাহাহুরি আছে বলতে হবে টুংরা মাঝির,—সাংঘাতিক তার কাঁড়ের জোর, অসম্ভব সাহস, এ কথা আত্র আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু মোহন কি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে? না—না—নেতিয়ে পড়লে চলবে না মোহনের, পরীক্ষায় কৃতব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না।

তীরধনুক হাতে নিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো মোহন। নিমগাছের নিশান লক্ষ্য ক'রে ধনুকে সে গুণ টেনে দিলে। কাল মোহনের পরীক্ষা, আজ তার শেষ মহড়া। ধনুকে একটা তীর জুড়ে নিজের মনেই বলে উঠলো মোহন,—টুংরার পালা আগে, টুংরা আগে তীর ছুঁড়বে, নিশানা ওই তে-কেড়েকা ডালটা।

নিমগাছের একটা ডালকে লক্ষ্য ক'রে শোঁ ক'রে ছাড়লে মোহন একটা তীর। তীরটা গিয়ে ঠিক গের্গে গেল ডালে। মোহন মাঝি নিজের মনেই বলে উঠলো,—বলিহারি ভাই, সাবাস!

অপর একটা সরু ডালকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো মোহন,—পালা  
এবার খুসককাটার মোহন মাঝির, মাররে জোয়ান,—জোরসে ।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে শোঁ ক'রে ছুটে গেল আর একটা  
তীর । মোহন মাঝি চেয়ে দেখে লক্ষ্য তার ঠিকই বিধেছে ; উৎফুল্লভাবে  
নিজের মনেই আবার বলে উঠলো মোহন,—সাবাস জোয়ান,—সাবাস !

অপেক্ষাকৃত আর একটা সরু ডালকে নিশান করলে মোহন, পালা  
এবার টুংরা মাঝির । কিন্তু এত সরু ডালটাকে টুংরা মাঝি কি বিধতে  
পারবে । ভাবতে ভাবতে মোহন মাঝি ছাড়লে আর একটা কাড়, কাড়  
লেগে ডালটার এপার ওপার ফুটো হয়ে গেল । মোহন মাঝির চোখ-  
ছুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো । কিন্তু এ কাড় ত টুংরা মাঝির, গর্ক  
করবার কিছু নাই এতে মোহনের, মোহনকে এবার বিধতে হবে এর  
চেয়েও শক্ত নিশানা । মগডালের কাছাকাছি আর একটা লিকলিকে সরু  
ডালকে এবার বাছাই করলে মোহন, কাড় মেরে ডালটাকে ভেঙ্গে ফেলতে  
হবে । এ কিন্তু ভারী শক্ত নিশানা, যে কোন তীরন্দাজের পক্ষে এ ডাল  
বেঁধা সহজ কথা নয় ; এ যদি পারে মোহন—জয় তার অবদারিত ।

হাঁটু গেড়ে মাটির উপর বসে পড়লো মোহন, নিশানা লক্ষ্য ক'রে  
একাগ্র মনে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলো সে ধনুকের ছিলায় । বাইরের  
জগৎ বেন মুছে গেছে মোহনের মন থেকে, সামনে তার শুধু একটা  
নিমগাছ, নিমগাছের অসংখ্য ডালপালার মধ্যে মগডালের কাছাকাছি  
একটিনাত্র সরু ডাল শুধু জেগে আছে মোহনের চোখের সামনে, তার  
শেষ নিশানা ।

ধনুকটাকে আর একটু শক্ত ক'রে চেপে ধরলে মোহন । কল্পনায়  
তার ভেসে উঠলো,—চারিদিক থেকে অসংখ্য দর্শক বেন হাঁ ক'রে চেয়ে  
আছে মোহনের দিকে । এপাশে টুয়াই মাঝি, ওপাশে রাবণ ; এদিকে

টুংরা, ওদিকে চাঁদরায় নাঝি ; আশে পাশে আরও বহু চেনা লোক চারিদিক থেকে মোহনকে যেন ঘিরে রয়েছে । দূর থেকে কার যেন ছায়া দেখতে পাচ্ছে মোহন, একান্ত পরিত্রিত একখানি মুখ ; হলুদরাঙা শাড়ী পরে দুলালী যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে তীরন্দাজ মোহন মাঝির দিকে । দুলালীর যে বিয়ে, হাতে তার গুলঞ্চ ফুলের মালা ;—ওই মালাটি জয় ক’রে নিতে হবে মোহনকে, যেমন ক’রেই হোক ।

ধনুকের ছিলাটির জোর ভরতি টান দিয়ে নিমগাছের সেই ডালটাকে লক্ষ্য ক’রে ছাড়লে মোহন আর একটা তীর । ডালটা কিন্তু বিধলো না, নিশানার ঠিক পাশ দিয়ে শোঁ ক’রে ছুটে গেল তীরটা, দূরে গিয়ে ছিটকে একপায়ে টেড়চাভাবে গেথে গেল মাটির উপর । শেষ লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল মোহনের । হঠাৎ কি তার হাত কেঁপে উঠেছিলো ? না—না—হাত ত তার কাঁপেনি, তবে ?

চারিদিক থেকে হো হো ক’রে কারা যেন হেসে উঠলো । কি আশ্চর্য্য, মোহনকে কি ওরা বিদ্রূপ করছে ? ডালটা কিন্তু বিধতে হবে মোহনকে, আর একবার অন্ততঃ চেষ্টা না ক’রে ক্ষান্ত হবে না মোহন ।

শব্দ ক’রে ধনুকটা বাগিয়ে ধরে আর একটা তীর জুড়ে দিলে মোহন । তার দেহ মনের সমস্ত শক্তিকে একত্র ক’রে ধনুকের ছিলায় আবার সে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলো ।

দুলালী এসে দাঁড়িয়ে আছে মোহনের পিছনে, মোহন এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি । মোহনের ডান হাতটা হঠাৎ পিছন দিক থেকে চেপে ধরলে দুলালী, বললে,—থাক—কাঁড় চালা বন্ধ ক’রে দে ।

দুলালীর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল মোহন । দুলালীর মুখে চোখে কি যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে । ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে মোহন,—তোমার কি কোন অসুখ করেছে দুলালী ?



দুলালী বললে,—না, ভালই আছি ; শুনেছিস বোধ হয় টুংরা মাঝি বাঘ মেরেছে ।

মোহন বললে,—শুনেছি, নিজের চোখে দেখলুম যে আমরা বাঘটাকে ।

কিছুক্ষণ থেমে দুলালী একটু হতাশভাবে বললে,—তুই কি ওর সঙ্গে পারবি মোহন ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে মোহন,—নিশ্চয় পারবো দুলালী, তুই আমাকে বিশ্বাস কর ; কাল যদি টুংরা মাঝিকে আমি হারিয়ে দিতে না পারি—

দুলালী বাধা দিয়ে বললে,—ওরা কিন্তু বলাবলি করছে—টুংরাকে তুই পারবি না ।

মোহন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কে ? কারা একথা বলাবলি করছে ?

দুলালী জবাব দিলে,—পাড়ায় ঘরে সকলেই । কাল আমার বিয়ে, আজ থেকেই ঘর আমাদের গুলজার । ঘরে কিন্তু আমার মন টিঁকছে না, কলসিটা কাঁকে নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়লুম ।

দূর থেকে হঠাৎ মাদল বেজে উঠলো, রাবণ মাঝির বাড়ী উৎসব চলছে । মাদলের শব্দ শুনে চমকে উঠলো মোহন । অজানা এক আশঙ্কায় মোহনের বুকেটা যেন দূর দূর করে কাঁপতে লাগলো । দুলালীর দিকে চেয়ে বলে উঠলো মোহন,—তুইও কি বিশ্বাস করিস দুলালী, টুংরার কাছে আমি হেরে যাব ?

দুলালী জবাব দিলে,—কাল থেকে আমার ডানচোখ নাচছে থেকে থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে তুই হয়ত টুংরার সঙ্গে পারবি না ; ওরা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত জোর করে আমাকে গছিয়ে দেবে টুংরার হাতে ।

মোহনের বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো । দুলালীর কথা শুনে মোহনের মনটা গেল একেবারে দমে । টুংরার মত প্রতিদ্বন্দ্বীকে

এত সহজে হারানো কি সম্ভব হবে! হঠাৎ কি মনে ক'রে ধনুকের ছিলাটা খুলে দিলে মোহন, কাঁড়গুলোকে দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ধনুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। মোহন একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলো,—তাহলে ?

দুলালী বললে,—কোন উপায় নাই।

কিছুক্ষণ কাটলো ওদের নীরবে, বলবার আর কিছু নাই। আর একটুখানি ভেবে মোহন হঠাৎ বলে উঠলো,—উপায় একটা আছে দুলালী, কিন্তু তুই কি তাতে রাজি হবি ?

দুলালী উৎসুকভাবে মোহনের দিকে চেয়ে বললে,—কি ?

মোহন বললে,—চল,—এখান থেকে আমরা পালাই।

দুলালী একটু আশ্চর্য হয়ে বললে,—কোথায় ?

মোহন বললে,—যেখানে খুশি, যেখানে গেলে আমরা স্থখে থাকবো।

দুলালী একটু বিস্মিতভাবে বললে,—কাল যে তোর কাঁড়ধনুকের পরীক্ষা, লোকে যে তোকে ছি ছি করবে মোহন ?

মোহন বললে,—তা করুক, আমি তাকে ভয় করি না।

দুলালীর বৃকের ভিতরটা ছুর ছুর ক'রে কাঁপছে। একটুখানি থেমে আবার সে বলে যেতে লাগলো,—তোর ঘরদোর জমিজায়গা—তোর সমাজ—তোর সাত পুরুষের ভিটে, আমার লেগে তুই এসব ছেড়ে চলে যেতে পারবি ?

মোহন বললে,—ও সকলের কোন দাম নাই আমার কাছে, তোকে যদি আমি হারাই। তার চেয়ে বরং কয়লা খাদে গিয়ে আমরা খেটে খাব, সেও ভাল। কেউ আমাদের জানবে না—কেউ আমাদের চিনবে না, সেখানে শুধু তুই আর আমি।

দুলালী অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলো, বললে,—না—না মোহন, এ হয় না—এ আমি পারবো না। আমার মাকে ছেড়ে, আমার বড়ো

বাগকে ছেড়ে কোথাও আমি যেতে চাই না, আমি ছাড়া তাদের যে আর কেউ নাই।

দুলালীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। মোহন বললে,—তুই ভুল করছিস দুলালী, সারা জীবনটাই যদি তোর বার্থ হয়ে যায়, তবে মা বাপ ভাই বন্ধু এসব কি কাজে আসবে। তার চেয়ে চল—অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, পথঘাট নিরুপ, পালাবার এই উপযুক্ত অবসর; এইবেলা আমরা এখান থেকে সরে পড়ি চল।

দুলালী যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, বললে,—না—না—এ হতে পারে না, এ আমি পারবো না মোহন।

এই বলে তাড়াতাড়ি মোহনের সামনে থেকে সরে গেল দুলালী, কলসিটা কাকের উপর তুলে নিয়ে সদর ঘাট দিকে মুখ ক'রে সে ছুটতে আরম্ভ করলে।

পিছন দিক থেকে ডাকতে লাগলো মোহন,—দুলালী—দুলালী!

দুলালী আর ফিরলো না, দূর থেকে শুধু বলে উঠলো,—না—না—না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সদর ঘাটের সামনে কে একটা লোক অন্ধকারে চুপটি ক'রে বসে আছে পাড়ের উপর। দুলালী হঠাৎ চমকে উঠলো লোকটাকে দেখে, বললে,—কে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো লোকটা, দুলালীর দিকে খানিক দাঁগিয়ে এসে বললে,—আমি কিষ্টু মাঝি।

কিষ্টুকে দেখে দুলালী যেন ঘেমে উঠলো, বললে,—তুই এ সময় এখানে কেন কিষ্টু?

কিষ্টু মাঝি জবাব দিলে,—তোকেই খুঁজতে এসেছি, সন্ধ্যার আমাকে পাঠালে।

দুলালী একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—আমি ত জল ভরতে এসেছি।

কিষ্টু মাঝি একটু বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠলো,—তাই দেখছি, কিন্তু এর জগ্রে তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে সন্ধারের কাছে।

দুলালী ঈষৎ উষ্ণভাবে বললে,—কিসের কৈফিয়ৎ কিষ্টু, কি তুই বলতে চাস ?

কিষ্টু মাঝি বললে,—হু'দিন তোকে সমঝে দেওয়া হয়েছে, এই নিয়ে হলো তিন দিন ; আজ আবার লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি কেন ?

দুলালী একটু রাগতভাবে বললে,—কার সঙ্গে—আমি আবার কার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম ?

কিষ্টু বললে,—তা তু'য়েই জানিস, আমি কিছু দেখি নাই বুঝি।

দুলালী হঠাৎ বলে উঠলো,—বেশ করেছি, আমার খুশি।

কিষ্টু বললে,—বেশ, সন্ধারকে আমি সেই কথাই বলছি গিয়ে।

দুলালী দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো,—বল্গে যা, এক শ বার বল্গে যা ; আমি কাউকে ভয় করি না।

বাকবিতণ্ডায় কোন লাভ নাই দেখে কিষ্টু মাঝি আর কথা বাড়াতো চাইলে না, বললে,—বেশ, তাড়াতাড়ি এখন জল ভরে আমার সঙ্গে চল, ওরা তোর পথ চেয়ে আছে।

দুলালী একটু জোর গলায় বলে উঠলো,—আমি যাব না, বেরো খাল-ভরা আমার সামনে থেকে, তোর সঙ্গে আমি যাব না।

কিষ্টু মাঝি একটু রাগতভাবে বললে,—যাবি না ?

দুলালী জবাব দিলে,—না—না—যাব না, আমার খুশি আমি যাব না, আমাকে তোরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবি নাকি !

হু হু ক'রে হঠাৎ কঁদে ফেললে দুলালী, পিতলের কলসিটা পাশে নামিয়ে রেখে নদীর শুকনো বালির উপর সে ধপ্ ক'রে পড়লো।

কিষ্টু মাঝি বললে,—থাক তাহলে বসে, আমার যা বলবার ত সন্সারের কাছেই বলছি গিয়ে।

ভান্ডাগলায় বলে উঠলো দুলালী,—তাই বলিস, আমার মাথার দি থাকলো—কোন কথা যেন ঢেকে রেখে বলিস না।

দুলালীর সামনে থেকে চুপচাপ সরে পড়লো কিষ্টু, হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো গাঁয়ের দিকে মুখ ক'রে।

অন্ধকারে বসে বসে ফুঁপিয়ে খানিক কাঁদলে দুলালী। ঘরে বাইরে সবাই আজ তার শত্রু, দুলালীকে জব্দ করবার জন্ত সকলে মিলে যেন যড়যন্ত্র করেছে। এইবার কি করবে দুলালী, চুপচাপ সে ঘরে ফিরে যাবে? ঘরে ফিরে লাভ? না—না—ঘরে আর ফিরবে না দুলালী, এর জন্ত তার যত ক্ষতি হয় হোক। দূর থেকে কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বহুক্ষণ থেকে ডাকছে; ও কি মোহন? হাঁ মোহন—মোহন তাকে ডাকছে। সেই ভাল, ঘরে আর ফিরবে না দুলালী, কোন মতেই আর ঘরে ফিরবে না।

দুলালী ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখান থেকে সে ফিরে এসেছিলো বুকুলিয়া নদীর ধার দিয়ে—নদী উঠে সেই পথ ধরেই আবার ছুটতে আরম্ভ করলে দুলালী। দূর থেকে সে ডাক দিতে লাগলো—মোহন—মোহন!

পাহাড়ের নীচে একটা পাথরের চাতালের উপর অন্ধকারে চুপচাপ বসেছিলো মোহন। বসে বসে এতক্ষণ সে দুলালীর কথাই ভাবছিলো। দূর থেকে দুলালীর ডাক শুনে সে বলে উঠলো,—কে?

দুলালী ছুটতে ছুটতে এসে মোহনের সামনে দাঁড়ালো, বললে,—  
আমি।

মোহন একটু আশ্চর্য হয়ে বললে,—তুই আবার ফিরে এলি যে ?

দুলালী বলে উঠলো,—আমাকে তুই নিয়ে চল মোহন, যেখানে তোরা  
ধুশি : আমি যাব—তোরা সঙ্গে আমি যাব।

ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—যাবি, সত্যি যাবি ?

দুলালী জবাব দিলে,—সেই জগেই ত ফিরে এলুম। কিন্তু হাত পা  
সমানার কাঁপছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

মোহন তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়ে দুলালীকে জড়িয়ে নিলে, দুলালী  
দান হাতটা চাপিয়ে দিলে মোহনের কাঁধের উপর। মোহন তাকে  
জিজ্ঞাসা করলে,—তোরা কলসিটা ?

দুলালী বললে,—থাকলো ওটা নদীর ঘাটে পড়ে।

অন্ধকারে চারিদিক ডুবে গেছে, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। নদীধার  
কে মেঠো একটা স্থড়ি পথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো দুলালী আর  
মোহন, ভিন্-গাঁ দিকে মুখ করে। কিছুদূর গিয়ে দুলালী হঠাৎ থমকে  
দাঁড়ালো, বললে,—ও কিসের শব্দ মোহন ?

মোহন জবাব দিলে,—রানপুরে মাদল বাজছে, কাল যে তোরা বিয়ে।

নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে হো হো করে একবার হেসে উঠলো  
দুলালী। তারপর সে হঠাৎ আবার নিম্ন মেরে গেল।

মোহন বললে,—কি ভাবছিল দুলালী ?

দুলালী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—কিছু না, চল।

## পাঁচ

রাবণ মাঝির মেয়ের বিয়ে, ‘পঞ্চগেরামী’ সাঁওতাল এসে জড়ো হয়েছে প্রকাণ্ড ওই বটগাছটার নীচে। সকালের দিকে বর নির্বাচনের কথা ছিল ওই বটতলাতেই, টুংরা মাঝি হাজির আছে, মোহন কিন্তু এসে পৌঁছায়নি। টুংরার দল সকালবেলা হাজির হয়েছে এসে সদলবলে, টুয়াই মাঝির আত্মীয় কুটুম্বেরা যে যেখানে ছিলো টুয়াই সকলকে ধরে নিয়ে এসেছে তার নাতির বিয়ের ‘বরিয়াত’ হিসাবে। কিন্তু রাবণ মাঝির মেয়েটা যে কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি বাড়ী থেকে সরে পড়েছে আগের দিন রাত্রেই—এ খবরটা সকালবেলা পর্যন্ত বাইরের কেউ জানতে পারে নি। একটুখানি বেলা হতেই সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। ঘুস্কুকাটায় খবর নিয়ে জানা গেছে মোহন মাঝিও নিরুদ্দেশ। এ সংবাদটা জানতে কারো বাকী থাকলো না যে মোহন আর ছালালী একসঙ্গে উধাও হয়েছে। চারিদিকে একটা চাকল্যের সাড়া পড়ে গেছে, কেপে উঠেছে সাঁওতালের দল। এতবড় একটা সমাজ বিরোধী ব্যাপার এ যেন তাদের পক্ষে অসম্ভব। ওস্তাদ টুয়াই মাঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সাঁওতাল সমাজের সেও একজন প্রধান, সেও একজন মাতব্বর, এতবড় একটা অন্ত্যায়কে চুপচাপ বরদাস্ত ক’রে নেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় টুয়াই মাঝির পক্ষে। ‘পঞ্চগেরামী’ সাঁওতাল—ভিন্-গাঁ থেকে যারা জমা হয়েছে এসে তাদের কাছ থেকেই এর বিচার চায় টুয়াই মাঝি। অপরদিকের চরম শাস্তির ব্যবস্থা না ক’রে কোন মতেই ক্ষান্ত হবেনা টুয়াই। বটতলার সমাগত সাঁওতালদের দল ক্রমশই চকল হয়ে উঠতে লাগলো, টুয়াই মাঝির সঙ্গে এ বিষয়ে সকলেই তারা একমত। সন্ধ্যার রাবণ মাঝির মেয়ে

রাতারাতি গৃহত্যাগ ক'রে তার বংশমর্যাদাকেই শুধু কলঙ্কিত করে নি, পঞ্চগেরামী সাঁওতালের সমাজ ব্যবস্থার মূলেও সে রীতিমত আঘাত হেনেছে। পঞ্চগেরামী এর প্রতিকার চায়, ব্যভিচারের ক্ষমা নাই সাঁওতালী বিচারে, নৈতিক উচ্ছ্বলতার প্রেরণ দেয় না সাঁওতালী সমাজ।

রাবণ মাঝিকে ডাক দেওয়া হয়েছে। মেয়ে তার কুলত্যাগিনী, দশজনের সামনে এসে এর জন্ত জবাবদিহি করতে হবে রাবণ মাঝিকে। পাঁচখানা গাঁয়ের মোড়ল বলে রেহাই পাবে না রাবণ মাঝি, বিয়ের কনে পালিয়ে গেছে তার হেপাজত থেকে, রাবণ মাঝি এর জন্ত দায়ী।

টুয়াই মাঝির সর্বাত্মক গুরু গুরু ক'রে কাঁপছে। বিস্ময় জনতাও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশই, এর একটা ব্যবস্থা না ক'রে তারা ক্ষান্ত হবে না। রাবণ মাঝিকে ডাক দেওয়া হয়েছে, আগে তার কৈফিয়ৎ শুনে তারপর ভেবে চিন্তে কর্তব্য স্থির করা হবে। টুয়াই মাঝি আর একজন লোক পাঠিয়ে দিলে রাবণ মাঝিকে ডাকতে।

ঘুসককাটার চাঁদরায় মাঝি—মোহন মাঝির কাকা, বর্তমানে মোহন মাঝির অভিভাবক সে, তার সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া দরকার। 'পঞ্চগেরামী' থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে চাঁদরায় মাঝিকে, মোহন মাঝির পক্ষ থেকে যদি তার কিছু বলবার থাকে সে যেন নিজে এসে বলে যায় দশজনের সামনে। চাঁদরায় মাঝি পৌঁছয় নি এসে।

বৈশাখের খর রোদ্দুর ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগলো। বটতলার ছায়ায় বসে সমবেত সাঁওতালের দল তুমুল এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। টুয়াই মাঝির আলোচনা চলছে মাতঙ্গরদের সঙ্গে, বিহিত এর একটা করতেই হবে। টুংরা মাঝি চুপচাপ বসে আছে একপাশে কাঁড়-ধেতুক হাতে নিয়ে। ভালুকের বাচ্ছাটা সকাল থেকেই একধায়ে বাঁধা আছে বটগাছের শিকড়ে। টুংরার কোনদিকে ভ্রক্ষেপ নাই, বিয়ের কনে



তার হাতছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ মোহন মাঝির চক্রান্তে, এ আকস্মিক  
সমেলও যাবে না টুংরা। মোহনকে একহাত দেখে নেবে টুংরা, সামনা  
সামনি কখনো যদি মোহনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। টুংরা মাঝির  
ভিতরটা গুর গুর করছে রাগে।

বিয়েবাড়ী নিঝুম, রাবণ মাঝি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। নদীর ঘাটে  
জল ভরতে গিয়ে ছললী যে মোহনের সঙ্গে পালিয়েছে সে বিষয়ে আর  
সন্দেহ নাই, কিন্তু মাঝি প্রমান। রাবণ মাঝি নিজ গিয়ে সন্ধান নিয়ে  
এসেছে ঘুসকুটায়, ছললীর বা মোহন মাঝির সেখানেও কোন  
হদিস পাওয়া যায় নি।

রাবণ মাঝির বুকখানা ভেঙ্গে দিয়ে, তার উচু মাথা এমনভাবে নীচু  
ক'রে দিয়ে, মান ইচ্ছা সব কিছু তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একমাত্র  
মেয়ে যে তার এমনভাবে রাতারাতি ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে,  
স্বপ্নেও এ কথা ভাবতে পারেনি রাবণ মাঝি। পাঁচখানা গাঁয়ের মোড়ল  
রাবণ সর্দার, তার মেয়ে কিনা মুখে তার চুন কালি লেপে দিয়ে কুলত্যাগ  
ক'রে বেরিয়ে গেল! কুটুম্বদের কাছে কৈফিয়ত দেবে কি রাবণ মাঝি,  
আজ যে তার মেয়ের বিয়ে।

টুশকী নেকেন সারারাত চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদেছে। হতভাগী  
মেয়েটা কিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শেব পর্যন্ত কলঙ্কিনী নাম কিনলে।  
বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে টুশকীর, কিন্তু মুখ ফুটে কাঁদবার  
উপায় নাই, রাবণ মাঝির কাছ থেকে ধমক খেয়ে টুশকী একেবারে নিঝুম  
মেয়ে গেছে। পাথরের মূর্তির মত দাওয়ার এক পাশে চুপচাপ বসে আছে  
টুশকী নেকেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

কিন্তু মাঝি এসে আর একবার খবর দিয়ে গেল, কুটুম্বেরা দেখা করতে  
চায় রাবণ মাঝির সঙ্গে। রাবণ মাঝি জোর ক'রে খাটিয়া ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো, দশজনের সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে, উপায় নাই। ওরা হয়ত ‘পঞ্চগেরামী’ শাওতাল মিলে অপরাধী সাব্যস্ত করবে রাবণ মাঝিকে। রাবণ মাঝি আজ অপরাধী, সে বিষয়ে সন্দেহ কি, দুলালীর মত মেয়ের যে সে জন্ম দিয়েছে। সমাজের কাছ থেকে শাস্তি যদি পেতে হয় আজ রাবণ মাঝিকে, প্রতিবাদ করবার কিছু নাই রাবণ মাঝির, মাথা পেতে সব কিছু তাকে সয়ে নিতে হবে, কোন উপায় নাই।

কিছু মাঝি দরজার পাশ থেকে আর একটা ডাক দিলে,—সদার !

রাবণ মাঝি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো,—চলু।

রাবণ মাঝির পা দুটো যেন ভারী হয়ে উঠেছে, সদর কুলি দিয়ে হেঁটে যেতে লজ্জায় তার মাথাটা যেন আপনা থেকেই ভুয়ে পড়ছে। কেবলই তার মনে হতে লাগলো—চার দিক থেকে সকলেই যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে রাবণ মাঝির দিকে, সকলেই আজ মনে মনে হয়ত দিক্কার দিচ্ছে সদার রাবণ মাঝিকে। কোন রকমে চোখ কান বুজে গাঁয়ের কুলি দিয়ে টলতে টলতে হেঁটে চললো রাবণ মাঝি।

বটতলার সামনে রাবণ মাঝি গিয়ে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে একটা গুঞ্জন উঠলো, টুয়াই মাঝি একটা হাঁক দিয়ে বললে,—ইদিকে—ইদিকে—এইখানে।

হাত পা যেন কিছু কিছু করতে লাগলো রাবণ মাঝির, সর্কান্ন তার অবশ হয়ে আসছে। টুয়াই মাঝির কথা শেষ হতে না হতেই মাথাটা হঠাৎ বৌ ক'রে যেন ঘুরে উঠলো রাবণ মাঝির, থর থর ক'রে কাপতে কাপতে মজলিসের মাঝখানেই মাটির উপর সে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ। কিছু মাঝি তাড়াতাড়ি টেনে তুললে রাবণ মাঝিকে, কয়েকজনে মিলে ধরাধরি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো একটা খাটির উপর। পরক্ষণেই নিজেকে আবার সামলে নিলে রাবণ মাঝি, মাটির দিকে মুখ

নীচু ক'রে চুপচাপ সে খাটির উপর উঠে বসলো। সমাগত সাওতালদের উদ্দেশ্যে টুয়াই মাঝি একটা হাঁক দিয়ে বললে,—বসে পড় যে দেখানে আছিস, চুপচাপ বসে পড়।

চারিদিক শান্ত হয়ে গেল। রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলো টুয়াই মাঝি,—আমাদের কি শুধু অপমান করতে ডেকে আনা হয়েছে? বিয়ের কনে তোর ঘর থেকে রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে গেল, এর মানে?

রাবণ মাঝি কোন জবাব দিলে না, মনের মধ্যে তার ঝড় বইছে; টুয়াই মাঝির এ প্রশ্নের উত্তরে বলবার যে তার কিছু নাই।

টুয়াই মাঝি পুনরায় বলে উঠলো,—তোকে আমি বলেছিলাম না রাবণ মাঝি, যে মেরেকে তোর দ্বারো সঙ্গে মিশতে দিবি না; বিয়ের আগে মেয়ে যদি তোর কোন কারণে দুখী হয় তার জন্তে দায়ী হতে হবে তোকে। কথটি আমার ফললো তো?

টুংরা মাঝি নিঃশব্দ মেরে বসেছিলো একধারে। দাঁতে দাঁত চেপে কাঁড়ধেহুকটা হাতে নিয়ে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—ওদের আমি খুন করবো, ও দুটোকেই আমি খুন করবো।

টুয়াই মাঝি টুংরাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—ঘাবড়াস না, সবুর।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলে একবার টুয়াই মাঝির দিকে, বললে,—আমাকে তোরা শাস্তি দে উস্তাজ! তোদের সঙ্গে আমি কথার খেলাপ করেছি, আমাকে তোরা যেমন খুশি শাস্তি দে।

টুংরা আবার ক্ষেপে উঠলো, বললে,—তুই বুড়ো যত অনর্থের গোড়া। মোহন মাঝিকে ডেকে এনেছিলি তুই, বিয়ের মজলিস থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলি তুই, তোরই লেগে এই গুণ্ডগোলটি বেধে গেল আজ, তোকেই আজ আমি শেষ ক'রে ফেলবো।

রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে তীর ধনুকটা হঠাৎ তুলে ধরলে টুংরা।  
চারদিক থেকে সকলেই হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো, পাশ থেকে একজন হাত  
ছুটো চেপে ধরলে টুংরার।

রাবণ মাঝির পাশ থেকে কিছু মাঝি হঠাৎ রুখে উঠলো, বললে,—  
খবরদার।

রামপুরের আরও কয়েকজন সাঁওতাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো সঙ্গে  
সঙ্গে টুংরা মাঝির বিরুদ্ধে।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। রামপুরের সাঁওতালদের সে  
ইসারায় থামিয়ে দিয়ে টুংরার দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—সাবাস বেটা—  
সাবাস, চালা তুই কাঁড় রাবণ মাঝির বুকখানা লক্ষ্য ক'রে, পারিস যদি  
একেবারে তাকে শেষ ক'রে দে। এ আমি আর ব্রহ্মইতে পারছি না।

সন্দার রাবণ মাঝির পক্ষে সত্যই এ অসম্ভব। নিজের বুকখানা হঠাৎ  
ছুঁহাত দিয়ে চেপে ধরলে রাবণ মাঝি। কিছু মাঝি তার মনের অবস্থা  
লক্ষ্য ক'রে শুধু ভাঙ্গা গলায় একবার বলে উঠলো,—সন্দার!

টুয়াই মাঝি একটু উচ্চকণ্ঠে বললে,—সহজে তুই রেহাই পাবি না  
রাবণ মাঝি। আমরা তোরা ভ্রষ্টা মেয়েকে যেখান থেকে পারি ধরে নিয়ে  
আসবো, তোরা চোখের সামনে এমন শাস্তি তাকে দেব যা দেখে তুই  
জাঁতকে উঠবি। সে শয়তানীকে আমরা সহজে ছাড়বো না।

রাবণ মাঝির চোখ ছুটো হঠাৎ দপ্ ক'রে যেন জ্বলে উঠলো। দাঁতে  
দাঁত চেপে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—পারবি—পারবি উস্তাজ, সেই  
শয়তানীকে ধরে আনতে? আমি শুকে একবার দেখবো।

রাবণ মাঝির সর্কাজ গুর গুর ক'রে কাপছে। টুয়াই মাঝি আবার  
বলে উঠলো,—খুঁজে আমরা বের করবোই তাকে, যেমন ক'রে  
হোক।

সাঁওতালদের জানগুরু বৃদ্ধ মাহান মাঝিকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো  
টুয়াই,—গুণে গেঁথে একবার দেখতে পারিস জানগুরু, মেয়েটা এখন  
কোথায় ?

মাহান মাঝি এ অঞ্চলের ডাকসাইটে গণ্যকার। হাত গুণে বা খড়ি  
পেতে সব কিছুই সে বলে দিতে পারে, 'ঝাড়ফুঁকে' মাহান মাঝি সিদ্ধপীঠ,  
ভূত প্রেত, ডান ডাকিনী বৈষ্ণবভক্তি চরিত্রে মাহান মাঝির চুল পেকে  
গেছে। অদৃশ্য শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে সে। লোকে  
বলে মাহান মাঝি নাকি সর্বজ্ঞ, এতবড় জানগুরু এ তল্লাটে আর দেখতে  
পাওয়া যায় না। 'বিদ্যাহীনেন্দ্ৰাই' জানগুরু এই মাহান মাঝি  
সাঁওতালদের গুরুস্থানীয়। মাহান মাঝির গণনা একেবারে অব্যর্থ,  
যাবতীয় ভূত ভবিষ্যত চোখ বুজে সে বলে দিতে পারে।

সকলে মিলে মাহান মাঝিকে ধরে বসলো, গণনা ক'রে বলে দিতে  
হবে রাবণ মাঝির মেয়েটা এখন কোথায়।

এতগুলো লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। জানগুরু মাহান  
মাঝিকে তৈরি হয়ে বসতে হলো একধারে আসন পেতে। এ পর্য্যন্ত কত  
লোকের কত অজ্ঞাত তথ্যই না আবিষ্কার ক'রে দিতে হয়েছে মাহান  
মাঝিকে হাত গুণে আর খড়ি পেতে। কারো হয়ত গুরু হারালো, ছুটলো  
অমনি মাহান মাঝির কাছে, জানগুরু মাহান মাঝি যাহোক তার একটা  
হৃদিস বাতলে দেবে। কারো ছেলেকে ডানে খেয়েছে, মাহান মাঝির  
ঝাড় ফুঁকেই আরাম হয়ে গেল। ধানচোর ঘটিচোর বাটিচোর থেকে  
আরম্ভ ক'রে এ পর্য্যন্ত কত ছাঁচকা চোর যে ধরা পড়েছে মাহান মাঝির  
'বাটিচালার' কলে, তার ইয়ত্তা নাই। হাত গুণে সে সব কিছু বলে  
দিতে পারে, ও সব তার নবদর্পনে। সাঁওতালদের অগাধ বিশ্বাস এই  
জানগুরুর উপর।

মজলিসের মাঝখানে বসে মাহান মাঝি একটা কাঠি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটতে লাগলো। টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—বেশ ভাল করে গুণে দেখ, ব্যাপারটি সহজ নয়।

বৃদ্ধ মাহান মাঝি ধ্যানস্থ হয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে একটুখানি মাথা নেড়ে বললে,—হঁ। তারপর সে টুয়াই মাঝির দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—নিজের চোখে দেখতে চাস ?

টুয়াই মাঝি মাগ্রহে বললে,—কি রকম বল দেখি ?

জানগুরু মাহান মাঝি বটগাছ থেকে একটা কচি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বললে,—তোরা একজন এদিকে এগিয়ে আগ, বিয়ে হয়নি এমন একজন কেউ,—‘তেল-দর্পন’ ধরতে হবে।

মাহান মাঝির ‘তেল দর্পন’ একেবারে অব্যর্থ, বহুক্ষেত্রে পরখ করা আছে। নিকৃদিষ্ট বা অপহৃত বস্তু, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীবিশেষের প্রত্যক্ষ ছায়ামূর্তি জানগুরু মাহান মাঝির তেলদর্পনের মধ্যে স্ফুট দেখতে পাওয়া যায় ঠিক যেন আয়নার ছবির মত। অজ্ঞাত জানগুরুদের চেয়ে এ বিষয়ে মাহান মাঝির দক্ষতা নাকি ঢের বেশি।

মাঝপাড়ার লখনা মাঝির এখনো বিয়ে হয়নি, অল্পবয়সী ছোকরাদের মধ্যে লখনা বেশ চালাক চতুর, সকলে মিলে লখনা মাঝিকেই ঠেলঠেলে এগিয়ে দিলে জানগুরু মাহান মাঝির দিকে। মাহান মাঝি কচি বটপাতাটার উল্টো দিকে খানিক সিঁদুর লেপে মশন দিকটা তিনবার রগড়ে দিলে মস্তুর-পড়া তেল দিয়ে। লখনার হাতে চকচকে সেই তেল নাখানো পাতাটা ধরিয়ে দিয়ে জানগুরু বললে,—এই পাতার মধ্যে লক্ষ্য ক’রে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস ?

লখনা একদৃষ্টে সেই পাতাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—কই না ত।

মাহান মাঝির ঠোট দুটো নড়তে লাগলো, কি যেন একটা মস্তুর পড়ে  
পাভাটায় একবার ছুঁ দিয়ে বললে,—বেশ ভাল ক'রে দেখ দেখি।

লখনা একটু বিস্মিত ভাবে বললে,—দুটো লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে  
যাচ্ছে।

মাহান মাঝি বললে,—একটা মেয়ে, একটা পুরুষ ?

লখনা একটু থমকে বললে,—হাঁ জানগুরু।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ঠিক ঠিক, এ কি ভুল হবার ঘো  
আছে।

জানগুরু মাহান মাঝি প্রশ্ন করলে,—ওদের তুই চিনিস ?

লখনা মাঝি জবাব দিলে,—মেয়েটাকে চিনতে পারছি, আমাদের  
পাড়ার দুলালী।

রাবন মাঝি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, মাহান মাঝি তাড়াতাড়ি  
জিজ্ঞাসা করলে,—আর পুরুষটা ?

লখনা আরও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো তেলদর্পনের দিকে,  
বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললে,—ওকেও চিনি, ওই যে সেদিন বিয়ে  
করতে এসেছিলো দুলালীকে।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ঘুসরুকাটার মোহন মাঝি ?

লখনা বললে,—ই—ই—উয়েই বটে।

টুংরা মাঝি লখনার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে,—দেখি—  
দেখি—আমি একবার দেখি।

জানগুরু বাধা দিয়ে বললে,—থাম্।

রাবণ মাঝি টুয়াইয়ের দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে বললে,—উস্তাজ,  
তোরা ওদের কোন রকমে ধরে আনতে পারিস ? পারিস আমার সামনে  
এনে একবার হাজির ক'রে দিতে ?

রাবণ মাঝি অধীর হয়ে উঠলো, কি শত্রুতাই না ক'রে গেল মেয়েটা।  
কিছু মাঝির দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে সে বলে উঠলো আবার,—  
কিছু—কিছু—আমার বল্লম—নিয়ে আয় আমার বল্লমটা, শয়তানীকে  
আমি নিজের হাতে খুঁচিরে মারবো।

টুয়াই মাঝি বাধা দিয়ে বললে,—তা ত হয় না সদ্ধার, মেয়ে তোর  
ভ্রষ্টা, ও মেয়ের বিচার এখন আমাদের হাতে।

অপর একজন সায় দিয়ে বললে,—সাঁওতালী ধারা মতে বিচার হওয়া  
চাই, 'পঞ্চগেরামী' হাজির আছে, হোক এই মজলিসেই বিচার।

অন্তান্ত সাঁওতালদেরও মত তাই, এই মজলিসেই যা হোক একটা  
হয়ে যাক কিছু। এ কলক শুধু রামপুর বা ঘুসকুকাটার নয়, এ কলক  
'পঞ্চগেরামী' সাঁওতাল সমাজের। সাঁওতালী বিধি বিধান ও নিয়ম  
শৃঙ্খলাকে এমন অন্তায় ভাবে যারা লঙ্ঘন করেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তির  
ব্যবস্থা না ক'রে এক পাও কেউ নড়তে চায় না। সকলে মিলে পরামর্শ  
ক'রে উস্তাজ টুয়াই মাঝির উপর বিচারের ভার ছেড়ে দিলে, এ বিষয়ে  
যথা কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাকেই।

রাবণ মাঝির আর বলবার কিছু নাই, তাকেও এ প্রস্তাবে সম্মতি  
দিতে হলো, টুয়াই মাঝির ব্যবস্থা সে যেনে নিতে প্রস্তুত।

টুয়াই মাঝি খুশী হয়ে বললে,—সাঁওতালী ধারা মতেই হোক তাহলে  
বিচার। মেয়েকে তোর যেখান থেকে হোক খুঁজে আনতে হবে রাবণ  
মাঝি, আবার তাকে ধরে এনে আমাদের সামনে হাজির ক'রে দিতে হবে,  
এ ভার আমরা তোরই হাতে ছেড়ে দিতে চাই। ও মেয়ের আমরা বিয়ে  
দিব আবার—যার সঙ্গে খুশী।

মজলিসের নারায়ণ থেকে আর একজন বলে উঠলো,—কিন্তু উস্তাজ,  
ও ভ্রষ্টা মেয়েকে আর কি কেউ বিয়ে করতে রাজি হবে ?



টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—সে ভার আমার, বিয়ে করবার লোক আমি জোগাড় ক'রে দিব। কানা হোক—খোঁড়া হোক—ছুটে হোক—লোক একটা জুটবেই।

রাবণ মাঝি হঠাৎ একটু চমকে উঠলো, বললে,—তা কেমন ক'রে হতে পারে উস্তাজ ?

টুয়াই মাঝি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলে,—এই হলো সাঁওতালী বিচার। বিয়ের আগে কোন মেয়ে যদি ভীত হয় তা হলে তার শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে কানা খোঁড়া বা যে কোন কুৎসিত রোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য একটা ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া। সেই জীবন্ত বোঝার ভার আজীবন তাকে বয়ে যেতে হবে, এরি নাম সাঁওতালী বিচার। তোর ওই কুলতাপিনী মেয়ের সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই আমরা করবো।

ঠিক কথা, টুয়াই মাঝির এ প্রস্তাব সমর্থন করলে সকলেই, এই রকমেরই বিচার তারা চায়। নেতৃস্থানীয় অপর এক বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো,—সাবাস।

রাবণ মাঝির কল্পনায় ভেসে উঠলো নিতান্ত বিসদৃশ এক নশ্বাস্তিক চিত্র। একটু ভারী গলায় বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—তার চেয়ে তাকে একেবারে শেষ ক'রে দিলে হয় না উস্তাজ ?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—না— তা হয় না, তা হতে আমরা দিব না। তোর ওই মেয়ের খোঁজে চারিদিকে আমরা লোক পাঠাব, কেউ তার সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে খবর দেওয়া হবে; তুই নিজে গিয়ে তাকে ধরে এনে দিবি আমাদের সামনে। এ স্বপ্নে তুই রাজি আছিস ?

রাবণ মাঝি একটু মুসড়ে পড়েছিলো, দেখতে দেখতে আবার সে কঠোর হয়ে উঠলো। সমস্ত দুর্বলতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দৃষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—তাই হোক উস্তাজ ! তোরা তাকে যেমন খুশী

শান্তি দিস, সে শয়তানীকে আমি ধরে এনে দিব ; আমি জানবো ও মেয়ে আমার বেঁচে নাই, সে মরেছে।

রাগে দুঃখে অপমানে রাবণ মাঝির চোখ দিয়ে হঠাৎ টম্ টম্ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। কিছু মাঝি টুয়াই মাঝির দিকে চেয়ে একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আর যে শয়তান সেই মেয়েটিকে কোশলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে তার সর্বনাশটি করলে, তার বিচারটি তোরা কি করছিস শুনি ?

নেহু কথা, এ ব্যাপারে মোহন মাঝির অপরাধের গুরুত্বটাও বড় কম নয়। বিফুর জনতা এই সঙ্গে মোহন মাঝিরও বিচার দাবি ক'রে বসলো।

টুয়াই মাঝির চোখ দুটো যেন আর একবার জলে উঠলো দপ্ ক'রে, গম্ভীর গলায় সে বলে উঠলো,—মোহন মাঝিকেও আমরা ছেড়ে কথা কইব না। আজ থেকে সে 'পঞ্চগেরানী' সনাজের বার। তার ছোয়া জল আমরা খাব না, তাকে আর আমরা এক পংক্তিতে বসতে দিব না, আমরা তার এক কাঠা জমি পর্যাস্ত চবতে দিব না কোন বেটাকে ; আজ থেকে সে একঘরে, সাঁওতাল সনাজের বার। আবার যদি সে ফিয়ে এসে দাঁড়ায় কখনো আমাদের সামনে, দূর থেকে আমরা তাকে কুকুর লেলিয়ে দিব।

ভালুকপোতার লপসা মাঝি লাঠি উচিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আমরা ওর ঘরদোর ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো করে দিব, ওর ভিটের আমরা আগুন জ্বলে দিব। সে যদি আবার ফিরে আসে কখনো—দেখবে ওর মাথা গুঁজবার ঠাইটুকু পর্যাস্ত আমরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি।

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অতি মাত্রায়, এই রকমের একটা কিছু করতে না পারলে কেউ যেন মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। লপসা মাঝিকে সমর্থন ক'রে একসঙ্গে সব চার দিক থেকে চীংকার জুড়ে দিলে। লপসা

মাঝি আবার বলে উঠলো,—তুই আমাদের হুকুম দে উত্তাজ, এই পথেই আমরা মোহন মাঝির ঘরবাড়ী সব শেষ ক'রে দিয়ে যাই, ওর ভিটের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আমরা রেখে যাব না।

টুংরা মাঝি বলে উঠলো,—নিজের হাতে আমি খড়ো চালে ওর আগুন ধরিয়ে দিব, পুড়ে বেবাক ছাই হয়ে যাক।

লাঠি দোটা তীর ধুক হাতে নিয়ে সকলেই মরিয়া হয়ে উঠলো। সাঁওতালী গৌ—কোন বকনে একবার যদি ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠে, সহজে ওদের শাস্ত করা কঠিন। পাঁচ জনের অহুরোধে টুংরাই মাঝিকেও সার্ব দিতে হলো, বললে,—তাই চল—সোজা একেবারে ঘুসককাটা, কাজ একদম শেষ ক'রেই কিরবো।

টুংরাই মাঝির সাড়া পেয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠলো প্রায় এক দেড় শ' সাঁওতাল। মরিয়া হয়ে ছুটলো তারা ঘুসককাটার পথ ধরে। নাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য চারিদিকে যেন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, পথের দু'ধারে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করছে নরুভূমির নত, পথের ধুলো গরম হয়ে উঠেছে। কারো কোন দিকে জ্ঞপেপ নাই, উন্নত সাঁওতালের দল ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে অগ্ন্যয়ের প্রতিশোধ নিতে, সঙ্গে তাদের দলপতি ভালুকপোতার টুংরাই মাঝি।

বটতলার ছায়ায় রাবণ মাঝি বসে বসে ভাবছে। একদৃষ্টে সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে নদীধার দিকে মুখ ক'রে, ঘুসককাটা গ্রামখানা যেন রাবণ মাঝির চোখের সামনে ছিলছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালে রাবণ মাঝি, মন তার অবসাদে ভরে উঠেছে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে ভাক দিলে,—কিষ্টু !

কিষ্টু মাঝি ধীরে ধীরে বললে,—ঘরে চল সন্দার, ভেবে আর লাভ নাই কোন।

রাবণ মাঝি একটু অশুট স্বরে বলে উঠলো,—তাই চল্ ।

বিষ্ণু সীতালেল দল প্রচণ্ডবেগে হানা দিলে গিয়ে ঘুসকুকাটায় ।  
মোহন মাঝির সদর দোরে গিয়ে থমকে থানিক দাঁড়ালো ওরা ।  
মোহন মাঝির কাকা চাঁদরায় মাঝি আগে থেকে খবর পেয়ে কয়েকজন  
সঙ্গী নিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে । মোহন আজ সকলের  
চোখেই অপরাধী, অপরাধ তার গুরুতর সন্দেহ নাই, চাঁদরায় মাঝির  
বংশের সে কলঙ্ক । তার জন্ম সমাজ থেকে যে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা  
করুক—চাঁদরায় মাঝির বলবার তাতে কিছু নাই, কিন্তু তার বাপ  
পিতামহের ভিটেখানার উপর কেউ যে এসে কোন রকম অত্যাচার  
ক'রে যাবে চাঁদরায় মাঝির চোখের সামনে, এটা তার পক্ষে অসহ্য ।  
টুয়াই মাঝি সদলবলে সামনে এসে দাঁড়াতেই চাঁদরায় মাঝি বলে  
উঠলো,—তোরা থান, আমি হাতজোড় ক'রে বলছি উত্তাজ, তোরা  
থাম ।

টুয়াই মাঝি একটু ক্রুদ্ধিত করে ক্ষিপ্ৰকণ্ঠে বলে উঠলো,—মোহন  
মাঝি কোথা ?

চাঁদরায় মাঝি জবাব দিলে,—তার কথা আর তুলিস না উত্তাজ,  
সে কুলাঙ্গার মরেছে ।

টুয়াই মাঝি দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—সেই জন্তেই ত আমরা  
তার সংকারের ব্যবস্থা করতে এসেছি ।

কয়েকজনে মিলে মোহন মাঝির সদর দোরের সামনে থেকে জোর  
ক'রে চাঁদরায় মাঝিকে সরিয়ে দিলে । ভিতর থেকে সদর দোর বন্ধ,  
টুয়াই মাঝি ছুঁম দিলে,—ভাঙ্গ—লাথি ঘেরে ভেঙ্গে ফেল কপাট  
ছুটো ।

চাঁদরায় মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে জনতার ভিড় ঠেলে থানিক এগিয়ে

গিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালো, বললে,—উত্তা কাজটা কিন্তু ভাল হবেক নাই।

টুয়াই মাঝি লপসা মাঝির দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,—  
হটাণ্ড বুড়োকে এখান থেকে।

লপসা মাঝি গিয়ে কাঁপিয়ে পড়লো চাঁদরায় মাঝির উপর সকলে মিলে ধাক্কা দিয়ে তাকে দোরের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। বৃদ্ধ চাঁদরায় মাঝি চীৎকার ক'রে বসে উঠলো,—গবদাদা—গবদাদা তোরা ঘরে ঢুকিস না, ঘরে আমি তোদের ঢুকতে দিব না—কিছুতেই না।

লপসা মাঝি পিছন দিক থেকে চাঁদরায় মাঝির ঘাড়টা বেশ শক্ত ক'রে চেপে ধরে এমন একটা ধাক্কা দিলে যে চাঁদরায় মাঝি মুখ খুবড়ে পড়লো গিয়ে রাস্তার উপর। শুকনো একটা মছল গাছেব গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে চাঁদরায় মাঝির কপাল কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগলো। চাঁদরায় মাঝির নেকেনবুড়ী দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে ডুকরে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে চাঁদরায় মাঝিকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে চললো তার নিজের ঘরে। কপালে তার জলপটি বেঁধে চাঁদরায় মাঝিকে ওরা জোর করে শুইয়ে দিলে একটা খাটিয়ার উপর। চাঁদরায় মাঝি শুয়ে শুয়েই চীৎকার করতে লাগলো,—তোরা আমাকে ছেড়ে দে, ওদের হাতে আমি জ্ঞান দিব—তোরা আমাকে ছেড়ে দে।

উন্নত শাঁওতালের দল দরজা ভেঙ্গে পিলপিল ক'রে ঢুকে পড়লো মোহম মাঝির ঘরের মধ্যে। জিনিস পত্র যেখানে যা পেলো তারা চোখের সামনে—ভেঙ্গে চূরে বিলকুল সব একাকার ক'রে দিলে। তাদের হৈ-হাল্লা ও চীৎকারের শব্দে ঘুসরুকাটা গ্রামখানা যেন কেঁপে

কৈপে উঠতে লাগলো। আহত চাঁদরায় মাঝি নিজের ঘরে খাটিয়ার উপর পড়ে পড়ে ছটফট করলে। এমন সময় হঠাৎ চীৎকার উঠলো,—  
সেঙেল—সেঙেল।\*

শিয়রের দিকের জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুলে দিলে চাঁদরায় মাঝি। দূর থেকে তার চোখে পড়লো মোহন মাঝির কোঠাঘর খ'না দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে টুয়াই মাঝি বাইরে এসে দাঁড়ালো, বললে,—কাঁড়বেছুক হাতে নিয়ে চারদিক তোরা ঘেঁরাও ক'রে রাখ, কোন বেটা যেন এক ঘটি জল ঢেলে এতটুকু আগুন নেবাতে না পারে।

চাঁদরায় মাঝির বৃকের ভিতরটা যেন পুড়ে যেতে লাগলো। চোখ দুটো ছ'হাত দিয়ে চেপে ধরে পাগলের মত সে চীৎকার ক'রে উঠলো,—  
দে—দে—জানলাটা কেউ বন্ধ ক'রে দে, এ আর আমি দেখতে পাচ্ছি না, শিগগীর তোরা জানলাটা বন্ধ ক'রে দে।

বলতে বলতেই বৃক চাঁদরায় মাঝি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো আবার খাটিয়ার উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহন মাঝির ঘর বাড়ী পুড়ে বেবাক ছাই হয়ে গেল।

---

\* সেঙেল—আগুন

## ছয়

পাথরডি কলিয়ারি। ধানবাদ ঝরিয়া লাইনের পাথরডি স্টেশন থেকে কলিয়ারির ব্যবধান ক্রোশখানেকের মধ্যেই। এই খাদেই মালকাটার কাজ করে মোহন মাঝি। ছুলালীকে খাদের উপর কাজ করতে হয়। সকালবেলা গাঁইতি কাঁধে মগবাতি হাতে ঝুলিয়ে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে যায় মোহন, সিটি বাজ্বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাজরি বাবুর খাতায় নাম লিখিয়ে অগ্ন্যন্ত মালকাটার সঙ্গে খাদে নামতে হয় মোহনকে। ভৌঁ বাজ্বার সঙ্গে সঙ্গে খাদের উপর কাজ আরম্ভ হয় ছুলালীর, কোন দিন সে মাল-গাড়ীতে কয়লা বোঝাই দেয়, কোন দিন বা ট্রাম লাইন থেকে টব গাড়ী খালাস ক'রে কয়লার গাদা সাজায় সাইডিং এর ধারে। খাদের নীচে গাঁইতি চালায় মোহন, খাদের উপর অগ্ন্যন্ত কামিনদের সঙ্গে ঝোড়া মাথায় আপন মনে কাজ ক'রে যায় ছুলালী। কাজের গতিকে সারা দিন তাদের বাধ্য হয়ে দূরে দূরেই কাটাতে হয়। মাঝে মাঝে ছুলালীর মন চঞ্চল হয়ে উঠে, কাজ কর্ম তার ভাল লাগে না, কিন্তু উপায় কি,—কাজ যে তাকে করতেই হবে। গোড়ার দিকে এ সব কাজে একেবারেই মন লাগতো না ছুলালীর, কিন্তু একজনের খাটনির উপর নির্ভর ক'রে চুপচাপ বসে থাকা চলে না; কোন রকমে তাতে টেনে টুনে চলে গেলেও সংসারের অভাব তাতে মিটবে না কোন দিনই। একটু একটু ক'রে কলিয়ারির কাজ কর্ম তাই শিখে নিতে হয়েছে ছুলালীকে। দেশ থেকে চলে আসার পর কলিয়ারির আবহাওয়াটা একেবারে ভাল লাগতো না ছুলালীর, সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। এ যেন এক নূতন জগৎ, চারিদিকে শুধু বয়লারের ধোঁয়া আর রাশিকৃত কয়লার পাহাড়। কলিয়ারির একটানা

শব্দ,—ঘ্যাড়াং—ঘ্যাড়াং—ঘ্যাস্—ঘ্যাস্, দিন নাই রাত নাই চলছে ত চলছেই। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠতো দুলালী, মনে পড়তো তার সাঁওতাল পরগনার চোখ জুড়ানো সেই সবুজ মাঠ, বকবকে তকতকে সাঁওতাল পল্লী, ঝরঝরে মুক্ত নীল আকাশ, চারিদিকে মহার বন, বিস্তীর্ণ ময়দান জুড়ে বড় বড় ভুট্টার ক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলানো, সে দেশের বাতাসটি পর্যন্ত রকমারি ফুলের গন্ধে ভরা। এখানে শুধু নানান দেশের বাহুঘের ভিড়; কেউ কারো কথা বোঝে না, কেউ কারো মন বোঝে না, কেউ কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে হৃদয় কথা কয় না। এ দেশের আকাশে বাতাসে শুধু কয়লার কালি, নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয় দুলালীর। কিন্তু উপায় কি, এই দোঁরা আর কালির দেশকেই সয়ে নিতে সে বাধ্য হয়েছে। কালামুখী কলঙ্কিনী বলে দেশের লোকে হয়তো তার বদনাম রটাবে, কিন্তু দুলালী মনে মনে জানে মোহনের সঙ্গে পালিয়ে এসে ধর্ম্মত সে কোন অপরাধ করেনি। মাঝে মাঝে তবু দেশের কথা স্মরণ ক'রে ভয়ানক মন খারাপ করতো দুলালীর, এখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষতঃ মেয়েটা হওয়ার পর থেকে দুলালীর সেই অস্বস্তিকর ভাবটা যেন কেটে গেছে অনেকখানা। ছোট্ট ওই কচি মেয়েটাকে নিয়ে দিন এইভাবেই কেটে যায় কোন রকমে।

মেয়েটাকে গাছতলায় ছোট একটা খাটুলির উপর শুইয়ে দিয়ে সারাদিন কোম্পানীর কাজ ক'রে যায় দুলালী। সন্ধ্যার আগে ধাওড়ায় ফিরে দোকান থেকে চাল ডাল কিনে এনে কাঁচা কয়লার চুল্লিতে রান্না চড়িয়ে দেয়। মোহনের ফিরতে আভকাল সন্ধ্যা হয়ে যায় প্রায়ই।

কাঁচা কয়লার জলন্ত উত্তুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে ধাওড়ার দাওয়ায় বলে তরকারি কুটছে দুলালী। দুলালীর মেয়েটা দাওয়ার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একপাশে ধাওড়ার উঠানে; সর্কান্ধে তার ধুলো



মাথা, বুকের উপর ভর দিয়ে মাঝে মাঝে সে হাত পা নেড়ে হামা দেবার চেষ্টা করছে নিজের ননৈ। এক একবার ছুলালীর মুখের দিকে চেয়ে জড়িয়ে যাওয়া এলোমেলো ভাষায় মেয়েটা যেন কি বলতে চাচ্ছে, ছুলালী হাসতে হাসতে ওর নাম ধরে সাড়া দিতেই খিল্ খিল ক'রে হেসে উঠছে মেয়েটা। কচি কচি গোটা কয়েক দাঁত, তারি ফাঁকে কচি মেয়ের হাসিটুকু ঝরে পড়ছে যেন টাটকা ফোটা কুঁড়ি ফুলের স্তবকের মত। মেয়েটার দিকে চেয়ে ছুলালী শুধু ভাবে, কত যেন কি ভাবে। এই এক ফোটা মেয়ে বাইরের আলো হাওয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ক'রে যে অজ্ঞাতে সে ছুলালীর সারা মন জুড়ে বসেছে, ছুলালীর কাছে এ যেন এক হৈয়ালি। তরকারি কুটা বন্ধ রেখে মেয়েটার দিকে চেয়ে স্বর ক'রে ডাক দেয় ছুলালী,—আমার বিটি—আমার বিটি—আমার সোনা—ওরে আমার মনি।

খিল্ খিল ক'রে আবার হেসে উঠে মেয়েটা।

আজ কিন্তু মনটা বেশ ভাল নাই ছুলালীর, সকাল থেকেই মেজাজটা একটু বিগড়ে আছে। মোহন আজ ক'দিন থেকে লুকোচুরি খেল বেড়াচ্ছে ছুলালীর সঙ্গে। সন্মরা বলে একটা বাউরীর মেয়ে, তার সঙ্গে নাকি মোহনের আজকাল খুব ভাব, তিন নম্বর ধাওড়ার কানিনদের কাছ থেকে নিজের কানে শুনে এসেছে ছুলালী। মোহন আর সন্মরাকে সেদিন ওরা মদ দোকানে বসে একসঙ্গে মদ খেতে দেখে এসেছে। মোহন নাকি মাঝে মাঝে যাওয়া আসাও করে সন্মরার বাসায়, পথে ঘাটে দেখা হলে হেসে তার সঙ্গে কথা কয়, বটলার দোকান থেকে পান দোক্তা কিনে খাওয়ায় সন্মরাকে, আদর ক'রে সন্মরার খোঁপায় মনমোহিনী বিড়ি গুঁজে দেয়। ছুলালী এসব টের পেয়েছে।

পাশের খাদেই কাজ করে সুন্দরা। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছু করতে হয় না তাকে, ধপ্ধপে গোরো গা আর চটকদার চেহারার জোরেই বসে বসে কোম্পানীর কাছ থেকে সে হাজির আদায় করে। খাদসরকারবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে কলিয়ারির বড় বড় সাহেব সুবোরা পর্যন্ত সুন্দরাকে পিয়ার করে অনেকেই, চ্যাংড়া বয়সী নাল কাটার দল সুন্দরাকে খাতির ক'রে চলে, সুন্দরার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যায়। শুকুণদের সম্বন্ধে বিশেষ একটা বয়সের মাপকাঠি বা জাত-বেজাতের কোনরকম বালাই সুন্দরার নাই। ফেরতা দিয়ে পাছাপেড়ে শাড়ী পরে ডাঙ্গালে সুরে গান গাইতে গাইতে সুন্দরা যখন হেলে ছুলে রাস্তা দিয়ে চলে যায়, দূর থেকে কতলোক হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। এদিক ওদিক একটু আড়চোখে চেয়ে হাল্কা হাসির ছিটে কোঁটা ছড়িয়ে দিয়ে, যার সুন্দরা চেনা শোনা অন্তরঙ্গ লোক বিশেষদের লক্ষ্য ক'রে। এক কথায় সুন্দরা একটি চিহ্ন। কাছাকাছি দু' পাঁচখানা কলিয়ারির মধ্যে সুন্দরাকে চিনে না এমন লোক খুব কম। লোকে বলে যেহেঁটা কি বেহারা, সুন্দরা কিন্তু ওসব কথা গ্রাহ্য করে না, নিজের খোশ-খেয়ালেই নানা ফুলের মধু চেখে ঘুরে বেড়ায় সে মরহুমী ফড়িং এর মত। পাঁচ-জনের মন ভুলিয়ে যৌবনের ফাঁদে ফেলে কেমন ক'রে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিংড়ে নিতে হয়, সুন্দরার তা ভালরকমই জানা আছে। স্বামীটা ওর বেঁচে থাকতে সুন্দরার স্বভাব চরিত্র তবু কতকটা সংযত ছিলো, এখন আর কোন বাধা নাই, একদম বেপরোয়া। কয়েক বছর আগে 'সাঙালৈ' একটা স্বামীর সঙ্গে পাড়া-গাঁ থেকে কয়লা খাদে কাজ করতে এসেছিলো সুন্দরা, খাদের ভিতর কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন কয়লার চাল ধরসকে স্বামীটা ওর মারা পড়ে যায়। তার পর থেকে সুন্দরা আর দেশে ফিরেনি, কয়লা খাদেই রয়ে গেছে বরাবর।

এখানে এসে বেশ আছে সুন্দরা, খাদ তরফে সে রীতিমত জমিয়ে নিয়েছে।

দুলালীর রান্না বান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মোহন এসে ধাওড়ার সামনে দাঁড়াতেই কচি মেয়েটা হাত পা নেড়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে সাড়া দিলে মোহনকে। গাঁইতি আর মগবাতিটা ধাওড়ার এক পাশে নামিয়ে রেখে মোহন তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো, বললে,—বিটি, লেডু খাবি লেডু?

মেয়েটা মোহনের কোলে উঠে মনের আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অতিষ্ঠ করে তুললে মোহনকে। মোহন গানছার খুঁট থেকে গুড়ের দু'টা মেঠাই বের করে মেয়েটার সামনে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা দু'হাত দিয়ে নাড়ু দুটা মঠোর মধ্যে চেপে ধরে পরন আগ্রহে কামড় দিয়ে চুষতে আরম্ভ করে দিলে।

মোহনের আজ হপ্তার দিন। কলিয়ারি থেকে হাজরি নিয়ে ফিরবার পথে দুলালীর জন্তে দেশী তাঁতের একখানা ঝরণা-শাড়ী সে পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসেছে। দুলালীর সখ আহ্লাদ মেটাবার জন্ত মাঝে মাঝে অনেক কিছু খরচা করে মোহন, দুলালী এতে আপত্তি করলেও আপত্তি তার গ্রাহ্য করা হয় না। দেশ ছেড়ে বিদেশে এই তেপান্তরের মাঠে, একান্ত অপরিচিত স্বজন বান্ধবহীন এই কয়লা কুঠির দেশে এসে দুলালীর মন যাতে কোন রকমে ভেঙ্গে না পড়ে, সে বিষয়ে চিন্তার ক্ষমতা নাই মোহনের। দুলালীকে খুশী করতে, দুলালীর মুখে একটুখানি হাসি ফোটাতে সব কিছুই করতে পারে মোহন; দুলালীকে সে কোনদিনই ভাবতে দেয় না। প্রথম প্রথম ভয়ানক মন খারাপ করতো দুলালীর, মোহনকে লুকিয়ে সে এক এক দিন নিজের মনেই ঘরের যেকোন পড়ে পড়ে কাঁদতো। অনেক করে বুঝিয়ে পড়িয়ে মোহন তাকে ঠিক করে

নিয়েছে। মেয়েটা হওয়ার পর থেকে ছললীর সেই উড়ু উড়ু ভাবটা যেন কেটে গেছে অনেকখানা, মেয়েটাকে নিয়ে সময় এখন ওদের মন্দ কাটে না। ছললী আর মোহনের চোখে মেয়েটা এক নতুন আকর্ষণ। মেয়েটা যখন সাত দিনের—ছললী ওর নাম রাখলে সুকুরমনি। মোহনের সে কি হাসি, সাত দিনের মধ্যে তার নাকি আবার এত বড় নাম হয়,—সুকুরমনি। মোহন ডাকে,—সুকু, ছললী ডাকে,—মনি, হাসতে হাসতে দু'জনেই মনের আনন্দে গড়িয়ে পড়ে; সাত দিনের মধ্যে সুকুরমনি কিন্তু সাড়া দেয় না। সে একটা কি মজার দিন না গেছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। রান্নাবান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ছললীর। মোহন মেয়েটাকে ছললীর কোলে গুঁজে দিয়ে বললে,—কলের জলে হাত পায়ের কালিগুলো ধুয়ে আসি আমি, তুই ততক্ষণ নতুন এই শাড়ীখানা একবার পর দেখি, দেখি কেমন খানায়।

ঝকঝকে নতুন একখানা শাড়ী ছললীর দিকে এগিয়ে দিলে মোহন। ছললী পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো, বললে,—উয়োদিকেই দে' গা যা, আমি আবার কিসকে।

মোহন একটু থমকে বললে,—তার মানে ?

মোহনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মূখ ভার ক'রে একটু রাগতভাবে বললে ছললী,—তিন নম্বরের কাগজ দিকে গুঁধাই আয়গে যা, কাকে সেদিন মদ খাওয়াচ্ছিল পূব কুঠির দোকানে ?

মোহন একটু গোলমালে পড়লো, একটুখানি ভেবে বললে,—সুন্দরার কথা বলছিস ?

মোহন হঠাৎ নিজের মনেই হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বলে উঠলো মোহন,—ক'দিন থেকে ভয়ানক বিরক্ত

করছিলো, দিলুম সে দিন ফটকে মদ একবোতল খাওয়াই, বলি খা শালী  
—খেয়ে লে, মেয়েটা ভারি ছাঁচড় কি না। কিন্তু তাই বলে—তোমার  
কিরে ঢুলালী, আরে ছি ছি ছি ছি—ও সব লজ্জার মেয়ের ফাঁদে কখনো  
পা বাড়াতে আছে !

কথাগুলো খুব হালকা ভাবেই বলে গেল মোহন, ঢুলালী কিন্তু শুনে  
মোটাই খুশী হলো না। সুন্দরা বাউরিনের সঙ্গে মোহনের যে খানিকটা  
মেলা মেশা হয়েছে নিজেই সে কথা স্বীকার করলে মোহন, তাছাড়া গাঁটের  
কড়ি খরচা ক'রে থামোকা কেউ কাউকে মদ খাওয়ায় না, বিশেষতঃ  
সুন্দরার মত নামদাগা একটা বজ্জাত মেয়েকে। কে জানে, সুন্দরার  
খাওয়ায় সে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে কিনা। করে বৈকি, পাচজনে  
ওদের কথা নিয়ে যখন কানাকানি শুরু করেছে, তখন অন্ততঃ কিছুটা সত্যি  
এর মধ্যে আছেই।

সর্কান্ন রি রি ক'রে উঠলো ঢুলালীর, ভিতরটা তার গুর গুর করছে।  
মোহনের দিকে কিরেও সে আর তাকালো না, কোলের মেয়েটাকে ধপ্প  
ক'রে একপাশে বসিয়ে দিয়ে শিল নোড়া নিয়ে বারান্দার একপাশে বশলা  
পিবতে বসুলো। খাওয়ার মধ্যে একটা মালুটির উপর নতুন শাড়ীখানা  
একধারে রেখে দিলে মোহন। আজ তার হপ্তার দিন, টাকা পয়সা  
কতকগুলো পাওয়া গেছে, গের্জেটা সে কোমর থেকে খুলে নামিয়ে দিল  
শাড়ীখানার উপর। রোজ্জগার নেহাত মন্দ করে না মোহন, বাতুয়ে  
লোক সে, টব ঠিকায় সে কয়লা কেটে উপার্জন করে হাজিরির প্রায়  
দেড়। এ হপ্তায় রথ পবনের বকশিশ বলে আরও কিছু পাওনা হয়েছে।  
মনটা ইস্তক খুশীই ছিলো মোহনের, কিন্তু ঢুলালীর ভাবগতিক দেখে  
হঠাৎ সে একটু দমে গেল। বাইরে কিন্তু সে ভাবটা প্রকাশ করলে না  
মোহন, জোর ক'রে মুখে খানিকটা হাসি টেনে বললে,—রথ দেখতে যাবি

নাকি কাল ঝরিয়ার ডাঙ্গা? সেই জন্তেই ত লতুন শাড়ী একখানা কিনে ফেললুম।

দুলালীর তরফ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, নিজের মনেই বলে চললো মোহন,—মেলা যা জমে দুলালী ঝরিয়ায় ডাঙ্গায়, ভয়ানক জ্বর মেলা। হিন্দোলায় চাপবি নাকি একবার? দিব তোদের না বিটিকে নাগর দোলায় পাক কতক ঘুরাই,—কি বল?

এই বলে আর একবার নিজের মনেই হো হো ক’রে হেসে উঠলো মোহন। দুলালী কোন সাড়া দিলে না, আড় চোখে শুধু তাকালে একবার মোহনের দিকে। রথের মেলায় হিন্দোলায় চড়ে’ আসমানে ঘোরার আনন্দ দুলালীর কল্পনায় কতখানা প্রভাব বিস্তার করেছে, বাইরে তার ভাবগতিক দেখে কিছুমাত্র বোঝা গেল না। মোহন বললে,—চানটা ঝাঁক’রে সেরে আসি আমি, তুই ততক্ষণ ঠাই কর।

অন্ধকার হয়ে আসছে। রান্নাটা কোন রকমে শেষ ক’রে দুলালী একটা লম্ফ ধরিয়ে নিলে। ঘর দোরে সারাদিন আজ ঝাঁট পড়েনি, বারান্দায় একরাশ ধূলা জমে আছে! নেয়েটাকে আজ তেল মাখাতে, কাজল পুরাতে পর্যাস্ত ভুলে গেছে দুলালী, মনে তার এতটুকু স্থখ নাই। থেকে থেকে তার কেবলই আজ মনে হচ্ছে মোহন আর সুন্দরার কথা। ভাবতে ভাবতে ক্রমাগত মন তার বিষিয়ে উঠছে, মোহনকে হয়ত আর বিশ্বাস করা চলে না। কেন এই কয়লা খনির দেশে দুলালীকে নিয়ে এলো মোহন। এখানকার লোকের হাবভাব চালচলন দুলালীর ভাল লাগে না, এর চেয়ে অল্প কোথাও গিয়ে ক্ষেতে থামারে বেওরা খাটা যে ঢের ভাল ছিলো।

কলতলায় চান ক’রে মোহন এসে খেতে বসলো। ভাতের খালাটা মোহনের সামনে এগিয়ে দিয়ে নেয়েটাকে কোলে নিয়ে একপাশে সরে

বসলো ছলানী, মনটা তার ভারি হয়ে আছে। মোহন খেতে বসবার সময় লক্ষ্য করলে নতুন শাড়ীখানা মালুটির উপর থেকে এ পর্যন্ত তুলে রাখা হয় নি, মোহনের গের্জেটাও মালুটির উপর পড়ে আছে যেমনকার তেমনি। এই থমথমে ভাবটা বেশ ভাল লাগছিলো না মোহনের, অথচ করবার তার কিছু নাই। মোহন জানে ছলানীর অভিমানেটা বরাবরই কিছু বেশি, তাই তার ছোট খাটো আবদার অযুযোগ কোন দিনই সে গায়ে মাখে না। আজ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো মোহনের, কি এমন ব্যাপার বা নিরে আজ এতখানা মাথা ঘামাবার দরকার হয়ে পড়েছে ছলানীর। মোহন আর কথা বাড়ালে না, চুপচাপ সে খেতে বসে গেল। ছলানীর নেয়েটা মোহনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে সাড়া দিয়ে উঠলো ছলানীর কোল থেকে, নেয়েটা এসে পাশে না বসলে খেয়ে মোহনের তৃপ্তি হয় না, নিজের হাতে রোজ স্বকুরমনিকে খাইয়ে দেয় মোহন, গরম গরম ক্যান ভাত খেতে নেয়েটার কি তৃপ্তি। আজ কিন্তু ওকে ইচ্ছে ক'রে আটকে রাখা হয়েছে। মনে মনে একটু হাসলো মোহন, হাসতে হাসতে সে ডাক দিলে,—বুটি!

খুশির আতিশয্যে চকল হয়ে উঠলো নেয়েটা, লাফিয়ে বাঁপিয়ে সে ছলানীর কোল থেকে নীচে নানতে চায়। ছলানী তাকে জোর ক'রে চেপে ধরে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ঠোট ফুলিয়ে কান্না জুড়ে দিলে নেয়েটা। মোহন সবেমাত্র দু' এক গ্রাস খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু স্বকুরমনি তার সঙ্গে না খেলে মোহনের ভাল ক'রে খাওয়াই হয় না। ছলানীর এই অকারণ ধমকটা মোটেই ভাল লাগলো না মোহনের, একটু বিরক্তভাবে সে বলে উঠলো,—আসতে চাচ্ছে—দে না নেয়েটাকে ছেড়ে।

ছলানী একটু জোর গলায় জবাব দিলে,—নাই ছাড়বো।

মোহন বললে,—খুব ছাড়বি, খাবার সময় কি ধরে রাপতে আছে !

এই বলে সে পেতে পেতে স্কুরমনির দিকে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলে । মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে দুলালীর কোল থেকে হাত বাড়িয়ে কাঁপিয়ে এলো মোহনের দিকে, দুলালী ঠাস ক'রে একটা চড় কবে দিলে মেয়েটার পিঠে ।

মোহনের কিঙ্ক এবার অসহ্য হয়ে উঠলো । একটু কড়াভাবে বলে উঠলো মোহন,—খবরদার, মেয়ের গায়ে হাত তুলিস না বলছি ।

দুলালী ফোস ক'বে উঠলো, বললে,—খুব করবো, আমার খুশি ।

মোহন একটু জোর গলায় বললে,—না—মেয়ের গায়ে আমি হাত দিতে দিব না ; এমনধারা বাড়াবাড়ি করবি ত ঘর দোর ছেড়ে চলে যাব আমি ; বুঝবি তখন মজাটা ।

দুলালী একটু জোর দিয়ে বললে,—তাই যা না, যাবার ত তোয় জায়গার অভাব নাই, ঢের জায়গা পড়ে আছে ।

ক্ষিপ্ৰ কণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—আছেই ত, আর সেই জায়গাতেই যাব আমি, দেখি তুই কি করতে পারিস !

মোহনের আর থাওয়া হলো না, তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়লো খাবারের থালা ছেড়ে । এই সব কেন্দ্রকারির মাঝখানে মানুষ কখনো বাস করতে পারে ! নরকগে সব ধাওড়ায় পড়ে পড়ে, মোহন কারো পরোয়া করে না, যেখানে তার খুশি সেইখানেই চলে যাবে মোহন ।

দুলালী বললে,—সেইখানেই যেন তাদেরকে নিয়েই থাকিস, আমার ছামনে আর মুখ দেখাস না ।

মোহন একঘটি জল নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে গামছাটা ফেলে নিলে কাঁধে । টাকার গেঁজেরটা সে মাচুলির উপর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে নিলে কোমরে । গেঁজের মধ্যে টাকা পরসাগুলো বন্ম বন্ম শব্দে একবার বেজে উঠলো । মুখখানা গোঁজ করে প্রাণে গিস্



গিস্ করতে করতে বেরিয়ে পড়লো মোহন। ছালালী খানিক এগিয়ে পিছন দিক থেকে একটা ডাক দিয়ে বললে,—খাম্।

খমকে একটু দাঁড়ালো মোহন। নতুন কেনা বরণা-শাড়ীগ তখনো তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। ছালালী শাড়ীখানা মাচুলির উ থেকে তুলে নিয়ে এসে মোহনের দিকে চেয়ে একটু চোখ তেড়ে ব উঠলো,—আর ইটা, ইটা কার লেগে রেখে গেলি ইখানে ?

হঠাৎ কোন জবাব দিলে না মোহন। ছালালী রাগে খেন ভে পড়লো, শাড়ীখানা সে তালগোল পাکیয়ে মোহনের দিকে ছুঁড়ে মারে বললে,—এটাও ওদেরকে দিয়ে দে'গা যা, না দিস ত আমার মাথা খাস

মোহন সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীখানা কুড়িয়ে নিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরতে বললে,—দিবই ত, আমার যাকে খুশি তাকে দিব; দেখি তুই কেন ক'রে আটকাস।

বলতে বলতে হন্ হন্ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল মোহন ছালালীর হাঁক ছেড়ে কানতে ইচ্ছা করছিলো, মেয়েটাকে কতকগুলো ফ্যান ভাত খাইয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লো ছালালী দাওয়ার উপর একটা তালাই পেতে।

\* রাত্রি ক্রমশঃ বেড়ে চললো, চারিদিকে ঘুবঘুটি অন্ধকার। তালাইয়ের উপর পড়ে পড়ে ছালালী খানিক কৈদে নিলে আপন মনে। কিন্তু ফাঁকা ধাওড়ায় একা থাকতে যে ভয় করছে ছালালীর। আশে পাশে অন্ধকার কুলি কামিনদের ধাওড়া, ডাক দিলে অবস্থা সাদা পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু ডাক দেবে সে কাকে, কেনই বা তারা অস্বাভাবিক ঘুম কামাই ক'রে ছালালীর ধাওড়ায় এসে রাত জেগে বসে থাকবে। এ হয় না, মোহন যে আজ ছালালীর উপর রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে—এ কথা নিয়ে পাড়াপড়শীর কাছে ঢাক পিটিয়ে লাভ নাই কোন। একটা রাত্রির মোহন

যদি নাও ফিরে, চোখ বুজে কোন রকমে কাটিয়ে দেবে ছালালী। না এসেই বা যাবে কোন্ চুলোর, এ দিক ও দিক খানিক ঘোরাঘুরি ক'রে রাগ পড়লেই একুনি আবার ফিরে আসবে, ছালালীর তা ভাল রকমই জানা আছে। একটুখানি ভয় শুধু স্তম্ভরাকে, কিন্তু এত রাত্রে স্তম্ভরার ধাওড়ায় সত্যিই কি যেতে পারবে মোহন? স্তম্ভরার দায় পড়েছে দোর খুলে দিতে, মুখে ওর বাঁটা গুঁজে দেবে না। যাবার সময় ভাত ভুটো পর্য্যন্ত মুখে দিয়ে গেল না, এ শুধু ছালালীকে জ্বল করবার মতলব। কিন্তু ছালালীও সহজে ছাড়বে না, মোহনের সম্বন্ধে গুজব যা রটেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তাকে ছালালীর কাছে এর জন্ত মাপ চাইতে হবে। অধঃপতন যদি ঘটেই থাকে মোহনের তা হলে তাকে যেমন ক'রে হোক আবার শুধরে নিতে হবে। মোহন ছাড়া ছালালীর যে আর কোন উপায় নাই, সমাজে ফিরে যাবার সকল পথ সে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসেছে নিজের হাতে, ইহ জীবনের মত। সে জন্ত অবশ্য কোন আপসোস নাই ছালালীর, কিন্তু মোহন যদি কোন দিন তাকে অবহেলা করে, ছালালীর অসহায় ঘবস্থার স্বযোগ নিয়ে মোহন যদি তাকে হেনস্তা ক'রে যায়, সে দুঃখ কিন্তু হবে না ছালালীর। মোহনকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার ভার ছালালীকে পড়ে হবে নিজের হাতে, হাল ছেড়ে দিলে যে কোন মতেই চলবে না।

দেখতে দেখতে রাত্তির অনেক হয়ে গেল, মোহন কিন্তু বাড়ী ফিরলো না। ছালালী শুয়ে শুয়ে মোহনের কথাই ভাবছে। মাতাল মানুষ, ঘুরতে রতে হঠাৎ আবার মদ-দোকানে গিয়ে ঢুকে পড়লো নাকি! কিন্তু মদের কান ত এত রাত্তির অবধি খোলা থাকে না, তা হলে সে গেল যেথায়।

ছালালী চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে আছে একধারে চোখ বুজে। কিন্তু কোন মতেই আসতে চায় না, যত রাজ্যের ভাবনা এসে ছালালীর

মনটাকে যেন দোল খাওয়াতে লাগলো। আজ আবার নতুন ক'রে মনে পড়ছে তার প্রথম দিনের কথা, এমনি এক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ঘুরঘুটি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যে দিন সে মোহনের হাত ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলো। তারপর কাজোড়ার কয়লা কুঠি, সে একটা স্বর্ণীয় দিন, ওই কুঠিতে কাজ করবার জ্ঞান দুলালী সেই সর্বপ্রথম মোহনের সঙ্গে ডুলি চড়ে খাদে নেনেছিলো। কাজোড়ার খাদে টবগাড়িতে কয়লা ভরতো দুলালী। কি ভীষণ সেই অন্ধকার পুরী, এতটুকু আলো নাই—এতটুকু হাওয়া নাই—চারিদিকে শুধু কালো পাথরের চাং আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। দিন আর রাত ও দুটোই সমান কয়লা খাদেব ভিতর, শান্তি না হলে একটি পা কোন দিকে এগোবার উপায় নাই। গাঁইতি দিয়ে কয়লা কেটে কেটে স্ফুং ক'রে যাচ্ছে মাল কাটার দল। একটা স্ফুং থেকে অল্প দিকে বেরিয়ে গেছে আর একটা স্ফুং, সেখান থেকে আর একটা, চারিদিকে শুধু স্ফুং আর স্ফুং, এর কোন দিকটা যে পূর্ব আর কোন দিকটা যে পশ্চি ঠাণ্ড ক'রে যায় কার বাপের সাধ্য। এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে লাইন পাতা, চানক দিকে মুখ ক'রে ছড় ছড় শব্দে ছুটে চলেছে কয়লা বোঝাই গাড়ী। অন্ধকারে গাড়ীগুলো কিম্বা ওন্টার না, আঁশ্চর্য! এমন গোলমেলে ব্যাপার জীবনে কখনো দেখে নাই দুলালী, এর আগে কয়লাখাদের নামটাই শুধু শোনা ছিলো তার, এখানে এসে খাদের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় তার প্রথম। গোড়ার দিকে এ সব তার ভাল লাগতো না, উপর থেকে ডুলি বেয়ে নীচের দিকে নামতে বুকটা যেন চাই চাই করতো দুলালীর, খাদের মধ্যে কাজ করতে সে ইপিয়ে উঠতো। কয়লার গুঁড়ো আর বিন্দুকুটে ধোঁয়ার গন্ধে নিখাস নিতে দম যেন ওর বন্ধ হয়ে আসতো। থাকতে থাকতে আবার সয়ে গেছে সবই, শেষ পর্যন্ত দিন একরকম কেটে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে শুধু বাড়ীর

কথা মনে হলে ভয়ানক মন খারাপ করতো ছুলালীর, বুক ফেটে ওর কান্না পেতো ; মনে হতো দূর ছাই, কাজ নাই আর বিদেশে বিভূঁয়ে এমন ক'রে লুকিয়ে থেকে চোরের মত দিন কাটাতে । রামপুরের ডাঙ্গা, চির পরিচিত সেই সাঁওতাল পল্লী, সেখানকার নদী নালা বন জঙ্গল ফুল ফল আলো হাওয়া সব কিছু যেন ছুলালীকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো ; ছুলালী যেন কানের কাছে শুনতে পেতো কান্নায় ভরা ককণ তাদের ডাক । সে ডাক তাকে বিভ্রান্ত করে তুলতো, সকল আগল ভেঙ্গে ফেলে ছুলালীর মন যেন ছুটে যেতে চাইতো তার সেই কল্লনার বাস্তুব রাজ্যে । কিন্তু পরক্ষণেই ভুল আবার ভেঙ্গে যেতো ছুলালীর,—সে আর হয় না, সে দেশে যে ফিরে যাবার কোন পথ খোলা নাই । সে দেশের সমাজ আর কি তাদের ক্ষমা করবে ? নিজের জগৎ তত ভাবে না ছুলালী, কিন্তু মোহন ? মোহনকে কি ওরা সহজে ছাড়বে, বিশ্বাস হয় না ছুলালীর । আর ছুলালীই বা কেমন ক'রে দাঁড়াবে গিয়ে তার বাপ মায়ের সামনে । মোহনের সঙ্গে পালিয়ে এসে ছুলালী যে কোন অপরাধ করে নি, পারবে কি ছুলালী সে কথা আর পাঁচজনকে বোঝাতে ? বুঝবে না, সে কথা কেউ বুঝবে না, সকলে মিলে ছি ছি করবে ছুলালীকে দেখে । না—না—এ হয় না, ছুলালীর আর ফিরে যাবার কোন উপায় নাই । দেশের কথা ভুলতে হবে ছুলালীকে । কাজোড়ার কয়লা কুঠি, মন্দ কি, স্বখে হোক দুঃখে হোক দিন একরকম কাটবেই, দিন যে কোন রকমে কাটাতেই হবে ।

কাজোড়ার কয়লা কুঠির বসবাস কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হলো না । বাস তিনেক পরে রাবণ মাঝি দেশ থেকে খবর পেয়ে জন কতক লোক সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ একদিন কাজোড়ায় এসে হাজির । হাজরি বাবুর কাছে সংবাদ নিয়ে জানতে পারে এই কুঠিতেই মোহন মাঝি কাজ ক'রে, একা

নয়, তাঁর মেঝেন সমেত। রাবণ তাদের দেশের লোক বলে পরিচয় দে  
হাজুরি বাবুর কাছে, মোহনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়, হাজুরি বাব  
নির্দেশ মত খাদ মোরানে অপেক্ষা করে বসে আছে রাবণ মাঝি  
মোহন সে সময় খাদের নীচে কয়লা কাটছিলো, অপর একজ  
মালকাটার কাছ থেকে রাবণ মাঝির সংবাদটা সে জানতে পারে, খা  
নামবার মুখে হাজুরি বাবুর সঙ্গে রাবণ মাঝির কথাবার্তা সে শুনে এসেছে  
জুলালী সেদিন কাজে আসেনি মোহনের সঙ্গে। রাবণ মাঝির খবরট  
শুনে মোহন একটু ঘাবড়ে গেল, লোকজন সঙ্গে নিয়ে কাজোড়ার কুটি  
পর্যন্ত সে ধাওয়া করবে এতটা মোহন ভাবতে পারেনি। কিন্তু যেম  
ক'রে হোক পালাতে হবে মোহনকে রাবণ মাঝির দৃষ্টি এড়িয়ে, বরা দেও  
কোন মতেই চলবে না। চানক দিয়ে উপরে উঠবার উপায় নাই, পান  
মোরানে ঠায় বসে আছে রাবণ মাঝি। পালানোর একটা নাত্র উপায়  
আছে, এক নদ্বরের এই খাদ থেকে উত্তরমুখী ওই গ্যালারীটা ব্যবহার দিয়ে  
মিশে গেছে তিন নদ্বর খাদের সঙ্গে, তিন নদ্বরের পোড়ো একটা গ্যালারীর  
মধ্যে দিয়ে গিয়ে উপরে উঠবার বহুকেলে একটা সিঁড়ি আছে ইট দিয়ে  
বাঁধানো। ৬ পথ দিয়ে আজকাল কেউ বড় একটা বাগুনা আনা করে না।  
এক নদ্বর খাদ থেকে তিন নদ্বরের ভিতর দিয়ে উপরে উঠবার পথটা একটু  
দূর পড়ে, মাইল থানেকের প্রায় কাছাকাছি। ছোটো খাদের মাঝখানে  
আবার প্রকাণ্ড একটা নালা, আগার গ্রাউণ্ডের যত জল এক পয়গায় জমা  
হয়ে হড় হড় শব্দে বয়ে যাচ্ছে সেই নালা দিয়ে ছোট খাটো একটা নদীর  
আকারে, স্রোতের বেগটাও নেহাত কম নয়। তাতেও অবশ্য ভাববার  
এমন বিশেষ কোন কারণ ছিলো না মোহনের—রাস্তাটা যদি ভাল রকম  
জানা থাকতো। কিন্তু উপায় নাই, ওই পথ দিয়েই পালাতে হবে  
মোহনকে। মগবাতিটা হাতে ঝুলিয়ে পড়ো একটা গ্যালারির মধ্যে

দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো মোহন। কাজোড়ার কুঠি তাকে ছাড়তেই হবে, রাবণ মাঝি যখন সন্ধান পেয়েছে তখন এখানে আর একটি দিনও নয়। নিজের অগ্র অবশ্য ভাবে না মোহন, কিন্তু সন্ধান পেলে হয়ত ওরা দুলালীকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে। ধরা কিন্তু দেওয়া হবে না, পালাতে হবে দু'জনকেই,—যে দিক দিয়ে হোক আর যেমন করেই হোক।

কুলি কানিনদের পালি বদলের সময়। রাবণ মাঝি খাদ মোয়ানাই বসে আছে বহুক্ষণ ধরে। কত নতুন মালকাটা এসে ডুলি বেয়ে নীচে নেনে গেল, নীচের লোকগুলো কালি কুলি মেখে একে একে উঠে আসতে লাগলো উপরে। রাবণ মাঝি হাঁ করে চেয়ে আছে চানকের দিকে, এতক্ষণ ধরে ডুলিটার শুধু ওঠা নামাই সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে, এদের মধ্যে কিন্তু মোহন বা দুলালী তার চোখে পড়লো না ; রাবণ মাঝি ঘাঁটি আগলে বসে আছে ত আছেই।

মোহন এর আগেই তিন নম্বরের পড়ো গ্যালারি দিয়ে সোজা গিয়ে উঠেছে নিজের ধাওড়ায়। জিনিস পত্র গোছগাছ ক'রে দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়লো মোহন। পথে তারা এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পথাস্ত করলে না কোন জায়গায়, বা হাতি বড় রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতি জামুড়িয়ার সড়প ধরে রাতারাতি গিয়ে উঠলো ওরা সোজা একেবারে চরণপুরের কুঠি। অগ্র কোম্পানীর মূলুক এটা, গাদি জায়গা, এখান থেকে সহজে কাউকে খুঁজে বার করা—সে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভয়ানক কিন্তু ক্ষিদে পেয়ে গেছে মোহনের, বাহোক দুটো খেতে হবে কিছু। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে কোম্পানীর হলের কল, কলের জলে বেশ ক'রে মুখ হাত ধুয়ে পোর্টলা থেকে জামবাটি বের ক'রে কলতলায় তারা চিঁড়ে ভিজোতে বসলো। রাত তখন আর বেশি নাই, পূর্ব দিকে 'ভুলকো তারা' উকি মারছে।


কাজোড়ার কুঠি থেকে চরণপুরের খাদে। সেও একরকম কোঁ  
 যাচ্ছিলো ভালই, কাজকর্মের কোন অসুবিধা ছিলো না। খাদে  
 নীচে এখানে বিজলিবাতি, অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মরতে হয় না, ফু  
 দুর করে মাটির নীচে হাওয়া খেলে চমৎকার। সুদুঃখের ভিত্তি  
 দিয়ে পাম্পকলে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা এদের ভাল। খাদে  
 নীচে কাজ করতে করতে ট্রামলাইনেব পাশে কোড়ার উপর মাথা  
 রেখে কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছে ছলানী, বিরকিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার।  
 কাজকর্মের বিধিব্যবস্থা সব কিছুই এখানে ভাল, দোষের মধ্যে  
 কলিয়ারিবি ছোট সাহেব লোকটা একটু পাজী। খট খট শব্দে বুট  
 জুতোর আওয়াজ করতে করতে যখন তখন সে খাদের নীচে ঘুরে  
 বেড়ায়, কাজে কারো এতটুকু জ্রটি হবার উপায় নাই; বোল আনা  
 কোম্পানীর কাজ বজায় করেও টমাস সাহেবের মন পায়নি কেউ  
 কোন দিনই। কোম্পানীর কর্মচারীরা টমাসের ভয়ে তটস্থ, মুখে  
 তার ড্যান রাস্কেল চক্ষিণ ঘটা লেগেই আছে। এক নম্বর পাড়  
 নাভাল এই টমাস সাহেব, হুইস্কির বোতল সব সময় তার পকেটে  
 পকেটে ঘোরে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে খেয়ে মেজাজটা সে একেবারে  
 বিগড়ে ফেলেছে। একনাত্র বড় সাহেব ছাড়া ভাল কথা গো কারো  
 সঙ্গেই নয় না, অত্যন্ত কক্ষ মেজাজ; কথাবার্তা বা ব্যবহারে ভদ্রতা  
 বা শিষ্টাচারের কিছুনাত্র ধার ধারে না টমাস। ওরি মধ্যে কতকটা  
 সে সংযত হয়ে চলে কুলিকামিনদের সঙ্গে, কাষণ টমাস সাহেব জানে  
 কুলিকামিন না হলে কলিয়ারি অচল। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত  
 লোকের অভাব নাই দেশে, যৎসামান্ত মাইনে দিলেই চেয়ার টেবিলে  
 বসে কলম পিসবার লোক ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু কুলিকামিন বিগড়ে

গেলে তাদের ঠাই পূরণ করতে বেগ পেতে হয়, মালকাটার কাঁদে টমাস সাহেব কিছুটা বোঝে। কিন্তু আসল কাজে ঠিক আছে টমাস, মালকাটার 'পিলার রবিং'—মানে চুরি ক'রে কয়লা কাটা—একেকবারে সংযত ক'রে ফেলেছে টমাস সাহেব কিছু দিনের মধ্যেই। আলগা চাঙড় থেকে চুরি ক'রে কয়লা ধরিয়ে কম সময়ের মধ্যে যে কেউ গাড়ী বোঝাই দিয়ে দেবে, টমাস সাহেবের কাছে সে জো-টি নাই। নিবিদ্ধ অংশের সীমা ধরে পিলারের উপর খড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে দাগ কাটা আছে, দাগের ওপাশে গাঁইতি চালানো নিবিদ্ধ। মালকাটার অবস্থা এত কড়াকড়ি সঙ্গেও মাঝে মাঝে পিলার রবিং করে, কিন্তু খুব সাবধানে, কারণ ধরা পড়লে টমাস সাহেবের দাঁত খিঁচুনি এবং ড্যাম রাস্কেল অবশ্যস্বাবী। মজুরির পয়সা থেকে এর জন্ম অনেক সময় জরিমানা পর্যন্ত দিতে হয়েছে অনেককেই। এই নিয়ে সেদিন টমাস সাহেবের সঙ্গে বেশ খানিকটা বচসা হয়ে গেছে মোহন মাঝির। কিন্তু মোহনের চুরি ক'রে কয়লা কাটা প্রমাণ করতে পারেনি টমাস সাহেব, তাই সাহেবের চোখরাঙানি গ্রাহ্য করে নি মোহন, বরং তার মুখের উপর বেশ ছ'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে মোহনের উপর সাহেব একটু চটা। মনে মনে এঁচে নিয়েছে মোহন মাঝি—চরণপুরের দানাপানি হয়ত তার আর বেশি দিন নয়, সাহেব যে বকম বদমেজাজী তাতে কোন্ দিন না সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি হয়।

১

টমাস সাহেব কিন্তু অদ্ভুত লোক। কয়েক দিনের মধ্যেই একটু একটু করে হঠাৎ তার স্বরটা যেন পার্টে গেল, অহেতুক মোহনের উপর ক্রমশই যেন প্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগলো টমাস। সাহেবের মেজাজ এখন দরাজ, যে গ্যালারিতে মোহন কয়লা কাটে সেই




 ১০৪ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে যেতে কোনদিনই ভুল হয় না টমাসাহেবের। সাহেব এসে কাছে দাঁড়াতেই কপালে হাত ঠেকিয়ে মোহন বলে,—সালাম হজুর! খুশী হয়ে বলে উঠে সাহেব,—সালাম—সালাম। দুলালী একপাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে, হয়ত বা সাহেবের সেলাম করা দেখে। টমাস সাহেব দুলালীর মুখের উপর টর্চবাতির এক বলক আলো ফেলে দিয়ে চুকটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যায় অন্ধ গালারির দিকে। সাহেব খানিকটা এগিয়ে গেলে হো হো করে হেসে উঠে দুলালী আর মোহন দু'জনেই। ঘর ঘর শব্দে করলা বোঝাই ট্রান গাড়ী গুলো নীচের দিক থেকে উজান বেয়ে ছুটে চলে চানকের দিকে। মোহন আর দুলালী এই ফাঁকে দু' একটান শালপাতার চুটি টেনে নিয়ে চটপট আবার কাজে লেগে যায়।

টমাস সাহেব লোকটা যে বেশ সুবিধের নয় তা সকলেই জানে। কথায় কথায় যার তার সে অপমান ক'রে বসে যখন তখন। এর জন্ত টমাস সাহেবকেও রীতিমত অপমানিত হতে হয় মাঝে মাঝে। কলিয়ারির নালকাটাদের হাতেই মার খেতে খেতে বেঁচে গেছে সে কয়েক বারই। টমাস সাহেব কিন্তু জ্রঙ্কেপ করে না ওসব, আজ্ঞা-সম্মান বা প্রেষ্টিজের কিছুনাও যে পরোয়া রাখে টমাস সাহেব, এ অপবাদ সহজে কেউ দিতে পারবে না।

টমাস সাহেবের হাতে বাছা স্কাছা জন কয়েক কুলিকামিন আছে, সাহেবের খুব পিয়ারের নোকর। কাজ তাদের এমন কিছু করতে হয় নব, গোপনে গোপনে সাহেবের পছন্দসই কমবয়সী মেয়েদের টাকা পরসার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসাই তাদের একমাত্র কাজ। সাধারণত কলিয়ারির কামিনদের মধ্য থেকেই

সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা হয় এই সব মেয়ে মানুষদের। কেউ বা আসে ইচ্ছে করেই, কেউ কেউ বা টাকাপয়সার লোভে, কোন কোন ক্ষেত্রে এক আধটু বলপ্রয়োগের দরকার হলেও টমাস সাহেবের আটকায় না ভাতেও। টমাস সাহেবের স্ত্রীদৃষ্টি যে মেয়ের উপর পড়েছে একবার, যেমন ক'রে হোক তাকে না ফাঁসিয়ে সহজে টমাস হাল ছাড়ে না। এ সব কাজে ডান হাত তার ভোঁদার না, বহুদিনের পুরানো একটা বাউরী কামিন, টমাস সাহেবের ডের আগে থেকেই এ খাদে সে কাজ করছে। সাহেবের দৌলতে রাজার হাল এই ভোঁদার মায়ের, এ পর্যন্ত বহু মেয়ে মানুষ সে যোগাড় ক'রে দিয়েছে টমাস সাহেবকে। বাউরী বাগ্গী দোসাদ কোড়া কোন কিছুতেই অকুচি নাই টমাস সাহেবের, বয়সটা একটু কাঁচা হলেই হলো; তার উপর যদি চেহারায় একটু চেকনাই থাকে তাহলে ত আর কথাই নাই। নদ আর মেয়েমানুষের নেশায় চব্বিশ ঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকে টমাস সাহেব, এর জন্ত সে খরচাও করে যথেষ্ট।

কাজোড়ার খাদ থেকে রাতারাতি পালিয়ে আসবার পর মোহন আর দুলালীর কয়েকটা দিন কেটেছে খুব অস্বস্তিতে। রাবণ মাঝি বা তার সঙ্গে লোকগুলো তাদের খোঁজ করতে করতে কোনদিন যে হঠাৎ চরনপুরে এসেই হাজির হবেনা তাই বা কে জোর ক'রে বলতে পারে। মাস খানেক নিৰ্বাঙ্কাবে কেটে যাওয়ায় পর সে ভয় কিছুটা ভেঙ্গেছে, আসবার হলে এর মদ্যো হয় ত এসে পড়তো। কাজোড়ার তাদের ধরতে না পেরে হয়ত ওরা আরও দু' একদিন এখান ওখান খোঁজ খবর ক'রে চুপচাপ আবার দেশে ফিরে গেছে, ফিরে গেছে নিশ্চয়ই, তা ছাড়া আর উপায় কি তাদের; খাদ তরফে হঠাৎ কাউকে খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। মোহন আর দুলালী নিশ্চিন্তে

আবার কাজকর্ম শুরু ক'রে দিয়েছে। গায়ে গতরে খেটে খুটে রোজগার তারা মন্দ করে না, দিন বেশ সচ্ছন্দেই কেটে যায় তাদের। চরণপুরের পাণ্ডাগুলোও ভাল, বাস ক'রে আরাম আছে। সারাদিন কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলা পাণ্ডায় বসে বসে আড়ম্বীশী নিয়ে আলাপ করে মোহন। সম্প্রতি একটা মাদলও সে জামুড়িয়ার হাট থেকে খরিদ ক'রে এনেছে। পাণ্ডাগুলি কুলিকামিনদের গানবাজনার জলসা বসে নাখে নাখে, মোহন গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেছে। ছালালীকেও এক একদিন গিয়ে নাচতে হয় অগ্ন্যান্ত মেঝেনদের সঙ্গে। পাণ্ডাগুলি জাত, যেখানেই ওরা থাক নাচগানের ব্যবস্থা ওদের চাই-ই। ছালালীকে নতুন নতুন গান শেখাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে মোহন, ছাতাপরবের মেলা আসছে সামনে, ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন; ছিরিপুুরের হাটতলায় পাণ্ডাগুলির জবর মেলা, নাচগানের ছল্লোড় পড়ে যাবে সারা মেলা জুড়ে। মোহন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এর মধ্যে নতুন ক'রে বাজনাগুলো আর একবার কালিয়ে নিতে হবে, পাণ্ডায় বসে বসে নিজের মনেই হরদম 'সে চাঁটি লাগায় মাদলে, একটানা মহড়া তার চলছে ত চলছেই,—দিং দাহাতাং—দিং দাহাতাং—দাঁতিড় হিতাং দিং দাহাতাং।

ছালালী কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু বিরক্ত হলেই বা উপায় কি, ছাতাপরবের মেলা যে প্রায় এসে পড়লো; বাজনা উপর সমান তালে হাত চলতে থাকে—দাহাতাং—দাঁতিড় হিতাং—কেড় কেড় কেড়—দিং দাহাতাং দাঁতিড় হিতাং—কেড় কেড় কেড়।

চরণপুর কলিয়ারির দল ছাতাপরবের মেলায় যাবে নাচগান করতে, তারি তোড়জোড় নিয়ে ব্যস্ত আছে মোহন। ছালালীর মনটা কিন্তু

ভাল নাই আজ ক'দিন থেকে। ভোঁদার না, ছোট সাহেবের সেই বাউরী কামিনটা মাঝে মাঝে যাওয়া আসা শুরু করেছে দুলালীর ধাওড়ায়, সাহেবের নজর পড়েছে দুলালীর উপর। ভোঁদার মাকে প্রথম দিনই গোটা কয়েক চোখা চোখা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে দুলালী। কিন্তু সহজে সে হাল ছাড়বার মেয়ে নয়, বারে বারে যখন তখন এসে রীতিমত বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে সে দুলালীকে, পথে ঘাটে দেখা হলেই সাহেবের নাম ক'রে দুলালীকে সে নানারকম প্রলোভন দেখায়। সাহেবের বাংলায় একদিন যেতে হবে দুলালীকে, সাহেব নাকি এর জন্ত নোট টাকা বকশিশ করতে রাজি। কি আশ্চর্য, টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে এরা নেয়ে মানুষের ধর্মশঠ করতে চায়; এরা মানুষ, না আর কিছু! ভোঁদার মা বলে এতে নাকি দোষ নাই, কলিয়ারির কামিনদের মধ্যে বেওয়ারজটা একেবারে নতুন নয়, এও নাকি একটা রোজগারের পস্থা, কিন্তু দুলালী ত সে জাতের মেয়ে নয়, টাকা পয়সার লোভে এ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। মেয়ে মানুষের ধরমটি সে খোয়াতে পারবে না, জ্ঞান গেলেও না। ভোঁদার মাকে সে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলো প্রথম দিনই, মাগীটা কিন্তু এক নম্বর ছ্যাচড়, এখনো সে হাল ছাড়েনি। সাহেবের নাকি ভাল লেগেছে দুলালীকে দেখে, এটা নাকি দুলালীর পক্ষে বিশেষ একটা সৌভাগ্যের কথা; ইচ্ছে করলে সে বরাত ফিরিয়ে নিতে পারে এই সুযোগে। বাউরী বুড়ীর কথা শুনে সারা মন বিবিয়ে উঠে দুলালীর, সন্ধ্যা তার জান্না ধরে যায়। এরা সব কি ধরনের লোক, খাদ তরকের চাল চলনই এই রকম। এ দেশটা যে ভাল নয় দুলালী তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু উপায় কি। মোহনকে বলে কয়ে এখানকার কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে অপর কোথাও চলে যাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে, কিন্তু মোহনের কাছে

ঘুণাকরে কোন কথা প্রকাশ করেনি তুলসী। মোহন যে রকম রাগী মানুষ তাতে ছোট সাহেবের কথাগুলো শুনলে হয়ত সে তাকে কাঁড়বেঁটুক নিয়ে খুন করতেই ছুটবে।

খাদের পশ্চিম দিক থেকে পিলার কাটিং এর কাজ আরম্ভ হবে। বাছা বাছা মালকাটাদের ডাক পড়েছে পিলার কাটিং এর কাজে। মোহন নারি পাকা লোক, তাকেও এর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, মোহনকে এর জগৎ থেকে পাঠিয়েছিলো ছোট সাহেব নিজে। কাজটায় একটু ঝগড়া আছে, কিন্তু মাল-ফাটাদের মজুরি দেওয়া হয় ভাল, তার উপর কোম্পানী থেকে বকশিশের ব্যবস্থা করা হবে ভাল রকম, ছোট সাহেব নিজে বলেছে। মোহন এতে খুশী আছে খুবই, যেমন ক'রে হোক রোজগার নিয়ে কথা। পিলার কাটিং এর সময় বরাবর তাকে রাত পালিতে কাজ করতে হবে, এই যা একটু অসুবিধা। ছোট সাহেবকে জানিয়েছিলো মোহন দিন পালিতে কাজ করতে পেলেই তার সুবিধা হয়, কিন্তু সাহেব তাতে রাজি হয়নি, কারণ কোম্পানীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে আগে। মোহন অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করেনি, রাতপালি সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। তুলসীকে ধাওড়ায় একা থাকতে হবে সারাটা রাত, এই যা একটু ভাববার কথা। কিন্তু এত থানা ভাবতে গেলে কোম্পানীর কাজ করা চলে না, তা ছাড়া ধাওড়ার আশে পাশে চারিদিকেই চেনা লোক, ভাববার কোন কারণ নাই। পিলার কাটিং এর কাজে মজুরি কিছু বেশি পাওয়া যায়, মোহনকে সে না চাইতেই ডাকা হয়েছে এ একরকম ছোট সাহেবের অহুগ্রহ বলেতে হবে। কিছুদিন কাজ করতে পেলে বেশ দু'পয়সা জমিয়ে ফেলবে মোহন। ছোট সাহেব লোকটা বিশেষ থারাপ বলে মনে হয় না মোহনের, আজকাল তার মোহনের সঙ্গে ব্যবহার খুব

ভাল। লোকে বলে সাহেবের নাকি চরিত্তির বেশ ভাল না, মোহন কিন্তু বিশ্বাস করে না এ সব কথা; সাহেব লোক, তাও কখনো হয় !

কোম্পানীর কাজকর্ম সেরে সম্ভার ঠিক আগে ধাওড়ায় গিয়ে পৌছলো মোহন। একটা বুড়ী কামিনের সঙ্গে দুলালীর তখন কি নিয়ে যেন বচসা চলছে। দূর থেকে কানে এলো মোহনের—দুলালী বলছে,—না—না—সেটি হবেক নাই, বেরো তুই এখান থেকে। কিস্ কিস্ ক’রে কামিনটাও কি বলে যাচ্ছে দুলালীকে, দুলালী শুধু ঘাড় নেড়ে বলছে,—না—না—না। মোহন একটু ধাঁড়ায় পড়লো, ধাওড়ার বাইরে একটা দেওয়ালের আড়ে থমকে একটু দাঁড়ালো মোহন, কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনো শুনবার সে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু দূর থেকে আর বিশেষ কিছু শোনা গেল না। খানিক পরেই বুড়ীটা মোহনের ধাওড়া থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, মোহনকে ও লক্ষ্য করলে না। বুড়ী খানিকটা এগিয়ে গেলে মোহন এসে বাড়ী ঢুকলো। দুলালীর মুখ খানা আজ যেন একটু গম্ভীর বলে মনে হলো মোহনের, মোহন এর কারণ কিছু বুঝতে পারলে না। কয়লাকাটা গাঁইতিটা ধাওড়ার একপাশে নামিয়ে রেখে দুলালীকে জিজ্ঞাসা করলে মোহন,—কে ও বুড়ীটা ?

মোহনের মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল ক’রে খানক তাকালো দুলালী, মুচকে একটু হাসলে সে নিজের মনেই, তারপর সে জবাব দিলে,—ও পাড়ার বাউরী কামিনরা।

এর বেশি আর ভাবলে না দুলালী। মোহনের একটু কেমন কেমন লাগলো; কাছাকাছি ধাওড়ার সাঁওতাল কামিনরা মাঝে মাঝে অবশ্য বেড়াতে আসে মোহনের আড্ডায়, কিন্তু ও বাউরী বুড়ীকে এর

আগে এ ধাওড়ায় দেখা যায়নি। মোহন আবার জিজ্ঞাসা করলে,—  
কিন্তু এসেছিলো বুড়ী?

দুলালী সহজ স্বরে জবাব দিলে,—এমনি বেড়াতে।

মোহনের কিন্তু কথাটা বেশ কানে ধরলো না, ভিন্‌পাড়ার বাড়ির  
কামিনীরা মোহনের ধাওড়ায় হঠাৎ বেড়াতে আসে কেন? বুড়ীর সঙ্গে  
দুলালীর কথাবার্তা গুলোও মোহনের যেন কেমন একটু গোলমেলে  
বনে হতে লাগলো; নিজের কানে শুনেছে মোহন, দুলালী বলছে,—  
না—না—বেরো তুই এখান থেকে। কথাটা ত বেশ ভাল নয়, এ  
নধো ব্যাপার যে একটা কিছু আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।  
দুলালীকে ধরে বসলো মোহন কি নিয়ে তার বুড়ীর সঙ্গে বচসা  
হচ্ছিলো মোহনের কাছে খুলে বলতে। দুলালী শুধু হাসতে লাগলো,  
খুলে কিছুই বললে না। একটা কানা উঁচু পিতলের থালা ক'রে  
কতকগুলো মুড়ি আর কয়েকখানা গুড়পিঠে এনে মোহনের জলখাবার  
ঠাই করে দিলে, দুলালী, রান্না হতে এখনো দেরি আছে। খাওয়ার  
দাওয়ার দিকে মোহনের কিন্তু লক্ষ্য নাই মোটেই, ব্যাপার যে একটা  
কিছু ঘটেছে দুলালীর মুখচোখ দেখে স্পষ্টই তা বুঝতে পারা যায়।  
দুলালীর ডান হাতটা হঠাৎ চেপে ধরলে মোহন, বললে,—আমার  
কাছে তুই লুকাচ্ছিস দুলালী, কি হয়েছে খুলে বল দেখি। দুলালী  
ধীরে ধীরে বসে পড়লো মোহনের পাশে, মুখখানা তার অসম্ভব গম্ভীর  
হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তার চোখ দুটো যেন ছল্ ছল্ করে উঠলো,  
ভান্সা গলায় বলে উঠলো দুলালী,—এখান থেকে পালিয়ে চল মোহন,  
চরণপুরে আর আমাদের থাকা চলবে না।

দুলালীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল মোহন, এর কারণ নে  
বিশেষ কিছু বুঝতে পারলে না। মোহনের কাছে সব কথাই শেষ

পর্দাস্ত খুলে বললে দুলালী,—ছোটসাহেবের কুনজর পড়েছে দুলালীর উপর, ঘন ঘন সে লোক পাঠাচ্ছে দুলালীর কাছে; যে বাড়ুরী বুড়ীটা একটু আগে বেড়াতে এসেছিলো—ছোট সাহেবের সে চর। আজও সে বিশেষ অনুরোধ ক'রে গেছে দুলালীকে, সাহেবের কাছে একদিন তাকে যেতেই হবে। দুলালীর যদি একাস্তই আপত্তি থাকে সাহেবের বাংলায় যেতে, ছোট সাহেব নিজের এসে দেখা করতে রাজি আছে দুলালীর সঙ্গে, যে কোন দিন রাত্রির বেলা। কামিনটাকে অবশ্য যথেষ্ট অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে দুলালী, কিন্তু তবু সে একেবারে হাল ছাড়েনি, আর একদিন আসবে বলে গেছে দুলালীর শেষ কথা জানতে।

দুলালীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল মোহন, মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠলো। ছোট সাহেবের মত পাঞ্জী লোক কেন যে আজকাল মোহনের সঙ্গে এতটা খাতির রেখে চলে মোহন যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছে এখন। খাদের নীচে দুলালীর দিকে মাঝে মাঝে ইঁাক'রে চেয়ে থাকে টমাস সাহেব—তাও মোহন লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সাহেবের মতলব যে অন্তরকম মোহন সেটা এতদিন ঠিক বুঝতে পারেনি। দিনপালি থেকে সরিয়ে পিলার কাটিংএ রাতপালিতে কাজ দেওয়া হয়েছে মোহনকে, ছোট সাহেবের ব্যবস্থা। মোহনকে সে ইচ্ছে করেই রাত্রির বেলা ধাওড়া থেকে দূর রাখতে চায়, ফাঁকা ধাওড়ায় মোহন মাঝির বোটাকে নিয়ে বেশ জমবে ভাল। ওরে শালা টমাস সাহেব, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি! কিন্তু মোহন মাঝিও সোজা লোক নয়, একহাত তোমাকে না দেখে আর ছাড়বে না সে কোন মতেই।

মোহনের সর্কাস্ত গুরুগুরু করতে লাগলো রাগে। 'খাবারের



খালাচাঁ সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ছুলালীর দিকে চেয়ে বলে উঠলো।  
মোহন,—মদের ভাঁড়টা একবার নিয়ে আয় দেখি।

ছুলালী বললে,—এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের,—আজই  
কোথাও বেরিয়ে পড়ি চল, আজ রাত্রেই।

মোহন বললে,—চুপ—মদ খেয়ে খানিক নেশা করি আগে,  
তারপর শালা টমাস সাহেবকে আমি দেখছি। বেউড় বাঁশের লাঠিটা  
আমার ঠিক আছে ত?

ছুলালী কিন্তু চায় না এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বাইরে একটা  
জানাজানি করতে, তার চেয়ে চুপচাপ সরে পড়াই ভাল। মোহন  
কিন্তু এত সহজে টমাস সাহেবকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়, শিগ্গা তাকে  
একটু দিতে হবে যেমন ক'রে হোক, তার জগু জান কবুল মোহনের।

চৌ চৌ ক'রে মদের ভাঁড়টা প্রায় খালি ক'রে ফেললে মোহন।  
আজ একটু জমাট নেশা দরকার, উগ্র বাথরের গুঁড়ো মশলা প্রায়  
ডবল মাত্রায় মিশিয়ে দিয়েছে মোহন নিজের হাতে সাজন বেওয়া তার  
পচুই মদের সঙ্গে। মোহনের এই নেশা করা দেখে ছুলালী একটু  
ভয় পেয়ে গেল, অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়লে সহজে তাকে সামলানো  
কঠিন। বার দুই তিন চেষ্টা করলে ছুলালী মোহনের হাত থেকে  
মদের ভাঁড়টা কেড়ে নিতে, কিন্তু ছুলালীর কোন কথাই শুনলে না  
মোহন, চৌ চৌ শব্দে ভাঁড়টা সে একেবারে খালি করে দিলে।  
কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশায় একেবারে টোর হয়ে উঠলো মোহন।  
টলতে টলতে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—বাইরে একটু ঘুরে আসি  
আমি, দেখি শালা টমাস সাহেব কি করেছে।

ছুলালী বাধা দিয়ে বললে,—না—সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া কাঁটি তুই  
করতে পারি না, আজ আর তোকে বেরুতে দিব না আমি এ অবস্থায়।

মোহন টলতে টলতে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে খাটো মত বাঁশের একটা লাঠি যোগাড় ক'রে নিলে। ছালানী ধাওড়ার দরজায় খিল এঁটে দিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। মোহন বললে,—পথ ছাড়, দোর খুলে দে।

ছালানী কিন্তু পথ আগলে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো, বললে,—পথ আমি নাই ছাড়বো।

মোহন একটু জোরগলায় বললে,—ছাড়বি না?

ছালানীও একটু উগ্রভাবে জবাব দিলে,—না ছাড়বো না, ছেড়ে এমনি দিলেই হলো নাকি।

মোহনের হাত ধরে তাকে জোর করে একটা খাটিয়ার উপর বসিয়ে দিলে ছালানী, বললে,—চুপচাপ শুয়ে থাক খাটিয়ার উপর, দতক্ষণ না নেশা ছাড়ে।

মোহন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ছালানীর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর সে নিজের মনেই হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো নেশার ঝোঁকে। হাসতে হাসতে খাটিয়ার উপর গড়িয়ে পড়লো মোহন। ছালানী একটু বিরক্তির স্বরে বললে,—এত হাসছিস যে?

মোহন আবার উঠে বসলো, ছালানীর ডান হাতটা সে খপ্ ক'রে চেপে ধরলে, হাসিটা একটু সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলো মোহন,—তাই যা না একদিন সায়েবের কাছে, যাবি? দেখ না শালা কত টাকা দেয়, এককুড়ি—দু'কুড়ি—তিনকুড়ি—কত টাকা দিবে বলেছে?

ছালানী একবার হকচকিয়ে তাকালো মোহনের দিকে, তারপর সে মুখটা একটু বিকৃত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—খ্যাৎ।

মোহন বললে,—মাইরি বলছি দুলালী, টমাস সায়েব লোক  
কিন্তু ভাল, যা না একদিন ঘুরে আয় সায়েবের বাংলা থেকে।

দুলালী ক্রমশই মনে মনে চটে উঠতে লাগলো। মোহন বললে  
এক কাজ কর, এই ধাওড়াতেই একদিন আসতে বলে দে সায়েব  
কালই রাত ন-টার সময়। কাল থেকে আমার রাতপালি, ঐ  
ধাওড়ায় তুই আর টমাস সায়েব; কোন রকমে একটা রাত  
সায়েবের মানটা রেখে, পারবি না?

এই বলে মোহন নিজের মনেই আর একবার হো হো ক  
হেসে উঠলো। দুলালী রাগে আগুন হয়ে উঠেছে, মোহনের ক  
তনে মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠলো। রাগে গিস্ গিস্ করে  
করতে মোহনের কাছ থেকে হঠাৎ উঠে পড়লো দুলালী। মোহ  
তার হাত ধরে টেনে খাটিয়ার উপর আবার বসিয়ে দিলে, বললে,—  
আহা শোন না, আগে থেকে এত চটছিল কেনে?

দুলালী ঠোট ফুলিয়ে কান্না স্রব ক'রে দিয়েছে, কান্নার স্রবে বলে  
উঠলো দুলালী,—ছাড়—ছাড়—আর আমি তোমার কোন কথা শুনতে  
চাই না।

মোহন হো হো করে হাসতে হাসতে দু'হাত দিয়ে দুলালীর  
গলাটা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে, বললে,—ঘাবড়াস না, কানে কানে একটা  
কথা বলি শোন।

মোহনের এই টানা হেঁচড়ায় রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠলো দুলালী,  
কিন্তু ক'রে সে হেসে ফেললে, খাটিয়ার উপর ধপ ক'রে বসে পড়লো  
দুলালী মোহনের একদম কোল ধঁবে। দুলালীর কানের কাছে মুখ  
রেখে ফিস্ ফিস্ ক'রে কতকগুলো কি বলে গেল মোহন, এমনভাবে  
সে কথাগুলো বললে যেন ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়; দুলালী কিন্তু

চমকে উঠলো, বললে,—না—না—সেটি হবেক নাই, ওকথা আমি  
কিছুতেই বলতে পারবো না।

মোহন একটু জোর দিয়ে বললে,—তোকে বলতেই হবে, টমাস  
সাবেবেকে আমি সহজে ছাড়বো! পাঁওতালের মেয়ের উপর নজর  
দেওয়ার ফল হাড়ে হাড়ে তাকে বুঝিয়ে দিব আমি। দে দে পাঁওড়াতেই  
আদতে বলে দে' বেটাকে, কাল রাত ন-টার সময়।

দুলালী একটু কঁাদো কঁাদো হয়ে বললে,—বিপদের উপর বিপদ  
আর বাড়াস না মোহন, তার চেয়ে আজই আমরা এখান থেকে  
পালিয়ে যাই চল্।

মোহন বললে,—আজ না, পালার কাল রাত্রে; যেমনটি তোকে  
বলে দিলাম—সেই মত ব্যবস্থা কিস্ত হতে হবে।

একবার যা গৌ ধরে মোহন সহজে তা ছাড়তে চায় না, দুলালীর  
তা ভাল রকম জানা আছে, শুধু মোহন মাঝি কেন—একগুঁয়েমি  
পাঁওতাল জাতের স্বভাব। এ অবস্থায় মোহনকে আর ধাঁটাতে  
সাহস করলে না দুলালী, ফল হয়ত তার উন্টোই হবে, মোহনের  
প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত তাকে রাজি হতে হলো। ভয়ে কিস্ত দুলালীর  
রুক কাঁপছে এখন থেকেই, মোহনকে নিয়ে কোন রকমে একবার  
রণপুর থেকে বেরুতে পারলে সে বাঁচে।

মনটা ভয়ানক বিগড়ে আছে মোহনের, কোনমতেই সে স্বস্তি পাচ্ছে  
না। মদের নেশা রীতিমত জমে এসেছে। টলতে টলতে আর  
একবার সে উঠে পাড়ালো, চাঁৎকার ক'রে হঠাৎ বলে উঠলো মোহন,  
—মদ—মদ—আর খানিকটা মদ।

দুলালী তাড়াতাড়ি মোহনকে ধরে ফেললে, বললে,—আজ আর  
ই মদ খেতে পাবি না।

খাটিয়ার উপর একটা বালিশ দিয়ে জোর ক'রে মোহনকে শুই দিলে ঢুলালী, লক্ষটা তাড়াতাড়ি নিবিয়ে দিয়ে নিজের সে আ সকাল সকাল শুয়ে পড়লো। নেশার ঘোরে নিজের মনেই ববে যাচ্ছে মোহন, কথা তার ক্রমশই জড়িয়ে আসতে লাগলো, টানা স্নরে আবোল তাবোল বকে যেতে লাগলো মোহন,—মদ আমি খাবই, একশ'বার খাব, টমাস সায়েবকে আমি ডরাই নাকি। ও শালা মদ খায় না? আমি ও খাব, বিশ ডবল খাব, দেখি শালা তুই ক'হাঁড়া মদ খেতে পারিস।

ঢুলালী মুহু একটা ধমক দিয়ে বললে,—টেচাস না আর, ঘুমো।

মোহন নেশার ঘোরেই বলে উঠলো,—ঘুমাব না ত তুই শালীকে ডরাব নাকি, দেখত শালীর আম্পদ্ধা; ইদিকে আয় শালী—ইদিকে আয়।

ঢুলালী একটু বিরক্তভাবে বলে উঠলো,—আঃ—কি যে করিস!

টমাস সাহেব আজ ভারি খুশী। মোহন মাঝির বোঁটা যে এত সহজে রাজি হবে গোড়ার দিকে তার ভাবগতিক দেখে মোটে সে কথা ভাবতে পারে নি সাহেব। ভোঁদার মায়ের বাহাদুরি আছে, এ কথা কিন্তু স্বীকার করতে হবে। ভোঁদার মাকে বেশ ভাল রকম বকশিশ ক'রে দিয়েছে সাহেব; রাত্তির বেলা সাহেবকে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি পৌঁছে দিয়ে আসবে ঢুলালীর কাছে; কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে। রাত্তিরটাও ভাল, কৃষ্ণপক্ষ চলছে এখন, সন্ধ্যার পর ঘুরঘুড়ি অন্ধকার। তা হোক অন্ধকারে আটকাবে না, মাঝে মাঝে অভ্যাস আছে টমাস সাহেবের, ঢুলালী যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে এই ঢের। সাওতালী 'বিউটি' টমাস সাহেবের

সন্ধ্যার সময় ধাওড়া থেকে গাঁইতি হাতে বেরিয়ে পড়লো মোহন, কাজে তাকে বেরুতেই হবে। ইচ্ছা করলে একটা দিন সে অনায়াসে কানাই করতে পারতো, কিন্তু তাতে আসল উদ্দেশ্য তার ফেসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। টমাস সাহেব যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে মোহন মাঝি আজ কাজে আসে নি, তাহলে সে কুলিধাওড়ার পাশ ঘাড়াবে না। তার চেয়ে খাদে গিয়ে নেমে পড়াই ভাল, সময় নত সেখান থেকে আবার উঠে আসতেই বা কতক্ষণ।

সন্ধ্যার পর ছোট সাহেব একটা চক্কর দিয়ে এলো কলিয়ারির আশেপাশে। খাদনোগানে হাজির বাবুর গুমটির সামনে হঠাৎ আজ অসময়ে সাহেব গিয়ে হাজির, কুলিকামিনরা সব সময় মত ঠিক ঠিক খাদে নামছে কিনা মাঝে মাঝে খবর নেওয়া দরকার।\* সাহেবকে

দেখে হাজরিবাবু—অঃঃঃসী এক বাঙালী ভদ্রলোক—একেবারে তটস্থ হয়ে উঠলেন। লম্বা চওড়া একটা গুডমর্নিং ক’রে খতমত খেয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন হাজরিবাবু,—অল নাইনারস্ ডাউন সার, নাইট শিফট্ ও-কে।

ছোট সাহেব নাইনারস্দের এটেণ্ডেন্স্ রেজিষ্টার খানা একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—অল রাইট বাবু, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

ছোট সাহেবের এই অপ্রত্যাশিত অমায়িক ব্যবহারে হাজরিবাবু প্রায় ঘেমে উঠলেন। যাবার আগে আর একবার হাজরিবাবুর দিকে তাকিয়ে খোশমেজাজে বলে উঠলো সাহেব,—গুড নাইট বাবু!

হাজরিবাবু গদগদ ভাবে বলে উঠলেন,—গুড মর্নিং সার, গুড মর্নিং।

টর্কের কোকাস করতে করতে বাংলোর দিকে নুথ ক’রে তক্ষুনি আবার ফিরে গেল সাহেব, রাত তখন আটটা প্রায় বাজে।

সন্ধ্যার সময় পাদের নীচে নেমে এসেছে মোহন, বন কিঙ্ক তার পড়ে আছে ধাওড়ার দিকে। ঘণ্টাখানেক কোনরকমে কাটিয়ে দিয়ে কাজ ছেড়ে সে চুপি চুপি সরে পড়লো, রাত ন-টার আগেই ধাওড়ায় তাকে পৌছতে হবে। চানকের ঘন্টিওয়ালার সঙ্গে বাজে দুটো খুচরো আলাপ সেরে ডুলির উপর চেপে পড়লো মোহন। ঘাটাং ঘাটাং ক’রে তিনবার আওয়াজ দিলে ঘন্টিওয়ালার, অর্থাৎ কয়লা নয় মাগুস উঠছে। উপর থেকেও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল ঘন্টিওয়ালার সঙ্কেত, অর্থাৎ ঠিক হয়। উপরে উঠে সামনের গুমটিটার দিকে একবার তাকালো মোহন, হাজরিবাবু গুমটির ভিতর টুলের উপর বসে বসে একমনে খাতা সারছেন। মোহন একটু মাথা নীচু ক’রে গুমটির পিছন দিক দিয়ে চুপচাপ পাদমোয়ান থেকে সরে পড়লো। বর্ষার

আকাশ, আজ আবার একটু মেঘ করেছে, বৃষ্টির বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকলেও পথঘাট একেবারে অন্ধকার। ধাওড়ার দোরে গিয়ে মোহন ধাক্কা দিতেই ছালালী একটু চমকে উঠে বললে,—কে ?

চাপা গলায় বললে মোহন,—খোল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই লক্ষের মিজমিজে আলোয় চারিদিক একবার লক্ষ্য ক'রে নিলে মোহন, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা গোছগাছ সব ঠিক হয়ে গেছে। মদের ভাঁড়টা টেনে নিয়ে মেঝের উপর বসে পড়লো মোহন, এই সময়ে একবার নেশা ক'রে নেওয়া দরকার। লক্ষটা মোহন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে, মদের ভাঁড় তার হাতেই আছে, অন্ধকারে আটকাবে না। ছালালীর কিন্তু ছুর ছুর ক'রে গাঁ কাঁপছে, মোহনের কোল বেঁধে অন্ধকারেই চুপচাপ সে একধারে বসে পড়লো। মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে মোহন বললে,—একটু খাবি ? ছালালী কিন্তু আজ মদ খেতে রাজি হলো না। মোহন চুপিচপি জিজ্ঞাসা করলে,—এর মধ্যে কেউ আসে নি ত ? ছালালী বললে,—না। ছালালীর মনটা কিন্তু ছাঁক ছাঁক করছে, এমন ভাবে হাতগড়া একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই মনঃপুত নয় ছালালীর। ছালালী জানে তার জ্ঞান মোহনের ভালবাসা কতখানি প্রবল, ছালালীর অপমান সে কোনমতেই সহিতে পারে না : কিন্তু তাই বলে যে ছালালীর জ্ঞান যার তার সঙ্গে হঠাৎ সে একটা মারাত্মক কাণ্ড ক'রে বসবে, এটা কিন্তু ছালালী ভাল বোঝে না। সন্ধ্যার পর থেকেই ছালালীর বুকখানা টাই টাই করছে।

বারাঘনী ব্রাহ্ম লাইনের রাত্রের ট্রেনখানা হুম্ হুম্ শব্দে পাস হয়ে গেল উত্তর দিকের মাঠের উপর দিয়ে, ধাওড়াগুলো একটু কঁপে উঠলো, তারপর চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। আশে পাশে জনমানবের



সাদা শব্দ নাই, জানলার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে একটু একটু বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। মোহনকে একটু নাড়া দিয়ে ছললী বলে উঠলো,—এই সময় চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি চল, কাজ নাই আর বথেন্ডা বাড়িয়ে।

ধাওড়ার পিছন দিকে হঠাৎ জানলায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। ছললীকে মুহূ একটা ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মোহন,—চুপ।

ছললী হঠাৎ অন্ধকারেই চেপে ধরলে মোহনকে, ভয়ানক তার ভয় করছে, মোহনের কাছ ছেড়ে কোনমতেই সে এগুতে চায় না। মোহন ছললীকে জোর ক'রে জানলার দিকে ঠেলে দিয়ে ধাওড়ার এককোণে গিয়ে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো। বার দিক থেকে খট খট ক'রে শব্দ হলো আর একবার, ছললী ধীরে ধীরে জানলাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বার দিক থেকে টর্চের আলো এসে পড়লো ছললীর মুখের উপর। জানলাব ওপাশ থেকে চাপা গলায় কে বলে উঠলো,—আমি এখন চমুম। বাউরী বুড়ীর গলার আওয়াজ, ছোট সাহেবকে\* সে এগিয়ে দিতে এসেছে। ছললীকে বার দিক থেকে এক নজর দেখে নিয়ে টর্চের আলোটা আবার সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে ফেললে টমাস সাহেব, খুশী হয়ে সে বলে উঠলো,—ঠিক হয়।

ছললী আবার ধীরে ধীরে জানলাটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। মোহনের সর্বাস্ব গুর গুর ক'রে কাঁপছে। ছললীকে অন্ধকারেই কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে মোহন গিয়ে দাঁড়ালো দরজার ঠিক পিছনে, আগে থেকেই দরজায় খিল আঁটা আছে। চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ ক'রে ছললী হঠাৎ কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো মোহনকে,• মুহূ একটা শিস্ দিয়ে ছললীকে থামিয়ে দিলে মোহন।

দু'এক মিনিট পরেই দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ, একবার—দু'বার—  
তিনবার ; ভিতর থেকে কোন সাড়া নাই, দরজার খিলটা বেশ শক্ত  
ক'রে এঁটে ধরেছে মোহন। দরজার উপর বার দিক থেকে আরও  
কয়েকটা টোকা পড়লো, তারপর হঠাৎ মুহূগলায় আওয়াজ,—খোলো।

ভুলালী বা মোহন কেউ কোন সাড়া দিলে না। চাপা গলায় বার  
থেকে আবার আওয়াজ হলো,—জলদি খোলো, ডরো মৎ বিবি।

এবার কিন্তু দরজাটা সত্যি সত্যি খুলে গেল। দরজার পিছনে  
চুপচাপ যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে টমাস সাহেবকে অভ্যর্থনা  
করবার জন্ত সে কিন্তু টমাস সাহেবের বিবি নয়, স্বয়ং বাবা। গম্ভীর  
গলায় একটা হাঁক দিলে মোহন,—কে ?

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের স্নাইচটা টিপে দিলে টমাস সাহেব। মোহনকে  
দেখে হঠাৎ সে একটু চমকে উঠলো, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো  
সাহেব,—ও নাই গড, টুমি শালা ইখানে !

মোহন কিন্তু সাহেবের এই মোলায়েম সম্বোধনটা বরদাস্ত করতে  
চাইলে না মোটে, সাহেবকে সে বোনাই বলে স্বীকার করলে না, সঙ্গে  
সঙ্গে বলে উঠলো,—শালা কাকে বলছিস সায়েব, খবরদার।

টমাস সাহেব মনে মনে এঁচে নিলে—ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক  
নয়, এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে, মোহন মাঝির বৌটা বিটে করেছে  
টমাস সাহেবকে। টমাস সাহেবের মনের অবস্থা সর্দিন হয়ে উঠলো,  
সামান্য একটা মালকাটা সাহেবের মুখের উপর তাকে যা-তা বলতে  
সাহস করে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে! কিন্তু উপায় কি, স্থান কাল  
এবং পারিপার্শ্বিক সাহেবের পক্ষে অতুল নয়, বাধ্য হয়ে সাহেবকে তাই  
এ অপমান সয়ে নিতে হলো। কিন্তু সাহেবের পক্ষে এ অসহ্য, খাপসা হয়ে  
উঠলো টমাস সাহেব, তীক্ষ্ণ কর্ণে সে বলে উঠলো,—টুমি শয়টান

আনটাইমলি কান ছোড়কে আঙার গ্রাউণ্ডসে ভাগা হয়, টুমকো হান পুলিশ বোলাকে হাজটমে চালান করে গা।

মোহন মাঝিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—আর তুই? তুই যে নিজের বাংলা ছেড়ে রাত ছপুরে কুখিকামিনদের খাণ্ডায় এসে মেয়ে নাচুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস, তুই শালাকে চালান দিবেক কে!

টমাস সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো,—স্কাউণ্ডেল!

মোহন একটু উত্তেজিত ভাবে বললে,—খবরদার সায়েব, মুখ সামলে কথা বলিস।

টমাস সাহেব থ মেরে গেল, মোহনের ভাবগতিক এবং কথাবার্তার ধারাবাহিক ভাল মনে হলো না সাহেবের; ধীরে ধীরে সে পিছু হঠতে আরম্ভ করলেন। মোহন গিয়ে তাড়াতাড়ি সাহেবের পথ আগলে দাঁড়ালো, বললে,—পালাবি কুখা সায়েব, এমনি তোকে ছেড়ে দিব ভেবেছি।

তুলালী পিছন থেকে ডাক দিলে,—মোহন!

টমাস সাহেব মোহনের মুখের উপর আর একবার টর্চের আলো ফেলে কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলো,—হঠাৎ মান—যানে দেও হানকো, হামসে টুম ক্যা নাংতা হয়?

টমাসের ডান হাতটা হঠাৎ থপ্ করে চেপে ধরলে মোহন, বললে,—তুমি শালা রাত্রির বেলা কার হুকুমে আমার খাণ্ডায় এসেছ তুনি?

টমাসের সাহেবী রক্ত গরম হয়ে উঠলো, মোহন মাঝির এ স্পর্ধা অসহ্য, হাতটা তার কাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুঘি পাকিয়ে মোহনের বুকের উপর জোড় ভারতি ঝেড়ে দিলে সাহেব হঠাৎ এক ঘুনি। বাঘের মত সাহেবের উপর কাঁপিয়ে পড়লো মোহন। পরিস্থাপ্তি করতে করতে

দু'জনেই গড়িয়ে পড়লো ধাওড়ার দাওয়ার উপর। ছললী একটু ভয় পেয়ে বলে উঠলো,—মোহন—মোহন!

মোহনের দেহখানা যেন পাথর দিয়ে গড়া, অস্বরের মত শক্তি তার গায়ে। মোহনের হাতে কতকগুলো চড় চাপড় আর ঘুষি থেয়ে সাহেব একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। ছললী গিয়ে তাড়াতাড়ি সাহেবের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে মোহনকে। ধীরে ধীরে টমাস সাহেব উঠে দাঁড়ালো, হাঁটবার তার সঙ্গতি নাই, মোহনের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে বাঁ পা-টা তার মচকে একেবারে জখম হয়ে গেছে। ঝোঁড়াতে ঝোঁড়াতে ধাওড়ার নীচে গিয়ে নামলো টমাস, সর্কাস তার গুর গুর ক'রে কাঁপছে, মোহনের দিকে পিছন ফিরে গর্জে একবার তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো টমাস সাহেব,—আই ওন্ট লিভ ইউ মোহন মাজি, টুমকো হাম ডেথেন্গা।

মোহন গিয়ে আবার হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে ধরে নিয়ে এলো টমাস সাহেবকে একেবারে ধাওড়ার মধ্যে, বললে,—তুমি শালাকে আজ আর আমি বাঁচায় ফিরে যেতে দিচ্ছি না, থাকো শালা সারারাত এই ধাওড়ায় পড়ে।

মোহন আর একটা ধাক্কা দিতেই টমাস একধারে ছিটকে পড়লো। তাশভাবে ধাওড়ার মেঝের উপর ফ্লাট হয়ে শুয়ে পড়লো টমাস সাহেব। দ্ব্যকাবেই ঠোঁটের উপর সে হাত বুলিয়ে দেখে তার নীচের পাটির মিনেকার দাঁত, একটা নাই, ঠোঁট গড়িয়ে গল গল ক'রে রক্ত ঝরছে। জের মনেই অশ্রুটস্বরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো টমাস,—হরিবল্—রিবল্।

জিনিসপত্র আগে থেকেই গোছ করা ছিলো। মোট পৌটলা গুলো ওড়া থেকে টেনে বের ক'রে এনে ছললীকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে পড়লো মোহন। যাবার আগে দরজার শিকলটা সে বার দিক থেকে টেনে দিয়ে গেল। চমকে উঠলো টমাস সাহেব, ঘর থেকে বেরোবার আর কোন উপায় নাই। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো টমাস, ভিতর থেকে সে ডাক দিতে লাগলো,—মোহন নাজি—মোহন নাজি!

মোহনের আর সাড়া শব্দ নাই। অন্ধকার ধাওড়ার মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে মশা ডাকছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো টমাস সাহেব। এর চেয়ে যে সামনা সামনি ফাইট দিয়ে আরও গোটা-কয়েক সাঁওতালী থান্ডু খেতে নাজি ছিলো টমাস, ধাওড়ার মধ্যে পড়ে পড়ে এমনভাবে মশার কামড় অসহ্য। ধাওড়ার ভিতর থেকেই উদ্ভাস্তের মত আর একবার হঠাৎ চীংকার ক'রে উঠলো সাহেব,—মোহন নাজি—মোহন নাজি!

কারো কোন সাড়া পাওয়া গেল না, জানলার পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে গেল খানিকটা দমকা বাতাস। ঘেঁষের উপর পড়ে পড়ে নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মনেই মাঝে মাঝে গর্জে উঠতে লাগলো টমাস সাহেব। ধাওড়া থেকে বেরোবার উপায় নাই, বার দিক থেকে দরজার শিকল টানা।

মোহন আর ছুলালী চরণপুর কলিয়ারির সীমা ছাড়িয়ে এসেছে। জমার বাধা অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা, পথ ঘাট কিছু দেখা যায় না। মাঝে মাঝে শুধু এক একবার বিদ্যুৎ চমকানো। বিদ্যুতের সেই আবছা আলোয় পশ্চিম দিকে যাবার পথ তারা একটা ধরে নিয়েছে, কোথায় যে তাদের যেতে হবে সঠিক কিছু জানা নাই। ওবু যেতে হবে, যেখানে হোক যেতে তাদের হবেই, সেই অজানা ঠিকানায় পথই হয়ত তাদের পৌঁছে দেবে যথা সময়ে।

## সাত

চরণপুর কলিয়ারি ছেড়ে আসার পর আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে ফিরে মোহন আর তুলালী শেষ পর্যন্ত উঠেছে এসে পাথরডিহা। দেশছাড়া এই দু'টি প্রাণী ক্রমাগত দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বহুদিন কাটানোর পর এখানে এসে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। দিন এখানে কেটে যাচ্ছিলো ভালই। ভুলেও কোনদিন তুলালীকে এতটুকু অবহেলা করেনি মোহন, তার আদর যত ভালবাসা তুলালীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলো সব কিছু দুঃখ কষ্টের আঘাত। এক ফোঁটা ওই মেয়েটা পৃথিবীর বুকে নেমে আসার পর সংসার যেন এদের চোখে হয়ে উঠলো মধু হতে মধুময়। কি নিবিড় আকর্ষণ ওই একরকমি মেয়ের। কতদিন খাদের নীচে কাজ করতে করতে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে মোহন মেয়েটাকে শুধু একবার দেখতে, মেয়েটা যেন ওদের চোখে পরম এক বিস্ময়, ছন্নছাড়া জীবনের যাবত্থানে নতুনতর এক মধুর আকর্ষণ। তুলালীর উপর শ্রদ্ধা যেন বেড়ে গেছে মোহনের, আজ শুধু তুলালী তার একমাত্র জীবন-সঙ্গিনীই নয়, তুলালী আজ মোহনের সন্তানের জননী। পাথরডি কলিয়ারির কুলিধাওড়ায় দুটো বছর প্রায় দেখতে দেখতে কেটে গেল স্বপ্নের মত। স্বজন বান্ধবহীন গলাতক জীবনের তবু একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিলো তুলালী, মনে মনে পেয়েছিলো পরিপূর্ণ সান্ত্বনা; মোহনের সাহচর্যে মন তার ভরে উঠেছিলো ছোট্ট একটি সংসারকে ঘিরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্বপ্নটুকু সহিলো না হয়ত তুলালীর ভাগ্যে, নৈলে মোহন হঠাৎ এমন ধারা বিগড়ে যাবে কেন। দুশ্চরিত্রা একটা বাউরীর মেয়ের খপ্পরে পড়ে

নিজের চরিত্রকে আজ কলুষিত ক'রে তুলেছে মোহন, ছালালীর সঙ্গে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ফেরাতেই হবে তাকে অপথ থেকে, ছালালীর চোখের সামনে মোহনকে সে এমনভাবে বয়ে যেতে দেবে না, কোন নতেই না।

বিছানায় পড়ে পড়ে কত কথাই ভাবছে ছালালী, চোখে তার ঘু-  
নাই। রাত বারোটার ভাঁ বাজলো হঠাৎ তিন নম্বর খাদে, ছালালীর  
যেন চমক ভাঙ্গলো এতক্ষণে; রাত হয়ে গেছে এতখানা—মোহন ত  
কই ফিরলো না এখনো। সত্যিই কি সে ছালালীর উপর রাগ ক'রে  
সরে পড়লো? রাত্রে যদি আর না ফিরে! পড়েছে হয়ত গিয়ে  
সুন্দরা বাউরীনের ঝঞ্জরে, সে যে বড় কঠিন ঠাই। সুন্দরার গোরো গা  
আর বিঘ্ননী খোঁপার চটক দেখেই শেষ পর্যন্ত ভুলে গেল মোহন!  
আজ হয়ত সারাতা রাত ওরা একসঙ্গেই কাটাবে, হয়ত বা এক শয্যায়।  
রাগ ক'রে নতুন শাড়ীখানা পর্যন্ত মোহনকে আজ ফিরিয়ে দিয়েছে  
ছালালী, কাজটা কিন্তু ভাল হয় নি, দিলে হয়ত মোহন শাড়ীখানা  
সুন্দরাকেই দিয়ে। কি ভুলই করেছে ছালালী, কেন সে মরতে শাড়ী-  
খানা ফিরিয়ে দিতে গেল। এতক্ষণ হয়ত সুন্দরার বাড়ীতে আসর  
ওদের জমে উঠেছে। বোতল বোতল মদ চলছে হয়ত, মদ ত ওরা  
খাবেই, আজ হয়ত খুব বেশি ক'রেই খাবে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ  
খাইয়ে মোহনকে যদি বেহঁস ক'রে দেয় সুন্দরা! এই ত ওদের  
কাজ; নেশার ঝাঁকে টলতে টলতে মোহন হয়ত একধারে গড়িয়ে  
পড়বে, আর সেই ফাঁকে কোমরের গেঁজে থেকে টাকাপয়সাপুলো  
ঝেড়ে ঝুড়ে বিলকুল হাতিয়ে নেবে সুন্দরা। তারপর দেবে হয়ত ঘর  
থেকে লাথি মেরে বিদেয় ক'রে। মুখ খুঁড়ে রাস্তায় পড়ে  
চীৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না। না—না—এর ব্যবস্থা

করতে হয়েছে, বাড়ী কিরিয়ে আনতে হবে মোহনকে যেমন ক'রে হোক ।

শয্যা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ছালালী । নিশ্চক্ৰ নিশ্চিতি রাত, অন্ধকারে চারিদিক খম্ খম্ করছে । ঘুমন্ত মেয়টাকে কোলে ফেলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো ছালালী । সুন্দরার ধাওড়ায় তাকে যেতে হবে, এফুনি এই রাত্রেই, সেই রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে মোহনকে ।

পথ ঘাট নিরুন্ম । ছাইবিছানো একটা অপরিসর রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো ছালালী । তিন নম্বর খাদের ধাওড়া গুলো নেহাত কাছে নয়, বেশ খানিকটা দূর আছে ছালালীদের ধাওড়া থেকে ; নাকথানে কোম্পানীর বিজলি-বাতির কারখানা । বিজলি ঘরের ফটকে কোম্পানীর সেপাইরা বন্দুক ঘাড়ে ক'রে পাহারা দেয় চক্ৰিশ ঘণ্টা, দেখতে পেলো হয়ত বা তাড়া ক'রে আসবে । ছাই বিছানো সড়পটা ছেড়ে দিয়ে বিজলি ঘর বায়ে রেখে ডান দিকের একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে চললো ছালালী । ভয়ে তার গা ছম ছম করছে, কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে সুন্দরার ধাওড়া পর্য্যন্ত । সুন্দরার ধাওড়া সে চিনে না, কোন রকমে খুঁজে নিতে হবে ; ওপাড়ার এক ছলেবুড়ীর সঙ্গে ছালালীর চেনাশোনা আছে, এই যা একটু ভরসা । বুড়ীর বাসাটা একদিন দেখে এসেছে ছালালী, তাকেই গিয়ে ডেকে হেঁকে তুলতে হবে কোন রকমে । ছলেবুড়ী লোক খুব ভাল, ছালালীর সঙ্গে কাজ করে সে এক কুঠিতে ।

পূর্বদিকের আকাশটা কিছু ফরসা লাগছে, ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে দূরের একটা কয়লা খাদের বয়লারের পাশ দিয়ে । আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা তে-মাথার নোড়ে জন দুই মালকাটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ছালালীর, রাত পালিতে কাজে যাচ্ছে লোকগুলো ।



দূর থেকে ছালালীকে দেখেই হাক দিয়ে উঠলো একটা লোক,—  
যায় ?

ছালালী সাড়া দিলে না, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।  
দুটো ছোঁড়া ওর সামনে এসে দাঁড়ালো, ছালালীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে  
শিস্ দিতে আরম্ভ করলে একজন, আর একজন রসিকতা ক'রে বললে,—  
এত রেতে ইকলা কেনে মাইরি !

অপর লোকটা ছালালীর আর একটু কাছ হেঁবে বলে উঠলো,—  
দোকলার খোঁজে বেরিয়েছ নাকি ?

ছালালী থমকে একটু দাঁড়ালো, ছোঁড়াগুলোর ভাব গতিক ভাল নয় ;  
সামনা সামনি দাঁড়িয়ে ছালালী হঠাৎ বলে উঠলো,—কি চাস তোরা ?

একটা ছোঁড়া বলে উঠলো,—তোর মতন একজন সঙ্গী।

ছালালীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। ছোঁড়াটা আবার সঙ্গে সঙ্গে  
বলে উঠলো,—আমরা অবশ্য দাম দিতে রাজি আছি, কয়েক আনা পরমা  
এখনো পড়ে আছে গেঁজেতে, বের করবো নাকি ?

ছালালীর কণ্ঠ স্বর কঠোর হয়ে উঠলো, জোর গলায় সে বলে  
উঠলো,—খবরদার, ভাল চাস ত পথ ছেড়ে দে।

ছোঁড়াটা একটু হকচকিয়ে সরে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গীটা আরও  
খানিক এগিয়ে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ ছালালীর সামনে, বললে,—পথ যদি  
না ছাড়ি, কি করবি তুনি ?

ছালালী বললে,—চেষ্টায়ে লোক জড়ো করবো, বিজলিঘরের  
দারোয়ানদের ডেকে ধরিয়ে দিব তোদের; যদি ভাল চাস ত চুপচাপ সরে  
পড়।

ছালালীর ভাবগতিক সুবিধের নয় দেখে একটা ছোঁড়া আগেই  
খানিকটা সরে পড়েছে, ওর সঙ্গীটা কিন্তু ইতস্ততঃ করছিলো তখনো,

সামনের একটা বস্তির মোড়ে হঠাৎ দেখা গেল কতকগুলো মালকাটা মগবাতি হাতে ঝুলিয়ে রাতপালিতে খাটতে বেরিয়েছে, লোকগুলোকে দূর থেকে দেখেই ছোঁড়া ছোটো তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। ছললী আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না, হন্ হন্ ক'রে পা চালিয়ে দিলে ছলেবুড়ীর ধাওড়ার দিকে মুখ ক'রে। ছলে বুড়ীর দোরের সামনে গিয়ে খখন পৌছলো ছললী—থর থর ক'রে ওর হাত পা গুলো কাঁপছে। দোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ছললী ডাকতে লাগলো,—মাসী, ও মাসী!

ভিতর থেকে সাড়া দিলে ছলেবুড়ী,—কে, এত রেতে কে গো?

ছললী বললে,—দোরটা একটু খোল মাসী, আমি ছললী।

লক্ষটা জ্বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দোর খুলে দিলে ছলেবুড়ী, ছললীকে দেখে বুড়ী অবাক হয়ে গেল, বললে,—এত রেতে যে?

ছললী একটু কান্দো কান্দো হয়ে বললে,—মোহনকে খুঁজতে এসেছি, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঘর থেকে আজ পালিয়ে এসেছে।

ছলেবুড়ী একটু হতাশ ভাবে বলে উঠলো,—হায়রে আমার কপাল, রাত দশটার গাড়ীতে যে সুন্দরার সঙ্গে মেলা দেখতে চলে গেল খালভরা।

ছললীর বৃকের ভিতরটা ছাঁয়া ক'রে উঠলো, আজ আর সন্দেশের কিছু থাকলো না, রটনা তাহলে পুরোপুরি সত্যি। এতদিন তবু কতকটা ঢেকে ঢেকে চলছিলো, এখন আর ঢোম সঙ্কোচ নাই। একটা বাউরীর মেয়ের সঙ্গে অনায়াসে রথ দেখতে চলে গেল মোহন ছললীকে ধাওড়ার মধ্যে একা ফেলে রেখে! এতখানা বে-পরোয়া এর আগে ত সে ছিলো না। সুন্দরা হয়ত গুণ করেছে, জড়িবিড়ি হয়ত খাইয়েছে কিছু মোহনকে। ঝর ঝর ক'রে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ছললী, বললে,—মাসী, উয়াকে নিয়ে যে আমি জ্বলে পুড়ে মলুম।

তুলেবুড়ী সায় দিয়ে বললে,—তাই দেখছি, পুরুষটি কি তোর সোজা, আর খানিক হলে মটুকধারীর সঙ্গে আজ লাঠালাঠি হয়ে যেতো।

মটুকধারী সিং—কোম্পানীর এক হিন্দুস্থানী কর্মচারী, ভায়নক লোক সে। আধময়লা গায়ের রঙ, বেঁটে দো-হারা চেহারা, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়, বহুকাল থেকে পশ্চিম মূলক ছেড়ে এই অঞ্চলে এসে বাস করছে মটুকধারী সিং, লোকটাকে প্রায় কলিয়ারির সকলেই চিনে। মাথায় একটা তেল-চোয়ানো বহুকেলে মলমলের গোলাপী রঙের পাগড়ী, কপালে একটা চন্দনের কোঁটা, আর হাতে একগাছা পিতলের তার জড়ানো ভোজপুরী লাঠি ; এ তিনটি জিনিস মটুকধারীর সব সময়ের সঙ্গী, এগুলি তার অভিজাত্যের প্রতীকচিহ্ন। মটুকধারীর নামটাও খুব পরিচিত এমহলে, ছেলে বুড়ো থেকে আরম্ভ করে কলিয়ারির প্রায় সকলেই তাকে চিনে। হুন্দরার ধাওড়ায় সে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে এ খবরটাও জানা আছে সকলেরই। হুন্দরার সঙ্গে অপর কাউকে বেশি রকম মেলামেশা করতে দেখলে মটুকধারী যে সহজে তাকে ছেড়ে কথা কইবে না এ এক রকম জানা কথা, লাঠালাঠি বাধতে কতক্ষণ! তুলেবুড়ীর কথা শুনে মোহনের জ্ঞান ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লো তুলালী।

হুন্দরার ধাওড়ায় আজ সন্ধ্যার পর গোলমাল হয়েছিলো একটু বিশেষ রকমের। তুলে বুড়ীর কাছ থেকে তারই বিস্তারিত বিবরণ শুনতে শুনতে তুলালী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। মোহন এসে ঢুকেছিলো হুন্দরার ধাওড়ায়, বোতল বোতল মদ আর হৈ-হুল্লোড় চলছিলো ওদের সন্ধ্যার পর থেকেই। মটুকধারী সিং এসে মোহনের সঙ্গে এই নিয়ে একটা যথেষ্ট বাঁধাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু হুন্দরার কাছে তার বাজি

খাটেনি, গালাগালির চোটে হৃদ হয়ে শেষপর্যন্ত সে পিছতান দিতে বাধ্য হয়েছে। স্পষ্টই তাকে জানিয়ে দিয়েছে সুন্দরা যে মটুকধারীর সে বিয়ে করা বউ নয়, কোন বেটার সে জোরজুলুমের ধার ধারে না; সুন্দরা যে মাঝে মাঝে এক আধটু অগ্রহ করে মটুকধারীকে এই তার সাতপুরুষের ভাগ্যি। মটুকধারী কিন্তু সুন্দরার পিছনে এ পর্যন্ত বহু টাকা খরচা করেছে, সুন্দরার সঙ্গ লাভ করবার জন্য গোড়ার দিকে চাঁচড়ামিও তাকে কম করতে হয়নি; আজ হঠাৎ মোহন বা অপর কেউ এসে যে তার চোখের সামনে সুন্দরার উপর ভাগ বসাবে—এ তার পক্ষে অসহ্য। মটুকধারী সিং আরও দু' একজন সঙ্গী জুটিয়ে সুন্দরার ধাওড়ায় আজ গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলো। সুন্দরা তাদের ঝাঁটা পেটা ক'রে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। হৈ চৈ আর হট্ট গোলের মুখে আর খানিক হলে মটুকধারীর আস্ত একটা কান আজ প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিলো সুন্দরা, ওর সঙ্গে লোকগুলো খুব ঝাতিয়ে দিয়েছে। যাবার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে মটুকধারী—সুন্দরা বাউরীকে যদি সে জঙ্ক ক'রে ছেড়ে দিতে না পারে ত মটুকধারী তার নাম নয়। সুন্দরা কিন্তু ভ্রক্ষেপ করে না ও সব শাসনিক, মটুকধারীর মত তের তের দেখা আছে তার; কত কত লাঠি-ধারী সুদখোর কাবলিওয়াল পর্যন্ত টিঁট হয়ে গেছে সুন্দরার পাল্লায় পড়ে—মটুকধারী সিং ত কোন্ ছার। মটুকধারীকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে সেজে গুজে মোহনের সঙ্গে মেলা দেখতে রওনা হয়ে গেছে সুন্দরা রাত দশটার ট্রেন ধরে। বিক মেরে সুন্দরার সামনে পৈতে ছুঁয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে মটুকধারী—জীবনে যদি সে কোনদিন আর সুন্দরার ছায়া নাড়ায় ত ছত্রি থেকে সে বাতিল। বাউরী কামিনগুলো একধার থেকে সব নিমকহারামের একশেষ—হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে মটুকধারী, চফুলজ্জার বালাই ওদের এতটুকু নাই।

মটুকধারী সিং—সুন্দরার কাছ থেকে সত্যাই সে আজ দাগা পেয়ে  
 সুন্দরা চলে যাওয়ার পর কুলিধাওয়ার আশে পাশে পাথচারি ক'  
 খানিক ঘুরে বেড়ালে মটুকধারী, মনটা তার ভায়নক বিচড়ে গেছে। ঘুরা  
 ঘুরতে শেষপর্যন্ত সে সুখদা বাগতিনীর ধাওয়ায় গিয়ে হাজির হে  
 রাত ছপুয়ের পর। সুন্দরার চেয়ে লোক ভাল সুখী, ভদ্রলোকের ম  
 সম্মান জানে। বয়সটা তার যদিও কিছু বেশি, তবু সাবেক দিনে  
 চেহারা তার একেবারে ভাটা পড়েনি আজো। দরকার হলে ও  
 সুখদাকেই আর একটু ঘবে মেজে দিবি; চালিয়ে নেওয়া যায়  
 মটুকধারী তাই করবে, বাড়ু মারো সুন্দরার মত বাজুখাই দজ্জাল মেয়ে  
 মুখে। পথঘাট একটু নিচাল হয়ে এলে মটুকধারী সিং সুখদা বাগতিনী  
 দোবে গিয়ে দীরে দীরে ঘা দিতে লাগলো, চুপি চুপি ডাক দিলে,—সুখি  
 ও সুখি!

সুখদা কিন্তু সত্যই খুব লোক ভালো। গলার আওয়াজ চিনবা  
 মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ছেড়ে উঠে এসে ধাওয়ার দোর খুলে দিলে।  
 মটুকধারী চুপচাপ ঢুকে পড়লো ভিতরে, সুখী আবার দীরে দীরে দরজাটা  
 বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে নিঃশব্দে খিল এঁটে দিলে। রাত তখন  
 অনেক হয়ে গেছে।

ছলেবুড়ীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে ছলালী আবার চুপচাপ শুয়ে  
 পড়লো নিজের ধাওয়ায়। আরও কিছুক্ষণ আগে গেলে মোহনকে হয়ত  
 ধরতে পারতো। সুন্দরার সঙ্গে তার মেলামেশা যে সত্যি এতখানা  
 এগিয়ে গেছে আগে থেকে ঠিক ভাবতে পারেনি ছলালী। মোহন বে  
 রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তাতে তাকে বাগ মানানো সহজ কথা নয়,  
 মতিগতি একেবারে বিগড়ে গেছে মোহনের। ছলালীই বা এত সহ্য করবে  
 কেন, মোহনের এই সব অত্যাচার সে সহ্য করবে না; মোহনের সঙ্গে আর

কোন সম্বন্ধই রাখতে চায় না ছলালী। ছলালীর মনে এত ধান! আঘাত দিয়ে স্থল্লরার মত একটা নামদাগা মেয়ের সঙ্গে এমনধারা যে পথে ঘাটে মাতামাতি ক'রে বেড়াতে পারে, ছলালী তার মুখ দেখতে চায় না। জাহান্নামে যাকগে সে, চুলোয় যাকগে তার ঘরকন্না, ছলালী আর ফিরে তাকাবে না। কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে যেদিকে ছুঁচোখ যায় সেই দিকেই বেরিয়ে পড়বে ছলালী। যেখানে হোক আশ্রয় একটা খুঁজে নেবে, কোথাও যদি ঠাই না পায় আবার সে ফিরে যাবে রামপুরের ডাকায়—যেখান থেকে সে চুপি চুপি চোরের মত পালিয়ে এসেছে। যদি মরতে হয় সেখানে গিয়ে মরাও ভালো, মোহনের ভিটের পড়ে পড়ে এ অত্যাচার সে কোননতেই আর সহ্য করবে না।

রাস্তিরটা কোনরকমে কেটে গেলে হয়, সকাল বেলা যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবে ছলালী। সেই ভালো, পাথরভি কলিয়ারি ছেড়ে দূরে কোথাও সে চলে যাবে, যেদিকে ছুঁচোখ যায়, যেখানে তার খুশি। সকাল হলেই মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ছলালী, মোহন যেন ফিরে এনে আর তাদের দেখতে না পায়; সেই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। মোহন বুক ছলালীকে হেনস্তা ক'রে কত বড় আত্মায় সে করেছে। ভাববার আর কিছু নাই, ছলালীকে পালাতেই হবে।

ছলালীর মেয়েটা হঠাৎ টাটা ক'রে একবার কেঁদে উঠলো, ছলালী তাড়াতাড়ি স্তন ধরিয়ে দিলে মেয়েটার মুখে। মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কত কথাই সে ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে নিজেও সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছলালীর যখন ঘুম ভাঙলো চারিদিক তখন ফরসা হয়ে গেছে, জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে স্বর্ঘ্যের সোনালী আলো, সামনের দেওয়ালটা একমুঠো সিঁদুর মেখে যেন রেঙে উঠেছে।

রথপরবের দিন, কলিয়ারির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। কুলিকামিনর  
 দলে দলে রথ দেখতে চলেছে সব ঝরিয়ার ডাঙ্গা। ধাওড়া  
 বারান্দায় একটা মাচুলির উপর সকাল থেকে চুপচাপ বসে আছে  
 দুলালী। মনটা বেশ ভাল নাই দুলালীর। সারা ঘরে ঝাঁট পড়েনি  
 সকাল থেকে, উঠনে আজ আঁচ দেওয়া হয় নি, ভোর বেলা উঠে  
 কল থেকে জল ধরাতে ভুলে গেছে দুলালী। কান সন্ধ্যাবেলা বাড়ী  
 থেকে বেরিয়ে গেছে মোহন, এতখানা বেলা হলো এখনো তার দেখা  
 নাই। কে জানে সে মেলা থেকে ফিরবে কিনা আজও। মোহন সে  
 রকম দুঃখ দিতে আরম্ভ করেছে দুলালীকে, তাতে আর একটি দিনও  
 এমন ভাবে তার হিল্লয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে উচিত নয় দুলালীর।  
 সকাল বেলা সে তৈরিও প্রায় হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু ধাওড়া থেকে  
 বেরতে গিয়ে পা যেন তার এগুতে চাইলো না, কে যেন তাকে  
 জোর ক'রে আবার ধরে এনে বসিয়ে দিলে এই মাচুলিটার উপর।  
 মোহনকে ছেড়ে চলে যাবে দুলালী? যে-মোহনের জন্ম জীবনের  
 সব কিছু পিছনে কেলো সে চলে এসেছে—তাকে আজ ছেড়ে যেতে  
 হবে! সেও যে আজ একা, সমাজে তার ফিরে যাবার উপায় নাই  
 আর, সে দিক দিয়ে যে মোহন আর দুলালী দুজনের দুঃখই আজ  
 সমান। না-না-এ অবস্থায় তাকে কেলো যাওয়া চলে না। তার  
 চেয়ে মৃত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে মোহনকে কুলিকামিনীদের  
 কুসংসর্গ থেকে, আবার তাকে টেনে তুলতে হবে যেমন ক'রে হোক।  
 এই সব ভেবে চিন্তেই ধাওড়া ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হলো  
 না দুলালীর। কিন্তু মোহন ত কই ফিরলো না, সকালের ট্রেনখানা  
 এসে গেছে অনেকক্ষণ, মোহনের ফিরবার কোন লক্ষণ নাই, আজ  
 হয়ত সন্ধ্যার আগে সে ফিরবেই না, ফিরতে তার কতখানা রাত

হবে তাই বা কে বলতে পারে। ঘর বাড়ীর কথা কি তার মনে আছে এখনো! ছলানী কিন্তু রাগের মাথায় কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়া দিয়েছে কাল মোহনকে, ছলানীর উপর রাগ ক'রে আর যদি সে না ফিরে। না—না—চুপচাপ আর বসে থাকা নয়, মেলায় গিয়ে খোজ খবর একটু করা দরকার; যে মেয়ের পাল্লায় সে পড়েছে—ভয়ের আশঙ্কা পদে পদে, ওই ডাকিনীটার হাত থেকে মোহনকে যে বাঁচাতেই হবে।

দরজায় তাল দিবে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে উঠলো ছলানী। দলে দলে লোক যাচ্ছে ঝরিয়ার মেলা দেখতে। ছলানী গিয়ে ভিড়ে গেল একটা দলের সঙ্গে। পাথরভি থেকে ঝরিয়া মাত্র ক্রোশ তিনেকের পথ, পায়ে হেঁটেই চলেছে সব অবিকাংশ যাত্রীর দল। মাঝে মাঝে এক আধখানা একা গাড়ী পিচ দেওয়া রাস্তার উপর দিয়ে হেঁকে চলেছে,—ঝরিয়া ধানবাদ—ঝরিয়া ধানবাদ—চার চার আনা—ঝরিয়া—ঝরিয়া—চার চার আনা। রথপরবের মেলা উপলক্ষে রাস্তা ঘাটে বাহুব জনের ভিড় অল্প দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি।

চারদিকে শুধু কয়লার খনি। যে কোন দিকে তাকালেই চোখে পড়ে বড় বড় চিমনি দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে; কোনটা খুব কাছে, কোনটা একটু দূরে; যতদূর দৃষ্টি যায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। এদেশে পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর কালো ধোঁয়া, দেশের যত কালো বাহুবগুলো দলে দলে ছুটে আসে এই কালির দেশে কালো গায়ে কালি মাখতে। কয়লাখনির শ্রমিক এরা, দিনরাত এই কালি আর কালোর সঙ্গে লড়াই ক'রে ছনিয়াটাকে ঠিক মত চালু রেখেছে এরাই। গায়ের রক্ত জল ক'রে এরা মাটির



নীচে কয়লা কাটে, বিনিময়ে এদের নিয়োগকারী ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে হাড়ভাঙ্গা এই পরিশ্রমের কতটুকু মূল্য তারা পায়—বিচার ক’রে ভেবে দেখবার মত ততখানা বৃদ্ধি এদের জোগাননিকো ভগবান। খেটে খুটে এরা যা পায় তাতেই খুশী। দৈন্ত এদের ঘোচাতে পারেনি কেউ আজ পর্যন্ত, খেয়ে পরে বাঁচার মত বেঁচে থাকবার সমস্তা এদের কাছে চিরদিনই একটা সমস্তা, এ সমস্তার সমাধান এরা খুঁজে পায়নি আজো। তবু দেখি যথানিয়মে সংসার বেঁধে জীবনের বোঝা এরা বয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কোনখানে এতটুকু ব্যতিক্রম নাই, দুঃখ দৈন্ত অভাব অনটন ঠিক যেন পোষা কুকুরের মত একধারে বাঁধা আছে এদের জীবনের খোঁটায়। পেটের দায়ে কয়লা এরা কাটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যথাসাধ্য রোজগারের চেষ্টা এদের করতেই হয়; হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দেহ মনে একটা দুঃসহ অবসাদ এরা অজুতব করে ঠিকই, আবার মদ খেয়ে তাড়ি টেঁসে জীবনের এই সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতেও কিছুমাত্র এদের সময় লাগে না। পদে পদে জীবনের অফুরন্ত অভাব অভিযোগ সহ করেও হয়ত এই নেশার জোরেই কোন রকমে আজো টেঁকে আছে নিরক্ষর এই ঊনমজুরের দল। কোন রকমে বেঁচে থাকবার মত যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিল তিল ক’রে সমস্ত জীবনী শক্তিটুকু অনায়াসে এরা বিক্রিয়ে দিতে পারে। তার জন্য কোন ক্ষুব্ধতা নাই, এতটুকু বিক্ষোভ নাই, মনটাকে এরা সব সময়ই চাঞ্চা রেখেছে। জীবন যুদ্ধে লড়তে হলে যেমন ক’রে হোক মনটাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, তাই এরা মনের খোরাক সংগ্রহ করে শস্তা দরের নেশা ক’রে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ভাঙ্গাচালায় এসে মদ ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকে মাতাল হুড়ু। চিরন্তন কুস্রতার বাধাবিল্ল অতিক্রম ক’রে নির্ধম

রুচতার মধ্যে থেকেই জীবনের আনন্দ এদের কোন রকমে খুঁজে নিতে হয়। অজ্ঞানতার অমোঘ আশীর্বাদে এরা মৃত্যুঞ্জয়ী, জীবনের মূল্য এরা বড় বেশি দেয় না, নিজেদের সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা এরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। জয় হোক এদের, জয় হোক এদের ভাগ্যবিধাতার।

ছোট বড় অনেকগুলো কলিয়ারিকে কেন্দ্র করে মাঝখানে বরিয়ান শহর। শহরের ঠিক পশ্চিম প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা ডাঙ্গা, শহরের প্রায় লাগালগি, বরিয়ান ষ্টেশন থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই। বিস্তীর্ণ এই ময়দানটার উপর রথপরবের মেলা বসেছে। দু'একদিনের মেলা, সমারোহ কিন্তু কম হয় না, আশ-পাশাড়ি কলিয়ারি থেকে বিস্তর লোক এসে জমা হয় এই বরিয়ার ডাঙ্গায় রথযাত্রার আগের দিন থেকেই। এদের মধ্যে মালকাটার সংখ্যাই বেশি, কলিয়ারির কুলিকানিনদের অসম্ভব ভিড় হয় এই মেলায়, প্রধানত এদের নিয়েই এবং এদের জুতাই মেলা। চাকুরে বাবু বা অফিসের কেরানী এবং অগ্ন্যান্ত ভদ্রস্থ বাক্তিদেরও সমাগম খুব কম হয় না। তামাসা দর্শক হিসাবে কলিয়ারির সাহেব ও মেন সাহেবরা পর্য্যন্ত এক আধঘণ্টা টুঁ মেরে যান এই রথের মেলায় এসে। তার উপর যত 'কলাবেচা' অর্থাৎ ব্যবসাদারদের ভিড় ত এখানে আছেই।

রথটা এখানে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, মেলাটাই মুখ্য। বাশ আর বেকারি দিয়ে তৈরি রথের একটা কাঠামোকে রঙিন কাগজ আর হলুদ দিয়ে রথের আকারে ছেয়ে নেওয়া হয়। ওর মধ্যে অবশ্য শিল্পকর্মের কারিকুরি বা পরিপাটি আছে যথেষ্ট; রথচারী দেবতার কিন্তু কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে, রথের উপর না একটা কোন ঠাকুর ঠুকুর, না কোন দেব দেবীর প্রতিমূর্তি।

নিছক একটা রঙিন কাগজের রথ, তাই দেখতে কাতারে কাতারে  
 লোক জমা হয় এসে প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট এই দিনটিতে, কাগজের  
 এই রথখানাকে উপলক্ষ করে। রথের উপর ঠাকুরের চাঁদমুখ বা  
 স্তম্ভা ও বলরামের শ্রীমূর্তি দর্শন করে পুণ্যসঙ্কয়ের আশায় আসেও  
 না কেউ এসব মেলায় রথ দেখতে, পথ বেয়ে শুধু রথখানাকেই এরা  
 দেখতে আসে। এদের কাছে এই বিশেষ দিনটির বিশেষ একটা  
 আকর্ষণ আছে, রথদেখার আসল উদ্দেশ্য এদের সিদ্ধ হোক আর না  
 হোক, মেলায় এসে দশজনের সঙ্গে মিলবার যে একটা আনন্দ সেই  
 টুকুই যেন এদের কাছে সব। 'বারো মাসে তেরো পরব'এর দেশে  
 বিপুল আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকতর মিলনের যে  
 আনন্দ তাকে উপভোগ করবার সুযোগ এইভাবে আমরা মাঝে মাঝে  
 পেয়ে থাকি আজো। মেলার আনন্দ—মানুষে মানুষে মিলনের আনন্দ,  
 মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিলনের আনন্দ। তাই আমরা এত আগ্রহ  
 করে মেলা দেখে থাকি, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যাই মেলার  
 নামে মানুষেরই মেলা দেখতে। সে মেলার পৌরাণিক ঐতিহাসিক  
 বা কৌকিক ভিত্তি যা-ই হোক না কেন—বিচিত্র এই মিলনের আনন্দ  
 আমাদের মিলনমুখী উৎসুক মনকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে বেশি।  
 কাগজের রথ, পটে আঁকা ছবি বা দেবতার দারুমূর্তি আসলে হয়ত  
 একটা রূপক মাত্র, এই রূপককেই আশ্রয় করে তীর্থে তীর্থে গড়ে  
 উঠেছে মানবের মহামিলন পীঠ। শ্রীক্ষেত্রের বালবেলায় অপরূপ  
 শিল্পখচিত পাবাপুরীর মধ্যে বৈকুণ্ঠের দেবতা মন্ত্যবাসী ভক্তের  
 ভক্তির শৃঙ্খলে আজো বন্দী হয়ে আছেন কি না জানি না, কিন্তু  
 তাঁর রূপককে উপলক্ষ করে তাঁর সেই প্রাক্তন পুণ্য আবির্ভাবকে  
 ভক্তিচিন্তে স্মরণ করে বর্ষে বর্ষে লক্ষ কোটি মানবের যে মহামিলন,

সে মিলনের তুলনা আছে কি ! অপূর্ব এই বিরাট সমারোহ চোখে দেখে মনে হয় যেন এদের এই মিলনটাই প্রত্যক্ষ সত্য, মনে হয় যেন নঙ্গলের দেবতা দেশ দেশান্তর থেকে এদের টেনে এনে একসঙ্গে সব মিলিয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে সুন্দর—এর চেয়ে বিচিত্র ও প্রাণবন্ত আর কিছু যেন কল্পনা দিয়ে ধরা যায় না। এই সব উপলক্ষকে আশ্রয় ক’রে, মাহুবে মাহুবে মিলনের এই ক্ষেত্র নিজে হাতে গড়ে নিয়েছে মাহুঘ দেশে দেশে মেলার সৃষ্টি ক’রে।

ঝরঝর ডাঙ্গা আজ থৈ থৈ করছে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। অস্ফাট বংসরের চেয়ে এ বংসর যেন ভিড়টা কিছু বেশি, এ অঞ্চলের অধিকাংশ কলিয়ারি থেকেই লোকজনের সমারোহ হয়েছে প্রচুর। এদের মধ্যে কিন্তু বেশির ভাগই পায়ে হাঁটার দল, কয়লা পনির মজুর এরা : অপেক্ষাকৃত সৌখিন যাত্রীদের জন্য মেলা পর্য্যন্ত যানবাহনেরও যথারীতি ব্যবস্থা হয়েছে রথযাত্রা উপলক্ষে। মোটর বাস, এক্সাগাড়ী রিক্সা ও টমটম হরদম যাওয়া আসা করছে গাড়ী বোঝাই যাত্রী নিয়ে : যাত্রীদের হাঁক ডাক ও হৈ-হুল্লোড়ের শব্দে সারা মেলা গুলজার, প্রকাণ্ড ময়দানটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত শুধু মাহুঘের গুঞ্জন। রকনারি লোকের ভিড়ে কোনদিকে আর পা বাড়াবার উপায় নাই, দুপুরের পর থেকে মেলা খুব জমে উঠেছে।

ছুলালী এসে এই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে যেন একেবারে হারিয়ে ফেললে। মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বার দুই তিন চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়ালে ছুলালী, কিন্তু বিরাট জন কোলাহলের মধ্যে থেকে মোহনকে সে কোনমতেই খুঁজে বের করতে পারলেনা। রথতলা থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে, মাটির একটা বেদির উপর কাগজের রথখানাকে স্থাপন করা হয়েছে ময়দানের এক পাশে, বাম্পে বেকারি

দিয়ে তার চারদিক বেশ শক্ত ক'রে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বেড়ার  
 বাইরে থেকে অসংখ্য দর্শক একদৃষ্টে চেয়ে আছে কাগজের রথখানার  
 দিকে। মেলার অগ্রাগ্র অমুঠান দোকান পসার ও নানাবিধ আমোদ  
 প্রমোদের ব্যবস্থাদি যাত্রীদের কাছে যতই লোভনীয় হোক, কাগজের  
 এই রথখানা আজ তাদের কাছে বিশেষ একটি আকর্ষণের বস্তু। লাল  
 রঙের শালুর উপর বালগোপালের ছোট্ট একটি ধাতু মূর্তি, পিতলের  
 সিংহাসন সজ্জা রাখা হয়েছে বেদির এক পাশে কাঠের একটা জলচৌকির  
 উপর। সামনে ঝক ঝকে তকতকে পিতলের একটা পিলসুজের উপর  
 গব্যঘূতের প্রদীপ জ্বলছে, ধূপধূনার গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে চারিদিক।  
 ফুল ফল মিষ্টান্নাদি উপকরণ সহযোগে নৈবিদ্যের থালা সাজিয়ে রথতলায়  
 এসে পূজা দিয়ে যাচ্ছে অনেকেই। বেদির নীচে সামনের দিকে প্রকাণ্ড  
 একখানা কানাউচু পিতলের থালা, যাত্রীরা সব বেড়ার ধার থেকে  
 পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে কানাউচু সেই থালাটার উপর। আনি দু-আনি  
 সিকি আধুলি গোটা টাকা ও খুচরো পয়সায় থালাটা প্রায় ভ'রে উঠেছে।  
 ত্রিপুরাধারী পূজকঠাকুর ও তাঁর সহযোগী শিষ্য সামন্তের দল কামরঘণ্টা  
 ও রানচাকির শব্দে জামগাটাকে একেবারে গুলজার ক'রে রেখেছে।

বহুকষ্টে লোকের ভিড় ঠেলে দুলালী গিয়ে বেড়ার এক পাশে  
 দাঁড়ালো। কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে; কত রকমারি  
 লোকই না চোখে পড়লো দুলালীর, কিন্তু নোহনকে সে এ পর্যন্ত কোন  
 মতেই খুঁজে বের করতে পারলে না। দুলালী ক্রমশঃ চিন্তিত হয়ে পড়তে  
 লাগলো। একদৃষ্টে ফ্যান্স ফ্যান্স ক'রে চেয়ে আছে সে কাগজের  
 রথখানার দিকে; এওত এক বংহা, বাঙ্গালীদের ঠাকুর। সাওতালদের  
 বংহা আর দিকুদের এই ঠাকুরের মধ্যে তফাৎ কি—নানে নানে প্রশ্ন জাগে  
 দুলালীর মনে জানে তফাৎ কি, দুলালী অত বোঝে না; কিন্তু এত এত

লোক এসে যার সামনে মাথা মুইয়ে একে একে গড় ক'রে যাচ্ছে—সে যে একটা নিশ্চয় কোন বড় রকমের বংহা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ছুলালীর। আর পাঁচটা মারাং বংহার মতই এও হয়ত একটা উঁচুদরের বংহা। বাঙ্গালীদের কত বংহা কত ঠাকুরদেই ত আজ পর্যন্ত মেনে চলে সাঁওতালরা, বিশ্বাস করে তাদের অস্তিত্বে বাঙ্গালীদের মতই। কালী বংহা, দুর্গা বংহা, লক্ষী বংহা, কার্তিক বংহা, অন্নপূর্ণা বংহা, আরও কত বংহা—পরবে সাঁওতালরা গিয়ে এক জায়গায় অনন্দ করে বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে, তাদের এই দেবতা গুলিকে বাঙ্গালীদের চেয়ে সাঁওতালরা ভক্তি কিছু কম করে না। এও হয়ত কাগজের তৈরি সেই রকমের একটা কোন বংহা। নামটা এর ঠিক জানা নাই ছুলালীর, সম্ভবতঃ রথ বংহাই হবে। ছুলালী মাথা মুইয়ে বার কয়েক গড় করলে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে, মনে মনে প্রার্থনা করলে মোহন আর শুকুরননির জন্ত। কচি মেয়েটার মাথাটা হাত দিয়ে একবার মুইয়ে দিলে রথ বংহার সামনে, এতে তার কল্যাণ হবে; বংহার দয়ায় শুকুর-ননির আলাই বালাই সব দূর হয়ে যাবে। আঁচলের খুঁট থেকে একটা চৌকোনা ডবল পয়সা বের ক'রে পিতলের থালাটার উপর ছুঁড়ে দিলে ছুলালী। আর একবার রথ বংহাকে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে সে মেলার দিকে আবার এগিয়ে চললো।

সার দিয়ে দু'পাশাডী বাজার বসেছে। ডান ধারে বড় বড় মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ফলের দোকান, মাঝে মাঝে খিলি পান ও তেলেভাজার দোকান। অপর সারিতে সামনাসামনি মনিহারির দোকানগুলি বেশ পরিপাটি সাজানো। তার পাশে বাসনপটি, লোহা-পটি, ষ্টীল ট্রাক্স পাথরের বাসন ও কাটা পোষাকের দোকান। আরও কত রকমারি জিনিসের দোকান সাজিয়ে মেলা জুড়ে বসে আছে বুপারীর

দল। প্রত্যেক দোকানের সামনে অসম্ভব ভিড়, একটা খাবারের দোকান থেকে সামান্য কিছু খাবার কিনে কোলের মেয়েটাকে পেট ভরে খাইয়ে নিলে ছুলালী, সারা দিন ওদের খাওয়াই হয়নি। কাটা পোষাকের দোকানে লাল নীল নানা রঙের পিরান বিক্রি হচ্ছে; ছুলালী একটা দোকানের সামনে থমকে একটু দাঁড়ালো, স্বকুরমনির জন্তে জানা সে একটা কিনেই নেবে নাকি? পরসা কড়ি কিছু তার সঙ্গেই আছে। কিন্তু মোহনের দেখা না পেয়ে ভয়ানক মূসড়ে পড়েছে ছুলালী, কোন কিছুই তার ভাল লাগছে না, দোকানে? সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে মোহনের কথাই সে ভাবতে লাগলো, কাল থেকে লোকটা গেল কোথায়? দোকানের একটা লোক ছুলালীকে লক্ষ্য করে বললে,—কি লিবি মেয়েন, সারা সেমিজ চাই কিছু? ছুলালী একটা রঙিন দেখে জামা কিনে নিলে স্বকুরমনির জন্তে, জামার দাম মিটিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটা পরিয়ে দিলে স্বকুরমনির গায়ে। লাল টুকটুকে ছোট্ট একটি পেনি, চমৎকার কিন্তু মানিয়েছে স্বকুরমনিকে, ছুলালীর মনটা সত্যিই খুব খুশী হয়ে উঠলো। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কাঠের একটা পুতুল, কাগজের ফুল, ছোট ছোট গোটা কয়েক খেলনা কিনে ফেললে ছুলালী স্বকুরমনির জন্তে। পাশেই এক ভালুকওয়ালা ভুগভুগি বাজিয়ে ভালুকের নাচ দেখাচ্ছিলো, অসংখ্য লোক তার চারদিক থেকে ভালুকওয়ালার ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছুলালী গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চারিদিক বেশ লক্ষ্য করে দেখে নিলে একবার; কিন্তু না, মোহন মাঝি এদের মধ্যে নাই। মেলার প্রায় সব জায়গাই খুঁজে দেখা হলো, মোহনের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। ভাবতে ভাবতে ছুলালী আবার এগিয়ে চললো।

মেলার একপাশে মাঝারি রকমের একটা তাঁবু খাটানো। তাঁবুর চারিদিক মার্কিন কাপড় দিয়ে ঘেরা, তাঁবুর সামনে লাল সালুর উপর

বড় বড় হরপে লেখা আছে—‘দি গ্রেট ইষ্টার্ন ম্যাজিক পাৰ্টি।’ আশে পাশে তাঁবুর গায়ে কতকগুলো অদ্ভুত ধরণের ছবি আঁকা, ম্যাজিক পাৰ্টির চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। তাঁবুর বাইরে বাঁশের মাচানের উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা লোক মুখোস পরে আর চুন কালি মেখে নানা রকম খেলা দেখাচ্ছে, টাটক বাজির খেলা। প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা মুখোস পরা একটা লোক নানা রঙের তালি মারা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে তাঁবুর সামনে মাচানের উপর দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঠিক পাশেই, গলায় তার প্রকাণ্ড একটা সাপ জড়ানো। চুহাতে দু’টো বড় বড় রামচাকি, কাঁই-ঝপক কাঁই-ঝপক শব্দে রামচাকি বাজিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিমায় মাচানের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে লোকটা। মাঝা তুলিয়ে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নানা রকম অদ্ভুত ভঙ্গি করতে করতে রামচাকির তালে তালে সেকি তার নাচ! হাজার লোক ফ্যাল ফ্যাল ক’রে চেয়ে আছে ভুঁড়িওয়ালার দিকে। মাঝুঝের মনের অবস্থা কতখানা উদ্ভ্রাম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন ধারা উৎকট নাচ সে অনায়াসে নেচে যেতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—সত্যিই তা ভেবে দেখবার কথা। তামাসা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ত যত রকম অভিনব পন্থা থাকতে পারে—এরা তার কোনটাই বাদ দেয় নি।

নাচনদার এই লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার কয়েকটা রিং নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে আর একটা লোক। রিং গুলোকে একটা একটা ক’রে পৃথক ভাবে দেখিয়ে একটাকে আবার আর একটার মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে গলিয়ে দিচ্ছে লোকটা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। রিং এর গায়ে রিং গলিয়ে হাতে পায়ে নানান জায়গায় নিজেকে একেবারে নাগপাশের মত জড়িয়ে ফেলছে লোকটা, আবার ওয়ান টু থ্রি বলতে না



বলতে এক লহমায় সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে দেহের উপর  
ঈষৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে। এই ধরনের আরও কত রিং এর খেলা,  
লোকটার কিন্তু কেরামতি আছে।

রিংওয়ালার পাশে আর একজন বাজিকর লাল রঙের টুকরো  
কাগজ মুখে পুরে নলের আকারে গোটা কাগজ টেনে বের করছে  
দর্শকদের সামনে। দেখতে দেখতে মাচানের উপর প্রস্তুত হয়ে উঠছে  
রঙিন কাগজ, নল ধরে যত টান দেয় কাগজ যেন বাতাসে থাকে ততই।  
দর্শকরা হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাজিকরের দিকে, এত কাগজ  
ওর মুখের মধ্যে ছিলো কোথায়,—আশ্চর্য্য! তাঁবুর বাইরে মাচানের  
উপর বাজিকরদের এই খেলাগুলো—এ নাকি তাদের অত্যাশ্চর্য্য  
যাত্নবিহা ও ভৌতিক ইন্দ্রজালের সামান্য কিছু নমুনা যাত্র। কে জানে  
তাঁবুর মধ্যে 'দি গ্রেট ইন্টার্ন ব্যাজিক পাটির' আরও কত অদ্ভুত খেলা ও  
অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজালের নিদর্শন পক্ষার অস্তরালে দর্শকদের জল্প সাগ্রহে  
অপেক্ষা ক'রে আছে।

দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দে জয় ঢাক বাজছে তাঁবুর বাইরে, তার সঙ্গে গলার  
সাপজড়ানো ভুঁড়িওয়ালা সেই মুখোশ পরা লোকটার উৎকট নাচ আর  
ঝাঁই-ঝগক ঝাঁই-ঝগক রামচাকির আওয়াজ। তাঁবুর ফটক দাঁড়িয়ে  
তালিমারা পাতলুন পরা আর একটা লোক ধরাগলার প্রাণের শক্তিতে  
চীৎকার ক'রে যাচ্ছে দর্শকদের লক্ষ্য ক'রে,—চার চার পয়সা—চার চার  
পয়সা—অদ্ভুত যাত্নবিহা ভৌতিক ইন্দ্রজাল—চার চার পয়সা। শব্দে  
নয়মুণ্ডের আকির্ভাব—প্রেত ও প্রেতিনীর ডরাবহ সঙ্ঘর্ষ—তাল-বেতালের  
কথোপকথন—চার চার পয়সা—চার চার পয়সা। যাত্ন সন্ধ্যাট ছিনিবান  
মাইতির অদ্ভুত তাসের খেলা, জীবন্ত সর্প ভক্ষণ, হাত পা বন্ধ অবস্থায়  
তালার্পাটা তোরঙ্গের মধ্যে থেকে আকস্মিক অস্ত্রদান, চার চার পয়সা—

চার চার পয়সা। পারাবতের অদ্ভুত স্বাভাবিক শক্তি, হুম্মান ও হুম্মানীর  
সাঁওতাল নাচ, রামছাগলের ঘোড়দৌড়, টিয়া পাখীর কামান দাগা, চার চার  
পয়সা—চার চার পয়সা—টিকিটের দাম চার চার পয়সা। এমন খেলা আর  
হবে না—চার চার পয়সা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না—চার চার পয়সা।

বিশ্বের লোক জমে গেছে ম্যাজিক পার্টির তাঁবুর সামনে। নগদ  
এক আনা মূল্যে টিকিট খরিদ করে দলে দলে লোক ঢুকছে তাঁবুর  
মধ্যে ম্যাজিক দেখতে। ছুলালী চুপ চাপ এসে দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর  
এক পাশে। বহুক্ষণ থেকে যাত্রীদের আনাগোনা সে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।  
কতলোকই ত এর মধ্যে এলো, চার পয়সার টিকিট কিনে একে একে  
ঢুকে পড়লো সব তাঁবুর মধ্যে। আবার কতলোক তাঁবুর সামনে  
ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিনা পয়সায় রকমারি টার্টকবাজির  
শুধু নমুনাগুলো দেখে নিয়েই যে যার আপনার সরে পড়লো কে কোন্  
দিকে। কত অচেনা লোক এলো গেল ছুলালীর চোখের সামনে  
দিয়ে, কিন্তু যার খোঁজে তার মেলা দেখতে আসা সে লোকটিকে খুঁজে  
বের করা কোন রকমেই সম্ভব হলো না ছুলালীর পক্ষে। কে জানে,  
মোহন যদি এর মধ্যে মেলা দেখা শেষ করে বাড়ী ফিরে থাকে।  
এমনও ত হতে পারে ছুলালী বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার পর মোহন  
গিয়ে ধাওড়ার সামনে একলাটি বসে আছে তারই অপেক্ষায়। সারা  
মেলা খোঁজাখুঁজি করেও যখন তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না,  
তখন এমনটা হওয়া আশ্চর্য নয় মোটেই। ছুলালীর মনটা ভয়ানক  
চঞ্চল হয়ে উঠলো, ধাওড়ায় তাকে ফিরে যেতে হবে; বেলাও যে  
আর বেশি নাই, এইবেলা চটপট রওনা না হলে ফিরতে হয়ত রাত  
হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে ছুলালী, তাঁবুর মধ্যে  
ম্যাজিক পার্টির খেলা শুরু হলো।

মাসুকের ভিড় ঠেলেতে ঠেলেতে ছুলালী এগিয়ে চললো বাইরের দিকে। মেলার মাঝখান দিয়ে কাগজের রথখানাকে তখন দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখার থেকে ওখার, আবার ওখার থেকে এখার পর্যন্ত। কতলোক ঘে রথের দড়ি ধরে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অহেতুক ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজের রথখানাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া আরম্ভ করেছে তার ইয়ত্তা নাই; এই ওদের আনন্দ, এই ওদের সখ; এই হলো এখানকার নিয়ম। কতবার যে ধাক্কা খেলে ছুলালী মেলা থেকে বেরোবার সময় কে তার হিসাব রাখবে। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেও ভিড় ঠেলে তাকে এগিয়ে যেতে হলো, এক মুহূর্ত আর অপেক্ষা করা চলে না। মেলার এক প্রান্তে এসে ছুলালী একটুখানি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়ালো, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যেন অতক্ষণে। এখারটার দাঁওতালদের নাচগান চলছে, বেঝেনরা সব একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে নাচছে, আর নাকিরা তাদের নাচের তালে তালে মাদল বাজাচ্ছে, সেই সঙ্গে মিঠেসুরে আড়বাঁশি বাজছে বেঝেনদের গানের সুরে সুর মিলিয়ে। ছুলালীর মনে হলো মেলা থেকে বেরোবার আগে নাচগানের আসরগুলো আর একবার দেখে যাবে নাকি। কিন্তু বার দুই তিন তর তর ক'রে ওগুলো খুঁজে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে মোহন নাকিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি পাখরডি কলিয়ারি থেকেই দু'তিনটে দল নাচ করতে এসেছে এই ঝরিরার মেলায়, মোহন কিন্তু তাদের মধ্যে নাই। নাচগানের সে পাশ বাড়ায়নি, আশ্চর্য।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছে ছুলালী, মেলার একপ্রান্তে সে প্রাচ এসে পড়েছে। সামনে একটা নাগরদোলা, দোলার খাটলাগুলো বন্ কন্ শব্দে ঘুরে চলেছে উপর থেকে নীচে আবার নীচে থেকে

পরের দিকে। এক এক খাটলায় দু'জন ক'রে লোক, পরমানন্দে  
 গয়া ঘুরপাক খাচ্ছে নাগরদোলায় চড়ে। ছালালীর হঠাৎ চোখে  
 পড়লো একটা খাটলার মোহন মাঝি দিব্যি আরামসে গ্যাট হয়ে বসে  
 আছে খাটলা ঠেস দিয়ে, সামনে তার একেবারে মুখোমুখি বসে সুন্দরা  
 বাউরীন। নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে হাসির চোটে যেন কেটে  
 পড়ছে সুন্দরা, ডাঙালিয়া স্বরে সে গান ধরেছে মোহনের একদম  
 কালের কাছে বসে। মোহন মাঝি সুন্দরার মুখের দিকে চেয়ে  
 নাড়াশি বাজাচ্ছে তার গানের স্বরে স্বর মিলিয়ে। ছালালী থমকে  
 একেবারে দাঁড়িয়ে গেল নাগরদোলার সামনে, তার বুকের ভিতরটায়  
 মন মোচড় দিয়ে কে টানছে। মোহন তাহলে মেলা দেখে ফিরে  
 গরনি, সুন্দরাকে নিয়ে এখনো মশগুল হয়ে আছে এই মেলার মধ্যেই।  
 কিন্তু সুন্দরার ওই শাড়ীখানা, ও শাড়ী যে ছালালীর জন্য কিনে  
 মনেছিলো মোহন। ছালালীর চোখ দুটো যেন ঝলসে যেতে লাগলো,  
 সুন্দরাকে দেখেই বিষিয়ে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। রঙিন ওই শাড়ীখানা  
 পেরে মোহনের সঙ্গে মেলা দেখতে আসবার কথা আজ ছালালীর,  
 সুন্দরা তার সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু সে নিয়ে আর আক্ষেপ  
 করা বুঝা, সুন্দরা বাউরীন মোহনকে একেবারে যাহ্ন ক'রে ফেলেছে।  
 হলে বুড়ীর কথাগুলো কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল আজ, একবর্ণ সে  
 মিথ্যে বলেনি; মটুকধারী সিংএর সঙ্গে ঝগড়াঝাট ক'রে কাল রাত্তির  
 থেকেই মেলায় এসে আড্ডা গেড়েছে ওরা। ছালালীর কথা হয়ত  
 একেবারে ভুলে গেছে মোহন। কিন্তু চোখের সামনে এ দৃশ্য যে  
 আর সহিতে পারছে না ছালালী, সুন্দরার সঙ্গে নাগরদোলায় চড়ে  
 এইভাবে যে মেলা ময়দানে ফুটি ক'রে বেড়াবে মোহন, ছালালীর পক্ষে  
 এ অসম্ভব। নাগরদোলা বন্ বন্ শব্দে ঘুরে চলেছে, ছালালী হঠাৎ

খাটলাগুলোর দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলো,—  
মোহন !

কোনদিকে ভ্রক্ষেপ নাই মোহনের। ছালালীর সঙ্গে হ  
চোখোচোখি হয়ে গেল স্তম্ভরার; নাগরদোলার উপর থেকেই  
হো ক'রে হেসে উঠলো স্তম্ভরা ছালালীকে দেখে। ক্ষোভে দু  
অপমানে ছালালীর সর্বাস্ব যেন রি রি ক'রে উঠলো। নাগরদোলার  
অধিকারী দোলা খামিরে দিয়ে একে একে লোকগুলোকে না  
দিতে লাগলো, আরও কতকগুলো নতুন লোক ঠেলাঠেলি ক'  
উঠে বসলো দোলার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়ে গে  
নাগরদোলার উঠা নামা, খাটলাগুলো বন্ বন্ শব্দে ঘুরতে লাগে  
নবাগত যাত্রীদের নিয়ে।

নাগরদোলা থেকে নীচে নেমে স্তম্ভরা কয়েক পা এগিয়ে যেতে  
মোহনও তার পিছু ধরলে। মোহনের ঘন ঘন পা টলছে, নেশা  
তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। স্তম্ভরা হঠাৎ মোহনের দি  
চেয়ে বলে উঠলো,—তোর বোঁ যে তোকে লিতে এসেছে, বোঁ  
আঁচল ধরে নাচতে নাচতে এবার ঘরে যাবি না ?

মোহন নেশার ঘোরে টানা স্তম্ভরাকে বলে যেতে লাগলো,—বোঁ-  
আমার আবার বোঁ কুখা গেলি ! তুই শালীকে শাড়ী পরালুম—  
খাওয়ালুম—এক গেঁজে টাকা দিলুম মেলা দেখতে,—ইসময় আবার  
বোঁ কুখা খুঁজে বেড়াব।

স্তম্ভরা মুখ বেকিয়ে বলে উঠলো,—আ মরণ !

মোহন টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভরার শাড়ীর আঁচলাটা হঠাৎ  
চেপে ধরলে, বললে,—ইদিকে আয়—মাইরি বলছি ইদিকে আয়—  
ভীল চাস ত ইদিকে আয় বলছি।

সুন্দরা টান মেয়ে শাড়ীর আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে মোহনের হাত থেকে। মোহন একটু কুখে উঠলো, দুলালী গিয়ে পিছন দিক থেকে গাড়াতাড়ি ধরে ফেললে মোহনকে। মোহন হঠাৎ পিছন ফিরে বলে উঠলো,—কে ?

দুলালীকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলো মোহন, বললে,—তুই—তুই আবার কিসকে এলি ই-সময়ে ?

দুলালী বসলে,—ঘরে ফিরে যাবি চল, তোকেই আমি খুঁজতে এসেছি।

মোহন মাঝি নেশার ঘোরে চোখ তেড়ে বলে উঠলো,—ঘর—কার ঘর ? ঘর না আর কিছু, যা—যা—চলে যা তুই এখান থেকে।

মোহন একটা ঝাঁকানি দিয়ে দুলালীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে, তারপর সে টলতে টলতে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে সুন্দরা হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে সরে পড়েছে। সুন্দরাকে দেখতে না পেয়ে মোহন আবার বেতালা স্বরে হাক দিতে আরম্ভ করলে,—সুন্দরা—সুন্দরা !

দুলালী গিয়ে আবার ধরে ফেললে মোহনকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মেলা থেকে যেমন ক'রে হোক মোহনকে বের ক'রে নিয়ে যেতে হবে ; দুলালী একটু মিনতির স্বরে বললে,—আর মাতলামি করিস না মোহন, চল এবার ঘরে ফিরে চল।

মোহনের হঠাৎ চোখে পড়লো সুকুরমনি দুলালীর কোল থেকে মোহনের দিকে হাত বাড়চ্ছে আর খিল খিল ক'রে হাসছে নিজের মনেই। মোহন স্থিরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো মেয়েটার দিকে, তারপর সে একটুখানি হেসে বললে,—আর একবার হাস ত বিটি, লেডু দিব হাস,—হিহিহিহি—।

মোহনের হাসি দেখে স্কুরমনিও হিহি ক'রে হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে মোহনও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো ছালালীর গায়ে। মোহনের পা টলছে, হাত ধরে তার টানতে টানতে ছালালী বললে,— চল আর দেরি করিস না, বেলা যে গেল—ঘরে ফিরবি কখন !

মোহন আবার পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললে,—না, স্কন্দরাকে না নিয়ে আমি ফিরবো না কিছুতেই, যা—যা—এখন বিরক্ত করিস না।

এই বলে মোহন মেলার মধ্যেই ধপ্ ক'রে বসে পড়লো এক জায়গায়। নিজের মনেই সে নেশার ঝোঁকে বলে যেতে লাগলো,—স্কন্দরা, স্কন্দরা, নাইরি বলছি ফিরে আয় ; পেটভরে মদ খাওয়াব—ফিরে আয়। মটুকধারী করবে আমাদের কচু, জানাট রেখে মেরে কেলবো না শালাকে !

ছালালী আবার ডাক দিলে,—মোহন !

মোহন বলেই যেতে লাগলো,—শালা আবার স্কন্দরাকে বলে—আর যদি তোর মুখ দেখি ত আমি ছত্তি থেকে পারিজ। আরে ছি ছি ছি ছি—তুই শালা আবার ছত্তি হলি কবে থেকে ! স্কন্দরা—স্কন্দরা !

\* ছালালী ভয়ানক বিরক্ত হয়ে পড়লো, মোহন যে রকম মাতলামি স্কুর করেচে তাতে পাথরডি পর্যন্ত ধরে নিয়ে যাওয়া ভয়ানক মুশ্কিল হবে। ছালালী এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, চেনা শোনা যদি কারো সাহায্য পাওয়া যায়, মোহনকে একলা এ অবস্থায় বাড়ী নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ছালালী এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখে পড়লো কে একটা লোক,—মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে বসে কে ও লোকটা ? ছালালী হঠাৎ চমকে উঠলো, ও যে রাবণ মাঝি, ছালালীর বাবা ! রাবণ মাঝির পাশে বসে জনচারেক তার দেশের লোক, একসঙ্গে বসে পাতার

চোড়ায় ক'রে সব মুড়ি খাচ্ছে। কি সৰ্কানাশ, ছলালীর সন্ধানেই হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা; হঠাৎ আজ এই মেলার মধ্যে ধরা পড়ে যাবে নাকি ছলালী? না—না—ধরা দেওয়া হবে না, যেমন ক'রে হোক পালাতে হবে। কিন্তু রাবণ মাঝির মুখখানা ভয়ানক শুকনো দেখাচ্ছে, আর যেন সে চেহারা নাই; পাজরের হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, চুলগুলো বেবাক পেকে উঠেছে রাবণ মাঝির, একেবারে পেকে উঠেছে। ছলালী দূর থেকে রাবণ মাঝির অবস্থা দেখে হু হু ক'রে কঁদে ফেললে। পরক্ষণেই আবার সে সজাগ হয়ে উঠলো, ওদের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না, মেলা থেকে পালাতে হবে। মোহন নেশার কোঁকে সেই ভাবেই চীৎকার ক'রে যাচ্ছে এখনো,—সুন্দরা—সুন্দরা!

ছলালী মোহনের হাত ধরে টান দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ধাঁড় করিয়ে দিলে, কানে কানে তার চাপা গলায় বলে উঠলো ছলালী,— সুন্দরা যে তোকে একলা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে, ওই দেখ সামনের দিকে—পারিস ত ওকে ধর এই বেলা।

মোহন হঠাৎ চকিতের মত বলে উঠলো,—কৈ—কৈ—কোন দিকে?

ছলালী বললে,—ঐ যে—আয় আমার সঙ্গে।

মেলা থেকে বেরিয়ে ছলালী সোজা একেবারে পাথরভির পথ ধরলে। মোহনের হাত ধরে টানতে টানতে বহু কষ্টে সে ঘাইল দুয়েক পথ হেঁটে উঠলো গিয়ে পাথরভির সড়পে। এতক্ষণে ছলালীর ধড়ে বেন প্রাণ এলো। রাবণ মাঝিকে ওরা অনেক দূরে ছেড়ে এসেছে, আর কোন ভয় নাই। পথ কিন্তু এখনো অনেকখানা। মোহন আবার মাতলামি শুরু করলে, ছলালীর ধাক্কা ভুলে একটি পাও সে আর এগুতে রাজি নয়, সুন্দরাকে তার চাই। সড়পের উপর আবার ধপ্ ক'রে বসে পড়লো মোহন।



স্বর্ঘ্য তখন একেবারে ডুবে গেছে, দুলালী বহু সাধা সাধনা করে  
মোহনকে আর কোন মতেই ওঠাতে পারছে না। রাস্তায় মেলাফেরত  
যাত্রীদের ভিড় লেগে গেছে, মোহন তাদের লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে  
চীৎকার করে উঠছে,—হুন্দরা,—হুন্দরা !

দুলালী চুপি চুপি মোহনকে জানালে রাবণ মাঝি তাদের খোঁজে  
বেরিয়েছে, ঝরিয়ার মেলা পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে সে সঙ্গে কয়েক জন  
লোক নিয়ে। রাস্তার মাঝখানে ধরা পড়ে গেলে ভয়ানক বিপদ,  
দুলালী সে কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিলে মোহনকে। মোহন কিন্তু  
ইন্তক মাতাল হয়েই আছে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে তার মাথাটা গেছে  
একেবারে বিগড়ে। রাবণ মাঝির নাম শুনে হঠাৎ যেন সে একটু  
প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো, বললে,—চল—চল তবে—সোজা একেবারে উঠবো  
গিয়ে পাথরভির খাদে।

দুলালীর কোলে স্কুরমনি ঘুমিয়ে পড়েছে। মোহনের হাত ধরে  
সড়পের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে দুলালী।  
মোহনের কিন্তু নেশা ছুটেনি, হুন্দরার কথা কোনরকমেই সে ভুলতে  
পারছে না। হুন্দরার নাম করে মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকে  
যাচ্ছে \*মোহন। রাস্তায় ভয়ানক লোকজনের ভিড়, যানবাহনেরও  
চলাচল কিছু বেশি, দুলালী খুব সাবধানে মোহনের হাত ধরে এগিয়ে  
যেতে লাগলো। টলতে টলতে রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে  
মোহন, হঠাৎ একটা একাগাডী ঘর ঘর শব্দে এগিয়ে এসে মোহনের  
ঠিক পিছনে দাঁড়ালো; জোরগলায় হেঁকে উঠলো কেঁচোয়ান,—এই  
বেটা মাতাল, হঠাৎ হিঁরাসে।

মোহন হঠাৎ রূপে উঠলো পিছন ফিরে, বললে,—কোন্ শালা  
মাতাল বলে, কারো বাবার পয়সায় মদ খেয়েছি নাকি।

মোহন লোকের সঙ্গে বচসা ক'রে কোন লাভ নাই দেখে কোচোয়ান  
একটু পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। মোহনের হাত ধরে  
রাস্তার ধার দিকে তাকে টানছে দুলালী; মোহন কিন্তু কোনমতেই পথ  
ছাড়বে না, নেশায় সে একেবারে বৃন্দ হয়ে আছে। একাগাড়ীর উপর  
থেকে কে একটা লোক হঠাৎ জোর গলায় হেঁকে উঠলো,—নারো  
শালাকে—লাগাও চাবুক, মাতলামি করবার আর জায়গা পাওনি  
শালা!

মোহন হঠাৎ চেয়ে দেখে সুন্দরা আর মটুকধারী সিং পরস্পরের  
গায়ে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসে আছে একাগাড়ীর উপর। সুন্দরা  
মটুকধারীর কাঁধের উপর ডানহাতটা এলিয়ে দিয়ে গাড়ীর উপর বসে  
বসে দিবি আরাবসে বাঁ-হাত দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। মোহনের  
নাথায় যেন খুন চেপে গেল, জোর গলায় সে হেঁকে উঠলো,—সুন্দরা  
—সুন্দরা—ইধার আও শালী।

কোচোয়ান মোহনকে পাশ কাটিয়ে গাড়ীটা খানিক এগিয়ে নিয়ে  
গিয়ে ফেলেছে। মোহন হঠাৎ দুলালীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে  
ঘোড়ার লাগামটাকে শক্ত ক'রে টেনে ধরে জোর গলায় বলে উঠলো,—  
রোখো—রোখো গাড়ী, খবরদার।

গাড়ীর উপর থেকে গর্জ্জ উঠলো মটুকধারী সিং,—মার ভালো—মার  
ভালো শালাকো।

কোচোয়ান মোহনের হাত থেকে টান মেরে ছাড়িয়ে নিলে ঘোড়ার  
লাগামটা। টলতে টলতে সুন্দরার দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুন্দরার  
শাড়ীর আঁচলটা চেপে ধরলে মোহন, বললে,—কোন বাপের টাকায় শাড়ী  
পরে মেলা দেখতে গিয়েছিলি হারামজাদী। ভাল চাস ত নেমে আয়—  
নেমে আয় বলছি গাড়ী থেকে।

মটুকধারী সিং কোচয়ানের হাত থেকে চাবুকটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো,—তবে রে শালা মাতাল, মাতলামি তোর ঝেড়ে দিচ্ছি থাম্‌ ।

মোহনকে লক্ষ্য করে মটুকধারী চাবুকটা যেই উচিয়ে ধরেছে দুলালী গিয়ে অমনি তাড়াতাড়ি মটুকধারীর সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো,—খবরদার, গায়ে যদি ওর হাত দিয়েছিল—কানড়ে তোর গলাটা এখনি ছিঁড়ে ফেলবো ।

সুন্দরা মোহনের হাত থেকে শাড়ীর আঁচলটা টানতে টানতে বললে,—ছাড় খালভরা ছাড়, কৌটয়ে এখনি বিষ ঝেড়ে দিব না !

দুলালী গিয়ে মোহনের হাত ধরে তাকে সুন্দরার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো । মোহন হঠাৎ সুন্দরার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বললে,—নেমে আর শালী—নেমে আর ।

সুন্দরা হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—তবে রে আঁটকুড়ো, তোর মাতলামির নিকুচি করেছে ; ভাগ্‌ হারামজাদা—ভাগ্‌ ।

এই বলে সুন্দরা গাড়ীর উপর থেকে মোহনের বুক ঝেড়ে দিলে জোরসে একটা লাথি, পিছন দিকে ছিটকে পড়লো মোহন রাস্তার একপাশে । মটুকধারী বলে উঠলো,—ইঁকোও গাড়ী—জোরসে ।

সুন্দরা আর মটুকধারীকে নিয়ে একাগাড়ী আবার ছুটে চললো পাথরভির পাকা সড়প ধরে ।

রাস্তার উপর একেবারে গড়িয়ে পড়েছে মোহন, মাথার পিছন দিকটায় বেশ খানিকটা চোট লেগেছে । দুলালী বহুকণ্ঠে টেনে তুললে মোহনকে, মোহনের অবস্থা দেখে তার কান্না পাচ্ছে ; কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই, দুলালী শুধু জুঁপিয়ে একবার কঁদে উঠলো মোহনের দিকে চেয়ে । সুন্দরা আর মটুকধারী দূর থেকে হো হো করে একবার হেসে

উঠলো, একাগাড়ীর শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। মোহন ধীরে ধীরে  
তুলালীর গায়ে হাত রেখে বললে,—কাদছিস ?

তুলালী বললে,—ঘর চল, রাত হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করলে মোহন, এখনো তার একটু একটু  
পা টলছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ধপ্ ক'রে আবার বসে পড়লো  
মোহন, দেহে তার এতটুকু শক্তি নাই, রাস্তার ধারে বসে হঠাৎ সে বমি  
করতে আরম্ভ করলে ; তুলালীর দিকে চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো  
মোহন,—একটু জল।

এখানে কিন্তু জল পাবার কোন উপায় নাই, আঁচল দিয়ে মোহনের  
মুখটা শুষ্ক মুছিয়ে দিলে তুলালী। ধীরে ধীরে আবার উঠে দাঁড়ালো  
মোহন, তুলালীর গলাটা সে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁধে তার ভর  
দিয়ে বললে,—চল, দেখি যদি কোর্নি রকমে হাঁটতে পারি।

মোহনের পক্ষে এ অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কিন্তু সম্ভব নয়।  
তুলালী বেশ শব্দ করে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মোহনকে,  
পাথরভির পথ ধরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্ধকারে  
চারিদিক কাপসা হয়ে গেছে, লোক জনের রহট অনেকটা কমে এসেছে।  
কিছু দূর গিয়েই মোহন আবার বসে পড়লো, বললে,—পা গুলো আমার  
কাঁপছে।

তুলালী বললে,—থাম্, দেখি।

পাথরভি থেকে একখানা রিক্সা গাড়ী ঠন্ ঠন্ শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে  
বারিয়ার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। খালি গাড়ী দেখে রিক্সার সাননে  
গিয়ে দাঁড়ালো তুলালী, বললে,—এই থাম্, পাথরভি ভাড়া বাবি ?

রিক্সাওয়ালা জবাব দিলে,—বারো আনা পয়সা লাগবে।

তুলালী বললে,—তাই দিব, চল।

মোহন আর ছলালীকে গাড়ীর উপর তুলে নিয়ে রিক্সাওয়ালা  
আবার পাথরভির পথ ধরে টুং টুং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চললো।  
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছলালীর কোলে মাথা রেখে রিক্সার উপর  
ঘুমিয়ে পড়লো মোহন। রাত তখন প্রায় প্রহর খানেকের কাছাকাছি।

## আট

পাথরভি কলিয়ারির ধাওড়া। মোহনের কাজকর্ম আবার যথারীতি  
সুরু হয়ে গেছে। সন্মরা বাউরীনের সঙ্গে মেলা মেশা করাটা বেশ  
ভাল হয়নি, মেলা থেকে ফিরে আসবার পর মোহন সে কথা হাড়ে  
হাড়ে বুঝতে পেরেছে। ছলালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছে  
মোহন, ছলালীর গা ছুঁলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে—জীবনে কখনো ও পথে  
আর পা বাড়াবে না ; ও সব দুশ্চরিত্রা বজ্জাত মেয়ের পাল্লায় যারা পড়ে  
তাদের মত বেকুব আর দু'টি নাই। সন্মরার খবরে গড়ে রীতিমত  
শিক্ষা হয়ে গেছে মোহনের, ছলালীকে মোহন কথা দিয়েছে আবার সে  
ভাল হয়ে উঠবে। তুল সে একটা সত্যিই ক'রে ফেলেছে, ভয়ানক  
মারাত্মক তুল ; বাউরীর মেয়ের সঙ্গে মদের ভাঁড়ে একসঙ্গে চুমুক দিয়েছে  
মোহন, সন্মরার হাতের রান্না পর্যন্ত সে মদের সঙ্গে চাট ক'রে খেয়েছে।  
কি ভয়ানক কথা, সন্মরাকে নিয়ে ক'দিন ধরে কি কেলেকারিটাই না  
করলে মোহন। হয়ত এ একরকম ভালই হয়েছে, এমন ধারা একটা ঘা  
না খেলে মোহন হয়ত ক্রমশঃ আরও নীচের দিকেই নেমে যেতো।

ছলালীর গনটা আজ ক'দিন থেকে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মেলা  
থেকে ফিরে আসার পর মাঝে মাঝে কেবলই তার মনে পড়ছে দেশের

কথা, মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের কথা, গিছনে ফেলে আসা তার সারা জীবনের কথা। বিশেষ ক'রে মাকে তার আজ মনে পড়ছে, বুড়ো বাপের কথা স্মরণ ক'রে চোখ ফেটে আজ জল আসছে দুলালীর। ঝরঝর মেলায় সেদিন রাবণ মাঝির অবস্থা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে, ভীমের মত চেহারা শুকিয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। সেই দিনই মনে হয়েছিলো দুলালীর ছুটে গিয়ে একবার রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ায়, রাবণের বৃকে কাঁপিয়ে পড়ে বৃকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে থানিক কৈদে আসে। কিন্তু উপায় নাই, সমাজের চোখে দুলালী যে আজ অপরাধী, আর রাবণ মাঝি সেই সমাজের একজন মাতব্বর। এতকাল পরে আজ যদি রাবণ মাঝি তার স্নেহের দাবি নিয়ে দুলালীকে শুধু চোখের দেখা দেখতে আসতো, দুলালী আজ পরম আগ্রহে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতো তার সামনে, দু'দিন তাকে নিজের কাছে রেখে বুড়ো বাপের একটু সেবা যত্ন ক'রে দুলালী আজ ধন্ত হয়ে যেতো। কিন্তু সমাজের চোখে দুলালী যে অপরাধী, তাই রাবণ মাঝি ক্ষমা তাকে করতে পারেনি আজো; ক্ষমা যদি করতো তাহলে সে দল বেঁধে এমন ভাবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো না দুলালীর খোঁজে। ভালুকপোতার লোক পর্য্যন্ত সন্ধে এসেছে রাবণ মাঝির, এর মধ্যে যে তাদের একটা কোন মতলব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। টুয়াই মাঝি সোজা লোক নয়, তারই ইঙ্গিত হয়ত আজ রাবণ মাঝিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হয়ত ওরা জোট পাکیয়ে দুলালীকে ধরে নিয়ে যেতেই এসেছে; হয়ত কেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ধরা ওদের হাতে দেওয়া চলবে না স্বেচ্ছা মতেই। নিজের জন্ত খুব বেশি ভাবে না দুলালী, কিন্তু দুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে মোহনের যে দাঁড়াবার আর ঠাই নাই। সমাজ যদি কোনদিন দুলালীকে ক্ষমাও করে কোন গতিকে, মোহনকে ওরা কোন মতেই

কমা করবে না; ছলালীর এ দৃঢ় বিশ্বাস। কি হবে আর সে সর্গজে  
কিরে গিরে, দুর্ভোগ তাতে বাড়বে বই কমবে না। স্থখে হোক দুঃখে  
হোক মোহনের ভিটে আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে ছলালীকে, এ ছাড়া  
যে আর পথ নাই।

মোহনের জন্ত অনেক কিছু সহ্য করেছে ছলালী, সব কিছু সহ্য  
করতেও সে রাজি, কিন্তু মোহনের এতটুকু অবহেলা তার পক্ষে  
অসহ্য। তাই ঝরঝর মেলা থেকে ফিরে আসবার পর তিনদিন  
কথা কয়নি ছলালী মোহনের সঙ্গে, ছলালীর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনেক  
সাধাসাধি করে ছলালীর সঙ্গে আবার ভাব করতে হয়েছে মোহনকে।  
ছলালীকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই আবার সয়ে নিতে হয়েছে ;  
মোহনকে ছেড়ে যাবার যে তার উপায় নাই। সে চেষ্টাও ত একবার  
করেছিলো ছলালী, রথ-পরবের দিন ভোর বেলা উঠে মোট পোটলা  
বেঁধে পাথরডি থেকে চুপি চুপি সরে পড়বার সে চেষ্টা করেছিলো,  
কিন্তু মোহনের এই ধাত্রার মায়া সে কাটাতে পারলে কই। এ মায়া  
যে সারা জীবনের মায়া, এ বাঁধন কি কোন দিন আর খুলতে পারবে  
ছলালী? তাই সেদিন রথের মেলায় রাবণ মাঝিকে দেখে ছলালী  
যেন আঁতকে উঠেছিলো, লোকে যেমন চোখের সামনে বাঘ ভালুক  
দেখে আঁতকে উঠে ভয়ে। আজ ক'দিন থেকেই ছলালী ভাড়া  
দিচ্ছে মোহনকে পাথরডি থেকে তাদের পালাতে হবে, মোহনও  
আজ ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছে। রাবণ মাঝি শেষ পর্যন্ত  
যদি পাথরডি পর্যন্ত এসেই পড়ে। মোহনের উপর ততটা হয়ত  
জুলুম খাটবে না তার, কিন্তু ছলালী যে রাবণ মাঝির মেয়ে, ছলালীকে  
হয়ত সে ধরে নিয়ে যাবে। মোহন তাই ঠিক করেছে পাথরডি  
থেকে এককর সরতেই হবে, চলে যাবে আরও খানিক পশ্চিমে,

হাজারিবাগ অঞ্চলে। সেখানকার এক আড়কাঠির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে মোহনের, অল্পের খনিতে গিয়ে কাজ করবে মোহন, এর চেয়ে ঢের ভাল কাজ। এখানকার ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছু পাওনা হয়েছে মোহনের, এই হস্তার টাকাগুলো আদার ক'রে নিয়ে চুপি চুপি সে সরে পড়বে। দুলালীকে তিন বেলা ভরসা দিচ্ছে মোহন, পুরোপুরি আড়াইটা বছর এইভাবেই যখন কেটে গেল তাদের, তখন আর ছ'চারটে দিনের জন্ত বিশেষ কিছু এসে যায় না; এর মধ্যে ধরা তারা পড়বে না নিশ্চয়ই, মোহনের মনে ভরসা আছে যথেষ্ট। দুলালী কিন্তু মোট পোটলা বেঁধে পশ্চিমে রওনা হবার জন্ত তৈরি হয়ে আছে, এ ক'টা দিন ভালোয় ভালোয় কোন রকমে কেটে গেলে হয়।

হস্তার দিন সকালবেলা গাঁইতি ঘাড়ে ফেলে কাজে বেরুচ্ছে মোহন। দুলালী গিয়ে পিছন দিক থেকে গাঁইতিটা তার চেপে ধরলে। মোহন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, ধাওড়ার দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে দুলালী একটু চাপাগলায় বললে,—ধাওড়া থেকে বেরুস না এখন—থান।

দুলালীর মুখের ভাব দেখে মোহন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। দুলালীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, হাত পা গুলো ওর ছুর ছুর ক'রে কাপছে। মোহনের হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দুলালী, বার দিকে হাত বাড়িয়ে চুপি চুপি সে ইসারা ক'রে দেখিয়ে দিলে ধাওড়ার পিছন দিকে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ গাছের নীচে কাঁধের উপর একটা চাদর ফেলে ছোট একটা লাঠি হাতে চুপচাপ বসে আছে রাবণ মাঝি। সঙ্গে তার লোক জন কেউ নাই—রাবণ মাঝি একা, গাছতলায় বসে বসে গম্ভীর ভাবে শাল পাতার



একটা চুটি টানছে রাবণ। দুলালী মোহনের দিকে চেয়ে বলে উঠলো,  
—কারো কাছে হয়ত সন্ধান পেয়েছে।

মোহন একটু গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে,—সম্ভব।

ধীরে ধীরে একটা খাটিয়ার উপর সেইখানেই বসে পড়লো মোহন।  
দুলালী একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠলো,—তা হলে ?

মোহন কোন জবাব দিলে না। স্বকুরমনি ঘুম থেকে উঠে কানতে  
স্বক করেছে, দুলালী গিয়ে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলে মেয়েটাকে।  
খাটিয়ার উপর বসে বসে ভাবতে লাগলো মোহন, এমন ভাবে কত  
দিন চলে! রাবণ মাঝি তাদের ক্রমাগত তাড়া ক'রে চলেছে এক  
জায়গা থেকে অপর জায়গা—ঠিক যেন শিকারী কুকুরের মত। কি  
তাদের অপরাধ? অপরাধ তারা এমন কিছু করেনি। ধরতে গেলে  
অপরাধী তারা—অন্টার একটা গোঁ ধরে অসম্মত একটা প্রস্তাবকে  
সমর্থন ক'রে মোহন আর দুলালীকে যারা দেশ ছাড়া করেছে; রাবণ  
মাঝিই প্রধাণতঃ এর জন্ত দায়ী। মোহনের মন বলছে অপরাধ সে  
করেনি, অপরাধ যদি কেউ ক'রে থাকে সে তাদের একরোখা সাঁওতালী  
সমাজ। সত্যি কি পারে আজ রাবণ মাঝি মোহনের বুক থেকে  
দুলালীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে? হতে পারে দুলালী তার মেয়ে,  
কিন্তু মোহনের সঙ্গেও তার সম্বন্ধটা আজ খাটো নয় কোন দিক  
থেকেই। ধর্মসাক্ষী ক'রে ওরা মালা বদল করেছে, ধর্মিন তারা  
দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে সমাজের ভয়ে। সাক্ষী আছে নির্জন পথ,  
সাক্ষী আছে আকাশের এক ফালি চাঁদ, সাক্ষী আছে শাল আর পিয়াল  
বনে ঘেরা কুকরীধির পাহাড়। পাহাড়ের নীচে 'শালুই বংহার' নামে  
শপথ ক'রে দুলালীকে গ্রহণ করেছে মোহন, মোহনকেও সে দেবতার  
নামে মেনে নিয়েছে। সমাজ হয়ত এ বিয়ে তাদের স্বীকার করবে

পরশ্য-কুহেলী

না, কিন্তু মোহন আর হুলালীর চোখে মূল্য এর এতটুকু কম নয়। তবে তারা এমনধারা অত্যাচার চোখ বুজে সহ্য করবে কেন? না—না—রাবণ মাঝির এ জুলুম, এ জুলুম আর কোনমতেই সহ্যবে না মোহন। যে-শয়তান মোহনের সংসারে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য কুগ্রহের মত তার আশে পাশে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আর কোনমতেই ক্ষমা করবে না মোহন মাঝি। রাবণ মাঝিকে এর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, সে ব্যবস্থা করবে মোহন যেমন ক’রে হোক। এমন একটা শিক্ষা তাকে দিয়ে দিতে হবে যেন জীবনে সে কখনো আর মোহন মাঝির পিছু না লাগে। কোম্পানীর অফিসে গিয়ে খবর একটা দিয়ে দেবে নাকি মোহন, রাবণ মাঝি কোম্পানীর কলিকামিন ভাঙ্গিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্য মিথ্যায় কিছু এসে যায় না, রাবণ মাঝিকে জব্দ করা দরকার। কোম্পানীর আড়কাঠি সে বড় ভয়ানক লোক, তার কানে একটু ফেলে দিলেই রাবণ মাঝি কুঠি ছেড়ে পালাবার আর পথ পাবে না। সেই ব্যবস্থাই ভাল, মোহনকে আজ এই রকমেরি একটা কিছু করতে হবে, শয়তানের সঙ্গে শয়তানিই দরকার।

ভাবতে ভাবতে ধাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়লো মোহন, হুলালী আবার পিছন থেকে ডাক দিলে, বললে,—চললি কুখা?

মোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—এফুনি ফিরে অ’সছি।

এই বলে ধাওড়ার দোর খুলে দক্ষিণ দিকের গলি পথ ধরে হন হন ক’রে এগিয়ে চললো মোহন কোম্পানীর অফিস দিকে মুখ করে। হুলালী ধাওড়ার দরজাটা ঠেসিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালো সেই জানলার সামনে। রাবণ মাঝি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে শিরীষ গাছের নীচে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রাবণ মাঝি, তাক

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে এই কুলি-বস্তির আশে পাশে।  
 সত্যই কি রাবণ মাঝি ছালালীকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে, কিন্তু  
 তার সঙ্গে লোকগুলো গেল কোথায়! বরিয়্যার মেলায় সেদিন  
 রাবণ মাঝিকে দেখে যতখানা ভয় পেয়েছিলেন ছালালী—আজ ত কই  
 ঠিক তেমনধারা মনে হচ্ছে না। এমনও ত হতে পারে যে ছালালীর  
 সঙ্গে শুধু দেখা করবার জগাই রাবণ মাঝি তার খোঁজ ক’রে বেড়াচ্ছে,  
 হয়ত ছালালীর মা কৈদেকেটে জোর ক’রে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে,  
 ছালালী ছাড়া আপনার বলতে আর যে তাদের কেউ নাই। কিন্তু  
 ছালালী কি পারবে আজ রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে? না—  
 না—সে আর হয় না, রাবণ মাঝির সঙ্গে আজ আর কোন সম্পর্ক  
 বজায় রাখা সম্ভব নয় ছালালীর পক্ষে, দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ সে একেবারে  
 চুকিয়ে দিয়ে এসেছে।

দূর থেকে রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে চেয়ে ছালালীর চোখ দিয়ে শুধু  
 জল ঝরতে লাগলো, এর বেশি তার করবার যে কিছু নাই। আঁচল  
 দিয়ে চোখের জল মুছে জানলাটা আবার ধীরে ধীরে বন্ধ ক’রে দিলে  
 ছালালী। স্বকুরমনি ছালালীর মুখের দিকে চেয়ে নিজের মনেই খিল্ খিল্  
 ক’রে হাসছে, কচি দাঁতের মন ভুলানো সে কি তার মিষ্টি হাসি!  
 ছালালী হ’হাত দিয়ে মেয়েটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পাল ছুটো  
 তার চুমায় চুমায় ভরে দিলে। চোখ দুটো আবার ছল্ ছল্ ক’রে উঠলো  
 ছালালীর; রাবণ মাঝি নিজের চোখে দেখলে না একবার মেয়েটাকে।  
 এত কাছে এসেও স্বকুরমনিকে একবার না দেখেই সে ফিরে যাবে!  
 ছালালীর সারা মন তোলপাড় করতে লাগলো। স্বকুরমনিকে কোলে  
 নিয়ে ছালালী গিয়ে দাঁড়াবে নাকি একবার রাবণ মাঝির সামনে?  
 কিন্তু মোহন যদি রাগ করে? এ সময় সে হঠাৎ আবার গেল কোথায়!

যাকগে সে যেখানে তার খুশি, চুলোয় যাকগে ; ছলানী যে এ সময়টা একলা আছে ধাওড়ার মধ্যে এই তার পক্ষে যথেষ্ট ।

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ছলানী, সর্বদা তার হ্র হ্র করছে, হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে ফিরে এসে দাঁড়াল সে জানলার কাছে ; বাইরে যেতে সাহস হচ্ছে না ছলানীর, কিছুতেই সাহস হচ্ছে না । ধীরে ধীরে জানলাটা সে আবার খুলে ফেললে, রাবণ মাঝি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে শিরীষ গাছের নীচে । মেয়েটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো ছলানী,—রাবণ মাঝি জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় যদি একটবার বাইরের দিকটায়, ক্ষতি কি ? চোখ ভরে সে দেখবে না এক নজর হুকুরমনিকে ! মোহন হয়ত এফুনি আবার এসে পড়বে, ছলানীর সঙ্গে রাবণ মাঝির হয়ত আর দেখাই হবে না ! না—না—তার আগেই রাবণ মাঝির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎটা একবার সেরে নিতে চায় ছলানী, কোন মতেই ছলানী যে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছে না । জানলাটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে ধাওড়ার মধ্যে থেকেই ছলানী হঠাৎ জোর গলায় ডেকে উঠলো,—বাবা—বাবাগো !

রাবণ মাঝি একটু সজাগ হয়ে উঠলো, কে যেন কাকে ডাকছে, কান খাড়া ক'রে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো রাবণ মাঝি ।

ছলানী আবার মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো,—এই যে এখানে আমি—আমি এখানে ।

কার যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর । রাবণ মাঝি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, ধাওড়ার দিকে চেয়ে চকিতের মত বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—কে ?

জন চার পাঁচ পশ্চিমা লোক কোথেকে হঠাৎ হন্ হন্ ক'রে ছুটে এসে চারদিক থেকে রাবণ মাঝিকে ঘিরে দাঁড়ালো ।

একটা লোক রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য করে কক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো,—  
এই বুড়ো, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিল ?

আর একজন বললে,—কুলিকামিন ভান্ডাবার আর জায়গা পাওনি  
বেটা, মেয়ে তোমার হাড় ভেঙ্গে ফেলবো।

রাবণ মাঝি এদের ভাবগতিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ছুলালী  
জানলার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছে, লোকগুলো সব বিলকুল কোম্পানীর  
নোকর, কিন্তু এমনদারা রাবণ মাঝিকে ওরা চড়াও করে এলো কেন  
হঠাৎ ? কোম্পানীর বড় চাপরাসী ঘটেশ্বর চোবে রাবণ মাঝির দিকে  
লাঠি উঠিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো,—নার ভালেগা শানাকো,  
হাড়ি তোড়কে আভি ছাতু বানা দেগা।

দূর থেকে চমকে উঠলো ছুলালী, রাবণ মাঝিকে এরা এমনদারা  
অপমান করে কেন ! লোকগুলোর আশ্পর্ক ত কম নয়।

ধাওড়ার দোবে শিকল টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে  
পড়লো ছুলালী। ধাওড়া থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো  
বাইরে, ধাওড়ার পশ্চিম দিকে একটা পোড়ো বাড়ীর দেওয়ালের আড়ে  
কে যেন একটা লোক নিঃশব্দে চোরের নত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছুলালী  
একটু এগিয়ে দেখে মোহন, দূর থেকে লোকগুলোকে সে ইসারা করছে।  
ছুলালী অবাক হয়ে গেল মোহনের এই কাণ্ড দেখে। কলিয়ারি থেকে  
কতকগুলো লোক জুটিয়ে এনে দূর থেকে রাবণ মাঝির দিকে লেলিয়ে  
দিচ্ছে মোহন। ছুলালীর মনটা হঠাৎ বিবিধে উঠলো, ধীরে ধীরে  
ওখান থেকে নিঃশব্দে সরে পড়লো ছুলালী, ধাওড়ার পূর্ব দ্বার দিয়ে  
বেরিয়ে উল্লসাসে সে ছুটতে আরম্ভ করলে। লোকগুলো তখন রাবণ  
মাঝিকে ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছে। রাবণ মাঝি তাদের বোঝাতে  
শুরু করেছে যে কুলিকামিন ভান্ডাতে সত্যিই সে আসেনি, এমনি হঠাৎ

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ছে ; কিন্তু শোনে কে তখন রাবণ মাঝির কথা ।  
গলায় তার গামছা জড়িয়ে ঘণ্টেশ্বর চোবে জোর করে টেনে ধরেছে  
রাবণ মাঝিকে । খাণ্ডার পাশ থেকে একটা থান ইট কুড়িয়ে নিয়ে  
তুলালী গিয়ে ছুটতে ছুটতে দাঁড়ালো হঠাৎ লোকগুলোর সামনে, কিন্তু  
কণ্ঠে বলে উঠলো তুলালী,—খবরদার, গায়ে যদি কেউ হাত দিস ওর—  
তার মাথাটা এই ইট দিয়ে আমি গুঁড়ো ক’রে দিব ।

রাবণ মাঝি চমকে উঠলো তুলালীকে দেখে, উদ্ভ্রান্তের মত হঠাৎ  
চীৎকার ক’রে উঠলো রাবণ মাঝি,—তুলালী—তুলালী !

তুলালী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাবণ মাঝির বুকে, ডুকরে সে কেঁদে  
উঠে বললে,—বাবা—বাবাগো !

লোকগুলো আবার হয়ে গেল, তুলালী মেঝেনকে তারা সকলেই  
চিনে । কে তাহলে এই বুড়ো লোকটা ?

রাবণ মাঝি ভাঙ্গা গলায় বললে,—তোকেই যে আমি খুঁজে  
বেড়াচ্ছি না, তোর পেগে যে ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়ে গেলুম ।  
তোকে যে আবার কিরে যেতে হবে না, যাবি আমার সঙ্গে ?

রাবণ মাঝির সামনে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ মোহন মাঝি । বিজ্ঞপের  
সুরে সে বলে উঠলো,—তোর সঙ্গে যাবে তার মানে ?

রাবণ মাঝির চোখ দুটো ঘেন দপ্ করে জলে উঠলো একবার ।  
তুলালী বললে,—যাব বাবা, আমি বাব ; আমাকে হুই সঙ্গে ক’রে  
নিয়ে চল, একুনি—এই পথেই ।

মোহন একটু আশ্চর্য হলো, আড়চোখে তাকালো একবার তুলালীর  
দিকে, ক্ষুদ্রকণ্ঠে বলে উঠলো মোহন,—তুলালী !

তুলালী হঠাৎ গর্জে উঠে বললে,—কলিয়ারি থেকে লোকজন  
জুটিয়ে এনে আমার চোখের সামনে আমার বুড়ো বাপকে

ভাবে অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

লোকগুলো ব্যাপার দেখে সরে পড়লো একে একে। রাবণ মাঝি ব্যগ্রভাবে বলে উঠলো,—সত্যিই যাবি ত মা, পারবি তুই যেতে আমার সঙ্গে ?

দুলালী বললে,— পথে আমি পা বাড়িয়েছি বাবা, এখানে আর এক লহমা থাকতে চাই না।

দুলালীর কথাগুলো শুনে গর্জ্জে আর একবার তাকালো মোহন দুলালীর দিকে। রাবণ মাঝি সামনের মেঠো পথটা দেখিয়ে দিয়ে বললে,—এই আমাদের পথ, চলে আয় মা—তাহলে আর দেরি করিস না।

দুলালী সঙ্গে সঙ্গে পা চালিয়ে দিলে।

সামনের সেই জড়ি পথটা ধরে ধীরে ধীরে উত্তর মুখে এগিয়ে চললো রাবণ মাঝি, দুলালী মেয়েটাকে বুকের উপর কেলে রাবণ মাঝির পিছু পিছু হেঁটে চললো। যাবার বেলা পিছন ফিরে তুলেও সে একবার তাকালো না আর মোহনের দিকে।

মোহনের সর্বাঙ্গ যেন গুর গুর করে কাঁপছে, দুলালীর দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো মোহন,—শয়তানী—শয়তানী !

শিরীষ গাছটার নীচে ধপ্ করে বসে পড়লো মোহন, দুলালী আজ সত্যিই তাকে ছেড়ে যেতে পারলে ! এ সে তার ধারণার বাইরে।

রাগে মোহনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরতে লাগলো, বেইমান—দুনিয়াটাই বেইমান। কিন্তু স্বকুমারিও যে চলে গেল আজ মোহনকে কেলে, একটা বেলা তাকে দেখতে না পেলে মোহন যে একেবারে ইপিয়ে উঠে। ওরা আজ চলে গেল, চলেই গেল, যাকগে—ভাবব তার আর থাকলো না কিছু, মোহন আজ নিশ্চিন্ত।

অরুণ-কুহেলী

মোহনের অজ্ঞাতে কয়েক ফোঁটা জল ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো তার দু'চোখ বেয়ে। ছি ছি—মোহন কাঁদছে, কার জন্তু কাঁদছে মোহন? জীবনে সে কোনদিন কারো জন্তে কখনো ত কাঁদেনি, তবে? চোখ দুটো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ধীরে ধীরে গাছতলা থেকে উঠে পড়লো মোহন, পাগলের মত টলতে টলতে এগিয়ে চললো সে ধাওড়ার দিকে। ধাওড়ার দরজাটা ভিতর দিক থেকে ঠেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে মোহন ঢুকে পড়লো। ছালার রঙিন শাড়ী খানা মেলা রয়েছে বারান্দার এক পাশে। মোহনের চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠলো, এটা কেন এখানে? শাড়ীখানা তুলে ঘরের মধ্যে একটা কাঠের বাস্কে ভরে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাস্কের ডালাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলে মোহন। বাস্কের পাশে ছালার মুখ দেখবার আয়নাটা এখনো তেমনি ভাবে ঠেসানো রয়েছে দেওয়ালের গায়ে, কাঠের একটা চিকনি, চুল ঝাঁপার কিতে, লোহার কয়েকটা কাঁটা,—কি সব এগুলো! কি আপদ, যাবার সময় ছালার এগুলো মনে করে নিয়ে গেল না কেন। কি হবে আর এগুলো বেহক এখানে জমিয়ে রেখে! ছালার কোন স্থিতি মোহন যে আর বরদাস্ত করতে পারছে না, কোনমতেই না। আয়নাটা দেবে নাকি মোহন আছাড় মেরে ভেঙ্গে! ছালার বলতে যা কিছু সব জ্বালা মোহন চুরমার ক'রে ফেলে দিয়ে আসবে পুকুরের জলে। কিন্তু ধাওড়ার চারিদিকেই যে তারই হাতের ছাপ, প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ছালার ছোঁয়াচ যে এখনো লেগে রয়েছে। মোহনকে পালাতে হবে, এখান থেকে একেবারেই পালাতে হবে। দোরের পাশে ওটা কি, মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একধারে? স্কুরমনির কাঠের পুতুলটা না? মোহনের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। এগুলো ওরা ফেলে রেখে গেল কেন। মোহনকে কি ওরা পাগল না ক'রে ছাড়বে না।

শ্রীকালীদাস দত্ত



কাঠের পুতুলটা মেঝের উপর থেকে তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মোহন, ওরা কি সত্যিই চলে গেল! কিন্তু পুতুলটা যে স্বকুবননির দরকার, এটা যে ওর খেলার সাথী। জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ চীৎকার করে জেকে উঠলো মোহন,—মনি—মনি—মক্‌মনি!

বার থেকে সাড়া দিলে না কেউ। সাড়া যারা দেবার তারা তখন মোহনের দৃষ্টি ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে পড়েছে। বেলা হয়ে গেছে অনেকপাশ, প্রচণ্ড রোদে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। জানলা খুলে সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোহন। দূরে একটা কলিয়ারির চিমনি থেকে অজস্র ধোঁয়া উঠছে। ঐ-ধোঁয়া সেই কালো ধোঁয়া বিরাট একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে স্বর্গকে ঝাড়ান ক'রে সমস্ত আকাশপাশ জুড়ে ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মোহনের চোখের সামনে ছুনিয়াটা বেন ঝাপসা হয়ে আসছে। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটয়ার উপর ধপ্ ক'রে অসাড় ভাবে বসে পড়লো মোহন।

## নয়

টুংরার মনে আবার নতুন ক'রে আশা জেগেছে, এবার হয়ত সে দুলালীকে পেতে পারবে। মোহন তাকে চুপি চুপি ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে গিয়ে চোরের মত রাতারাতি সরে পড়েছিলো, টুংরার সঙ্গে পালা দিয়ে কাঁড় চালাতে সে সাহস পায়নি। পঞ্চগেরামী লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নিশানা বিঁধে যাকে জয় ক'রে নেবার কথা, মোহন তাকে কাপুরুষের মত চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে ধিকৃত করেছে নিজের পৌরুষকে, কলুষিত করেছে তার সমাজ জীবনকে। মোহনের এ অপরাধ কোন মতেই সহ্য হবে না সাঁওতালী সমাজ, সাঁওতালী বিধিবিধানকে অবজ্ঞা ক'রে এমন ভাবে সমাজের শৃঙ্খলা যারা ভঙ্গ করেছে, শাস্তি তাদের পেতেই হবে। সমাজের নির্দেশ মত দুলালীকে তাই জোর ক'রে ধরে আনা হয়েছে। মোহন মাঝি আজ একঘরে, আবার যদি কোনদিন সে ফিরে আসে—সাঁওতালী সমাজ তাকে ঠাই দেবে না, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে শেয়াল কুকুরের মত, এই তার শাস্তি। এ শাস্তি কিন্তু বখেঁষ্ট বলে মনে হয় না টুংরার, দুলালীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যে শত্রুতা করেছে—মোহন টুংরা। সঙ্গে, শাস্তি তার আরও বেশি কঠোর হওয়া উচিত। সমাজ তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই করুক—টুংরা কিন্তু নিজের হাতে একটা কিছু না ক'রে কোন মতেই ক্ষান্ত হবে না। সামনা সামনি মোহনের সঙ্গে আবার যদি কখনো দেখা হয় টুংরার—টুংরা তাকে আস্ত রাখবে না; দুলালীকে সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে টুংরা মাঝির বুক থেকে। টুংরা যদি হেরে

যেতো ষাড়খেত্বেকের পরীক্ষা—টুংরার কিছু বলবার ছিলো না। মোহন মাঝি কিন্তু বেইমানি করছে, চরম দুঃখমণী ক'রে গেছে সে টুংরার সঙ্গে। কিন্তু মোহন মাঝিকে ত এরা ধরে আনতে পারলে না, রামপুর আর ভালুকপোতার সাঁওতালরা মিলে ছুলালীকে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে পাকড়াও ক'রে এনেছে। কিন্তু মোহন? মোহনকেও যে সেই সঙ্গে ধরে আনা উচিত ছিলো। শাস্তি যদি দিতে হয়—ছুলালীর চেয়ে কঠোরতর শাস্তি মোহন মাঝির প্রাপ্য। সমাজ যদি তাকে ক্ষমাও করে টুংরা তাকে ক্ষমা করবে না, তার জন্তু জান কবুল টুংরার, মোহন মাঝিকে সে এক হাত দেখবে।

টুয়াই মাঝি সামাজ্যের মাতঙ্গরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছে ছুলালীর বিয়েটা এবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। রাবণ মাঝি নাকি রাজি হয়েছে এ প্রস্তাবে। পাড়ার ছোকরাদের কাছ থেকে নিজের কানে শুনে এসেছে টুংরা, টুংরার সঙ্গে ছুলালীর বিয়ে। খবরটা অবশ্য একেবারে নতুন নয় টুংরার পক্ষে, কথাবার্তা ছোট বেলা থেকেই পাকা হয়ে আছে, মাঝখানে ছুলালী হঠাৎ নিকরদেশ না হয়ে গেলে বিয়েটা ঢের আগেই চুকে যেতো। কিন্তু টুয়াই মাঝি বলে মেয়েটা নাকি দুখী হয়ে গেছে, মোহন মাঝিকে নিয়ে ঘরকন্না করেছে সে বছর দুয়ের উপর, তাই ও মেয়ের সঙ্গে টুংরার বিয়ে দিতে বিশেষ নাকি আগ্রহ ছিলো না টুয়াই মাঝির। কয়লা কুঠি থেকে ছুলালী ফিরে আসার পর টুয়াই মাঝি কিন্তু মত পাটেছে, টুয়াই নাকি কথা দিয়ে দিয়েছে রাবণ মাঝিকে। ভালুকপোতার ভীম মাঝি টুংরা মাঝির সাক্ষাত,—খবরটা সে নিজের কানে শুনে এসেছে রামপুরের সাঁওতালদের কাছ থেকে। বিয়ের শুধু দিনটা এখন স্থির হতেই বাকি, তারও নাকি ব্যাবস্থা হচ্ছে; ভীম মাঝি বলে 'লগন ঝাঝ' খুব শিগ্গীর

নধ্যে শেষ হয়ে যাবে। টুংরার বন্ধু বান্ধবরা এখন থেকেই ধরে বসেছে টুংরাকে বিয়ের পর একদিন তাদের পেট ভরে খুব খাওয়াতে হবে। টুংরার তাতে আপত্তি নাই কিছুমাত্রই, ভোজের ব্যবস্থা একটা করতে হবে বৈকি, ভীম মাঝিকে কথা দিয়েছে টুংরা, ছালালীর সঙ্গে বিয়েটা তার চুকে বাক আগে—তারপর তারা মদ মাংস যত খেতে পারে।

ছালালী ফিরে আসার পর থেকে টুংরার মনটা আবার চাঞ্চা হয়ে উঠেছে। এতদিন সে একেবারে মনুড়ে পড়েছিলো, খেতে শুতে স্বস্তি ছিলো না টুংরার, দিনরাত সে ছালালীর কথাই ভাবতো। বিয়ের মজলিসে ছালালীকে প্রথম দেখার পর থেকে টুংরা যেন মাতাল হয়ে উঠেছিলো ছালালীর নেশায়, হলুদ-রাঙা শাড়ী পরে কি চমৎকারই না মানিয়েছিলো সে দিন ছালালীকে। ডগ্‌ডগে কাজল টানা ভাগর ছুটি চোখ, গোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়ার ফুল, গলায় ছিলো গুলঞ্চ ফুলের মালা। ছালালীর সে চেহারাখানা জীবনে কখনো ভুলবে না টুংরা, সেইদিন থেকে ছালালী যেন ছাপ মেরে বসে গেছে টুংরার মনে। টুংরা সে দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, ছালালীকে পেতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। চাঁদরায় মাঝির বিচার মত ব্যবস্থা হলে কাজ এতদিন হাঁসিল হয়ে যেতো। ছালালী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর টুংরার মনের অবস্থা যে কতখানি সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিলো, টুংরা ছাড়া জগৎ কেউ তা বুঝবে না। পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে টুংরা ছালালীর খোঁজে, মোহন মাঝিকে ধরবার জন্ত চেষ্টা সে বড় কম করেনি। তরগীর পাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে অজয় নদীর ধার পর্যন্ত খুঁজতে কোথাও বাকি রাখেনি টুংরা, প্রত্যেকটি বন—প্রত্যেকটি পাহাড় সে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে। দিন নাই

রাত নাই কাঁড়ধেয়ক কাঁধে ফেলে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছে টুংরা, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম' এ বন থেকে ও বন, কিন্তু মোহন বা দুলালীর কোন সন্ধানই সে করতে পারেনি। টুয়াই মাঝি অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে টুংরাকে শেষে ধরে নিয়ে আসে বাগবানির পাহাড় থেকে।

এতদিন ধৈর্য্য ধরে কোন রকমে শাস্ত ছিলো টুংরা, মনে মনে সে জানতো দুলালীকে একদিন ফিরতেই হবে। দুলালী ফিরে আসার পর টুংরার বন আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে; আর কিন্তু দেরি করা উচিত নয়, বিয়েটা এবার চটপট সেরে ফেলা দরকার। কিন্তু টুংরার এই বিয়ের ব্যাপারে টুয়াই মাঝির কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ রাবণ মাঝিকে নাকি কথা দিয়েছে টুয়াই, ভীম মাঝি নিজের কানে শুনে এসেছে। ভীম মাঝি কি তাকে মিথ্যে বলবে! ক'দিন ধরে ক্রমাগত দুলালীর কথাই ভাবছে টুংরা, দুলালীকে না পেলে টুংরা এবার সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে। মনে মনে মনকলা খেয়ে চুপচাপ আর বসে থাকা নয়, নিজে থেকেই কথাটা এবার পাড়তে হবে টুংরাকে টুয়াই মাঝির কাছে; টুয়াই মাঝিকে সে খোঁজাখুঁজি জানিয়ে দেবে দুলালীকে বিয়ে করতে আপত্তি নাই টুংরার। দোব হয়ত সে সত্যিই একটা ক'রে ফেলবে, কিন্তু সে জ্ঞা এমন কিছু আসে যায় না, সাওতালদের সমাজে একটা মেয়ের দু'বার বিয়ে—এ ত হামেশাই হচ্ছে। এ বিয়ের নাম সাঙা, পরমাশ্রদের দ্বিতীয়পক্ষ মানেই হলো সাঙা; তা হোক, টুংরা মাঝির আপত্তি নাই তাতে। সাঙালে বৌ নিয়ে কত লোকই ত ঘর করছে, সাঙা আর বিয়ে কথা দু'টো শুনতেই বা আলাদা, মানে ওর একই; সাঙাও বিয়ে, বিয়েও বিয়ে; যাহোক একটা হলেই হলো, টুংরার তাতে কিছু বাত্ন আসে যায় না।

একটা কথা শুধু ভেবে পায়না টুংরা, দুলালীর মেয়েটাকে নিয়ে সে কি করবে; এ যেন টুংরার পক্ষে একটা মস্ত বড় সমস্যা। টুংরা শুধু দুলালীকেই চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তার জলজ্যান্ত মেয়েটাকে কেমন ক'রে মেনে নেবে টুংরা; ও মেয়ে যে মোহনের, মোহন মাঝির বিব ওর সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে। দুলালীর মুখ চেয়ে পারবে কি টুংরা মেয়েটাকে চোখ বুজে বরদাস্ত ক'রে যেতে? না—না—তা হয় না, ওটাকে কোন রকমে সরাতে হবে—একেবারেই সরিয়ে দিতে হবে, এ ছাড়া ত আর পথ দেখেনা টুংরা। বিয়েটা আগে চুকে যাক, তারপর ও মেয়ের ব্যবস্থা টুংরার হাতে।

ভীম মাঝি এসে খবর দিয়ে গেল সেদিন দুলালীর বিয়ের নাকি লগন বাঁধা হচ্ছে, দিন দশেকের মধ্যেই 'শুগুং শাশাং'\* দা-বাগালা†—'সিঁদুর দান চুকে যাবে বেবাক। রাবণ মাঝিকে একেবারে পাকা কথা দিয়েছে টুয়াই মাঝি। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই টুংরার মনটা উশখুশ করছে। আর কিন্তু দেরি করা চলে না টুংরার, এবার তাকে তৈরি হতে হয়েছে।

পরের দিন সকালবেলা ভালুকটাকে সঙ্গে নিয়ে তীর ধমুক কাঁধে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো টুংরা, হাটে যেতে হবে, বিয়ের জামা কাপড় গুলো এখন থেকে কিনে না রাখলে হয়ত আর সময় পাওয়া যাবে না। ধুতি শাড়ী পাগড়ী বাঁধবার কাপড় মাকন্দার পোষাক বিয়ের আগেই হলুদ রঙে ছুপিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু এগুলোর জন্য বিশেষ কোন তাড়া নাই টুংরার, টুয়াই মাঝি সময় মত ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে। টুংরা শুধু বিয়ের জামাখানা নিজে একটু দেখে

\* শুগুং শাশাং—তেলহলুদ।

† দা-বাগালা—জল সওয়া।

তুনে পছন্দ ক'রে কিনে রাখতে চায়, যত দামই লাগুক রঙিন ছিটের হাতকাটা জামা একখানা চাই-ই। সাজ পোষাকের ব্যবস্থাটা একটু ভালরকমই করতে হবে টুংরাকে, লোকে যাতে নিন্দে করতে না পারে, চাই কি—বনকাটার মুচিদের হাতের বার্নিশ করা একজোড়া জুতো পর্যন্ত কিনে ফেলবে টুংরা, কতই বা দাম। পাঁচজনে দেখুক বে টুংরা নাথি একেবারে হাথাগোবা নয়, জুতোও সে পায়ে দিতে জানে; জুতো একজোড়া কিনবে টুংরা, যত দামই লাগুক। আর সেইসঙ্গে ঝাবড়ুর লেগেও একখানা পোষাক কেনা দরকার, ঝাবড়ুকেও বে টুংরার সঙ্গে বরিয়াত যেতে হবে। ভালুকের বাচ্ছাটাকে ঝাবড়ু বলেই বরাবর ডাকে টুংরা, আদর ক'রে ওই নামে ডেকে ডেকে ঝাবড়ু ওর নাম হয়ে গেছে। ঝাবড়ুকে ফেলে একটি পা কোথাও বেরোয় না টুংরা, যেখানেই সে যাক চাক্ষিষ ঘণ্টা ঝাবড়ু ওর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বিয়ের সময় ঝাবড়ুকে খালি গারে রাখা ভাল দেখায় না, ওর জন্তেও পোষাক একখানা কিনতে হবে টুংরাকে।

টাকা পরসা কতকগুলো কাপড়ের খুটে বেঁধে নিয়েছে টুংরা। তার জন্ত টুংরাই মাঝির কাছে তাকে হাত পাততে হয়নি, ওর ছুটুমা যদিও বেঁচে আছে তদ্দিন অন্তত টুংরার কোন ভাবনাই নাই সেদিক থেকে। টুংরাই মাঝির ছোট মেয়ে খাদী মেঝেন, মার সম্পর্কে টুংরার সে মানসী, বাপের সম্পর্কে টুংরার সে সৎমা। টুংরাই মাঝির বড় মেয়েটা, অর্থাৎ টুংরা মাঝির মার মারা যাওয়ার পর খাদী মেঝেনকে ফের বিয়ে করে টুংরার বাপ। তার কিছুদিন পরেই টুংরার বাপ হঠাৎ মারা পড়ে যায়। বিধবা হওয়ার কিছুদিন পর সোয়ামীর ভিটে ছেড়ে টুংরাকে নিয়ে চলে আসে খাদী মেঝেন টুংরাই মাঝির বাড়ীতে, টুংরা তখন নেহাত ছোট। তখন থেকেই বরাবর ওরা রয়ে গেছে ভলুকপোতায়,

খাদী মেঝেনকে ছোট বেলা থেকেই টুংরা মাঝি ছুটুমা বলেই ডাকে ; এইটুখানি বয়েস থেকে টুংরাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে খাদী । টুয়াই মাঝির আপনার জন বলতে একমাত্র ওরাই, ওই বিধবা মেয়েটা আর আধপাগলা ওই নাতিটাকে নিয়েই টুয়াই মাঝির সংসার । খাদী মেঝেনের ছেলে পিলে নাই, টুংরাকেই সে ছোটবেলা থেকে ছেলের মতই জানে ; টুংরার যত কিছু সখ আহ্লাদ, বা কিছু খেয়াল খুশি আঙ্গার নেটাতে হয় খাদী মেঝেনকেই । টুয়াই মাঝির অবস্থা বেশ ভাল, সংসারে তার অভাব নাই কোন দিক থেকেই, জন্মিজনা মই লাঙ্গল গরুবাছুর সবই আছে টুয়াই মাঝির, ভবিষ্যতে টুংরাই তার এক নাত্র ওয়ারিশ । তাই টুংরার সখ আহ্লাদে কোনদিনই বাধা দেয় না খাদী মেঝেন, যখন যা তার দরকার খাদী মেঝেনের কাছ থেকে না চাইতেই পায় । কিন্তু এত করেও টুংরাকে ওরা মানুষের মত মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারলে না কোনমতেই, খাদী মেঝেনের এই যা একটু দুঃখ । আজ পর্যন্ত সংসারের সে কোন কাজেই এলো না, দিন রাত খালি কাঁড় ধেয়াক আর শিকারের ধান্দা নিয়েই মেতে আছে টুংরা; সংসারের কোন কামেলায় সে মাথা গলায় না । টুংরার সম্বন্ধে আশা ভরসা প্রায় ছেড়ে কেলেকে খাদী মেঝেন, ওর দ্বারা যে ভবিষ্যতে ঘর সংসার ঠিক মত বজায় থাকবে, সে ভরসা খুব কম । তবু মাঝে মাঝে মনে হয় খাদী মেঝেনের শোন রকনে টুংরাকে একবার সংসারী ক'রে দিতে পারলে হয়ত খানিকটা চাপে পড়েও কিছুটা সে শুধরে যেতে পারে । খাদী মেঝেন টুয়াই মাঝিকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে টুংরার বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার । টুয়াই মাঝি শুধু হ' হ' ক'রেই সেরে দেয়, ব্যবস্থা সে এ পর্যন্ত কিছুই ক'রে নি । টুংরা কিন্তু বিয়ের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, ভাবে



ইঙ্গিতে খাদী মেঝেন বুঝতে পারে সবই। খাদী মেঝেনের উপর্যুপরি তাগিদের ঠেলায় টুয়াই মাঝি শেষ পর্যন্ত স্বীকার পেয়েছে—হুবিধা মত কনে একটা পাওয়া গেলেই ঝঙ্কাট সে মিটিয়ে ফেলবে।

টুংরা মাঝি কিন্তু খবর পেয়ে গেছে এর মধ্যে বিয়ের নাকি আর দেরি নাই মোটেই, চটপট এবার তৈরি হলেই হলো। খাদী মেঝেনের কাছ থেকে টাকা পরসা কিছু যোগাড় ক'রেছে টুংরা, হাতে তার না গেলেই নয়। টুংরার ভাবগতিক দেখে খাদী মনে মনে হাসে, কিন্তু বিয়েটা তার সত্যি সত্যি এবার চুকে যাওয়া দরকার; সে বিষয়ে খাদী মেঝেনের আগ্রহ টুংরার চেয়ে কম নয় কিছু।

হাতে যাবার মুখে ভীম মাঝির খোজ করেছিলো টুংরা। ভীম মাঝি তার সাক্ষাত, সে সূক্ষ্ম সন্ধে থাকলে টুংরার ভিনিসপারডো দেখে শুনে পছন্দ ক'রে কিনে দিতে পারতো। ভীম মাঝি কিন্তু সকাল থেকেই হাকপাড়ীতে সিনি\* ধরতে চলে গেছে। জখাই রসক্যা বাতলা মূল্য কেউ এরা আজ বাড়ী নাই, পাল কাটতে চলে গেছে সব নদীর ধারে।

সিনি\* দুনীশ ক'রে নদীর জল উপরে তুলে বীজধানের ক্ষেতগুলো কোন রকমে বাঁচাতে না পারলে আকরের অভাবে চাষ আবাদ এবার কঠিন হয়ে উঠবে। এই সবে শায়ন মাসের প্রথম, দেবতা কিন্তু এর মধ্যে একেবারে ধরে দিয়েছে, গোড়ার দিকে বুষ্টি যা এক আধটু হয়েছিলো কয়েকদিনের পর রোদে একদম তা টেনে নিয়েছে। 'রোহিণীর' আঁকর গুলো এবার জলে পুড়ে শুকিয়ে গেল বেবাক, বুষ্টির অভাবে নতুন ক'রে বীজধান ফেলবার সুযোগ পাওয়া যায় নি, কাদার

\* সিনি—টিনের তৈরি জল সেচনের ত্রিকোনাভূতি আধার বিশেষ।

+ দুনী—লোহার তৈরি জলসেচনের আধার।

আফর যে কতদিনে পড়বে দেবতাই জানে। চাষীরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে, বৃষ্টির অভাবে চাষ আবাদ প্রায় বন্ধ। রীতিমত সেচনের ব্যবস্থা করতে পারলে ধূলোর আফরগুলো কিছু কিছু এখনো ঝাঁচতে পারে। চারদিক থেকে তাই নদীনালা খুঁড়ে যতটুকু সম্ভব আফরের ক্ষেতগুলোতে জল ধরাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, টুংরার বজ্রবান্ধবরা সকলেই এখন মাঠে। খাদী মেঝেন টুংরাকেও ক'দিন থেকে তাড়া দিতে আরম্ভ করেছে, মুনিস মান্নের সঙ্গে নিয়ে আফরের ক্ষেতগুলো সেয়াত করবার ব্যবস্থা করা দরকার। টুংরার ধাতে কিন্তু পোষায় না ওসব, মাটি খুঁড়ে নালা কেটে জল তোলাহুলির মধ্যে টুংরা মাঝি নাই; বৃষ্টি যেদিন হবে সেদিন আপনা থেকেই হবে, তার জন্ত বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নাই টুংরার। এর চেয়ে যদি জ্বল থেকে ছুটে। খরগোস বা গোধা ঘেরে আনতে হয় টুংরাকে সে বরং কতকটা চলতে পারে, ওসব কাজে কোনদিনই পিছু হটবে না টুংরা। কিন্তু তাই বলে মাঠে গিয়ে সিনি হেঁচা বা টেঁড়ার দড়ি ধরে নদীর মানায় 'ঝরোল কাঁপ' খেলা—টুংরার ধাতে এ পোষাবে না কোন রকমেই। ও দিকে আবার বিয়ে লাগছে টুংরার, এ সময় তার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবার অবসর কোথায়।

খাদী মেঝেন টুংরাকে ভাল রকমই চিনে, তাই টুংরার উপর ভরসা সে বড় বেশি রাখে না, মাঠে গিয়ে মুনিস কৃষাণদের সঙ্গে নিজেকে তাকে মদত দিতে হয়। ঘরসংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম থেকে আরম্ভ করে জমি জমার তত্ত্বাবধান পর্যন্ত সব কিছুই লক্ষ্য রাখতে হয় খাদী মেঝেনকে। গায়ে গতরে খেটে খুটে এইভাবেই সে টুংরার মাঝির সংসারটাকে আজ পর্যন্ত কোন রকমে বজায় রেখেছে।

হাটে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর ভগ্‌ভগে লাল রঙের হাতকাটা  
 জামা একটা কিনে ফেললে টুংরা। কাপড়টা বেশ পুরু আছে, টিকবে  
 অনেকদিন; তা ছাড়া কোমরের দু'ধারে পকেট আছে দুটো, জিনিস  
 পত্র রাখবার কোন অসুবিধা নাই, জামা খানা টুংরার গায়ে মানিয়েছে  
 ও বেশ চমৎকার। কাপড়ের দোকান থেকে একটা চৌঘুড়ে  
 গামছা আর সেই সঙ্গে ছাপছোপ দেওয়া কমাল কিনে ফেললে  
 টুংরা। ছোট একটা আয়না, সৰুদাঁড়া কাঠের একটা বাক্স, ছড়া তিনেক  
 পাহাড়ী বেলের মালা, মায় গোলাপী রঙের গায়ে মাখা একখানা সাবান  
 পর্য্যন্ত খরিদ ক'রে গামছার খুঁটে বেধে নিলে টুংরা, বিয়ের সময়  
 এগুলো সব কাজে লাগবে বোঝা। ভালুকের জামা কিন্তু কোন  
 দোকানেই পাওয়া গেল না, কাজেই দরজীর কাছে মাপ দিয়ে জংলী  
 ছিটের কুর্টা একটা সেলাই করিয়ে নিলে টুংরা ঝাবড়ুর জুতো, নগদ পাচ  
 সিকে খরচা ক'রে। জুতো কিনতে গিয়ে একটু মুন্সিলে পড়লো টুংরা,  
 জুতো আর কোনমতেই জুতসই হয় না। দেশী মুচির হাতের তৈরি  
 কয়েক জোড়া জুতো সে একে একে পরখ ক'রে দেখে নিলে দু'তিন  
 জায়গা ঘুরে ঘুরে, কোনটা পায়ে খাটো হয়, কোনটা বা টিলে; যে  
 দু'একজোড়া ওবই নখো পায়ের ঠিক মাপে মাপে বসে গেল সেগুলো  
 কিন্তু পায়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করা সহজ বলে মনে হলো না  
 টুংরার, জুতো পরে হাটতে গেলেই পাগুলো যেন কেঁপে উঠে  
 শরীরের ভার কেন্দ্র সমান রেখে চলা—সে যেন এক দুক্লহ ব্যাপার,  
 হাটতে গেলেই মনে হয় পা পিছলে গেলাম বুঝি উল্টে। কিন্তু না,  
 জুতো টুংরাকে পরতেই হবে, দু'চার দিন অভ্যাস ক'রে নিলেই তারপর  
 সব ঠিক হয়ে যাবে আপনা থেকেই। দেখে শুনে পছন্দ ক'রে শেষ  
 পর্য্যন্ত জুতো একজোড়া কিনে ফেললে টুংরা, খাঁটি মোষের চামড়া,

সেলাইয়ে মধ্যে ফাঁকি নাট কোন জায়গায়, গোটাটাই চামড়ার সেলাই, মচমচে অংগুষ্ঠাও বেশ ভাল আছে। পোয়া খানেক সরষের তেল কিনে জুতোগুলো বেশ ভাল ক'রে একবার ভিজিয়ে নিলে টুংরা, চামড়াটা মোলাম থাকবে। জুতোগুলো এবার পায়ে দিয়ে কিছুটা যেন আরাম বোধ হচ্ছে, হাট বাজার সেরে নিয়ে টুংরা এবার বাড়ী ফিরবার ব্যবস্থা করতে লাগলো, বেলা প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে। হাট থেকে বেরবার আগে মকর বাঁশের আড় বাঁশী একটা কিনে ফেললে টুংরা; বাঁশীর গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে কেটে নানা রকমের ছক তোলা হয়েছে, বাঁশীটা বেশ ভাল। কিন্তু হুংথের বিষয় আড় বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে আজ পর্যন্ত আওয়াজ কখনো বের করতে পারেনি টুংরা, কোন্ দিকের কুটো দিয়ে কেমন করে যে হাওয়া বেরিয়ে যায় কিছুতেই সে ধরতে পারে না। টুংরা আর একবার চেষ্টা করে দেখবে; আওয়াজ ওঠে ভালই, আর না উঠলেও পয়সা ক'টা নেহাত জলে পড়বে না—বাঁশীটা বেশ লম্বা আছে, দরকার হলে এটাকে হাত-লাঠিও করা যেতে পারে।

ঝাবড়ুর গলার শিকলটা ধরে টানতে টানতে হাট থেকে টুংরা বেরিয়ে পড়লো। টুংরার গায়ে রঙিন জামা, পায়ে মোবের চামড়ার জুতো, গলায় একছড়া পাহাড়ী বেলের মালা, হাতে একটা আড়বাঁশী পর্যন্ত। অন্ত্যন্ত হাট বাজারগুলো চৌঘুড়ে গামছাটার বঁধে আগে পিছে ক'রে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে টুংরা, বাঁ-কাঁধে কাঁড় ধেয়েকটা ঠিক কোলানো আছে বরাবরকার অভ্যাস মতই। রাস্তায় যেতে যেতে মুন্সিল হলো ঝাবড়ুকে নিয়ে, মাঝে মাঝে সে থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই আর এগুতে চায় না, জামাখানা ঝাবড়ুর গায়ে পরিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওর মেজাজটা কিছু রুক্ষ হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের জানোয়ার কি না, সভ্যতার মর্যাদা সে বুঝবে কেমন ক'রে। গলার শিকলটা ধরে টানতে

টানতে ঝাবড়ুকে নিয়ে এগিয়ে চললো টুংরা বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে।  
 মাইল খানেক যেতে না যেতে টুংরার জুতোগুলো কিন্তু ভয়ানক বে-আদপি  
 আরম্ভ করলে টুংরার সঙ্গে। ডান পায়ের গোড়ালিতে একটু একটু জ্বালা  
 করতে আরম্ভ করেছে, বাঁ-পায়ের আঙ্গুলগুলো চেপে বেন দৌটে গেছে  
 গায়ে গায়ে লেপটি লাগা হয়ে, কড়ে আঙ্গুলটা জ্বালা করেছে ঠিক যেন  
 চিরাটি কাটার মত। জুতোগুলো খুলে কেললে টুংরা, আরও খানিকটা  
 এগিয়ে গিয়ে আবার পরে নিলেই চলবে, পা গুলো ততক্ষণ ছাড়ুক  
 একটুখানি। জুতো খুলে তাড়াতাড়ি পা দু'টো একবার চোখ বুলিয়ে  
 দেখে নিলে টুংরা, জখম তেমন বিশেষ কিছু হয়নি, শুধু ডানপায়ের  
 গোড়ালিতে ছাল ছেড়ে গেছে খানিকটা জায়গা, আর বাঁ-পায়ের কড়ে  
 আঙ্গুলে একটুখানি ফোঁস পড়েছে। ও এমন মারাত্মক কিছু নয়,  
 দু'দিনেই বেবাক ঠিক হয়ে যাবে। জুতোগুলো খুলে ঝেড়ে গানছার  
 খুঁটে বেঁধে নিলে টুংরা।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য আকাশটাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, পথের  
 মাটি গরম হয়ে উঠেছে, মাঠঘাট সব খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। গরমটা  
 যেন এবার কিছু বেশি পড়েছে। হাট থেকে বেরিয়ে ক্রোশ দুই আড়াই  
 পথ ভেঙ্গে গায়ের ধারে ছোট কাঁদরটার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো টুংরা,  
 সর্বাঙ্গ দিয়ে তার কল্ কল্ ক'রে ঘাম ঝরছে, ভালুকটা পর্যন্ত হাঁপিয়ে  
 উঠেছে রোদের তাতে। কাঁদরের ডোবায় ঝাবড়ুকে একবার জল  
 খাইয়ে নিলে টুংরা, তারপর সে পাড়ের উপর একটা বটগাছের শিকড়ে  
 শক্ত ক'রে ওটাকে বেঁধে দিয়ে কাঁদরের জলে হাত পা ধুতে নামলো।  
 বেশ ক'রে মুখ হাত ধুয়ে পোটলা থেকে জুতো জোড়া বের ক'রে আর  
 একবার পায়ে দিলে টুংরা, জুতো পরে গাঁটুকতে হবে। জুতোগুলো  
 কিন্তু ভাল রকম বাগ মানেনি এখনো, পা টিপে টিপে কাঁদরের পাড় বেয়ে

খুব সাবধানে উঠে যেতে লাগলো টুংরা। বটতলায় গিয়ে দেখে ওদিকে আবার এক নতুন উপসর্গ, ঝাবড়ু একেবারে মরিয়া হয়ে দাঁত মুখ খিঁচে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে বটগাছের শিকড়ে। কি সর্বনাশ! আর একটু না দেখলেই জামাখানা হয়ত সে একেবারে ছিঁড়েই ফেলতো। তাড়াতাড়ি শিকলটা ধরে টান দিয়ে ঝাবড়ুকে একটু সামলে নিলে টুংরা, ঝাবড়ুকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,— বরিয়াত যাবি বেটা—ভাবনা করিস না, আখার যে বিহারে, বহুকে তুই লাচ দেখাবি না?

টুংরার দিকে চেয়ে কৌ কৌ ক'রে একবার ভেকে উঠলো ঝাবড়ু, টুংরার বিয়েতে বরিয়াত যাবার আনন্দে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। টুংরা বললে,—আজ তোকে একটা নতুন রকমের লাচ শেখাব বেটা, লাঠি ঘাড়ে থান্ডার সঙ্গে রণ দিতে পারবি ত?

ঝাবড়ু কোন সাড়া দিল না, অস্বস্তি ওর ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। শিকলটা ধরে টানতে টানতে গায়ের দিকে এগিয়ে চললো টুংরা। গা ঢুকতে হঠাৎ ভীম মাঝির সঙ্গে দেখা। টুংরার সাজ পোষাক দেখে ভীম মাঝি অবাক, ঝাবড়ুর গায়ে অদ্ভুত রকমের পোষাকটা দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠলো ভীম মাঝি। টুংরাও হিহি ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে ভীম মাঝির দেখাদেখি। তারপর সে হাসি চেপে একটু গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—আর কোন খবর পেলি ভা?

ভীম মাঝি টুংরার সাক্ষাত, পাড়ার পাঁচজন ছোকরা মিলে টুংরার বিয়ের কথা নিয়ে এতদিন শুধু হাসি ঠাট্টাই ক'রে এসেছে ওরা, টুংরাকে নিয়ে মাঝে মাঝে রগড় করা ওদের একটা আমোদ। আজ কিন্তু সত্য সত্যই খবর পাওয়া গেছে টুংরার জন্তে কনে একটা নাকি ঠিক করে ফেলেছে টুয়াই মাঝি, খবরটা আজ-খাদী যেকনের কাছ

থেকে শুনে এসেছে ভীম মাঝি আকবাড়ীতে জল ধরাতে গিয়ে। টুংরা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভীম মাঝির সঙ্গে গোটা কয়েক দরকারী কথাবার্তা সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে টুংরা। সময় আর বেশি নাই মোটে—এর মধ্যে ঝাবড়ুকে একটু তালিম ক’রে নেওয়া দরকার, আরও ছ’ একটা নতুন রকমের খেলা তাকে শিখিয়ে নিতে হবে, ঝাবড়ুকেও যে বিয়ের সময় যেতে হবে বরিয়াদদের সঙ্গে।

বাড়ী ঢুকে নাচুয়ারের আগলটা বন্ধ ক’রে দিয়ে ভালুকটাকে উঠানের মাঝখানে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে টুংরা, ভালুকটা তখনও ইঁপাচ্ছে। বেলা প্রায় প্রহর তিনেক হয়ে এলো, খাদী যেবেন নাঠ থেকে এখনো বাড়ী ফিরেনি। দাওয়ার একপাশে জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি জুতোগুলো টুংরা খুলে ফেললে, এতক্ষণ সে টের পায়নি জুতোর চাপে টুংরার পায়ের চারিপাশে বড় বড় কতকগুলো কোম্বা পড়ে গেছে, জুতোগুলো পা থেকে খুলে টুংরা যেন ইঁপ ছেড়ে বাঁচলো। রঙিন ছিটের নতুন জামাপানি সে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। ভয়ানক গরম পড়েছে, সর্কাস দিয়ে কল্ কল্ ক’রে ঘান ঝরছে টুংরার, পুরো আড়াইটি ক্রোশ পথ বরাবর জামা গায়ে দিয়ে হেঁটে আসছে টুংরা। ঘান একটু ঝরঝাই কথা। জামাখানা দাওয়ার একটা খুঁটির উপর ঝুলিয়ে দিয়ে জলই পেতে টুংরা বসে পড়লো, একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে ঝাবড়ুকে আবার তালিম দিতে হবে, সময় নে আর হাতে নাই মোটেই। শাল পাতার একটা চুটি বানিয়ে চকমকির আগুনে ধরিয়ে নিলে টুংরা। বসে বসে আরাম ক’রে চুটিটার সে ছ’ একটা মাত্র টান দিয়েছে এমন সময় টুংরার চোখে পড়লো ভালুকটা আবার দাঁত মুখ খিঁচে গা রগড়াতে আরম্ভ করেছে

খুঁটির সঙ্গে। আড়বাঁশীটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল টুংরা, ভালুকটার কাছে গিয়ে দেখে খসখসে খুঁটির গায়ে গা ঘষে ঘষে জামাটা খানিক ছিঁড়ে ফেলেছে ঝাবড়ু। টুংরার মনটা ভয়ানক খিচড়ে উঠলো, ঝাবড়ুকে একটা ধমক দিয়ে টুংরা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঝাবড়ু যেন দাঁত খিচিয়ে ঝাঁপিয়ে এলো টুংরার দিকে। টুংরার মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, হাতের আড়বাঁশীটা উচিয়ে ধরে জোর ভরতি কবে দিলে টুংরা ঝাবড়ুর মাথায় ঝড়াম করে এক লাঠি। ঝাবড়ুর মেজাজ আরও উগ্র হয়ে উঠলো, যেই টুংরা ঝাবড়ুর সামনে বসে শিকলটা তার টেনে ধরে জামাখানা খুলবার জন্ত হাত বাড়িয়েছে, ঝাবড়ু অমনি ইঁ ক'রে যেন তেড়ে এলো টুংরাকে, সঙ্গে সঙ্গে পড়লো আর এক লাঠি। ভালুকটা এবার মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো টুংরার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সে রাগের মাথায় টুংরার বুকে বসিয়ে দিলে প্রচণ্ড এক থাবা। ঝাবড়ুর সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো টুংরা, ঝাবড়ুর এ বেইমানি তার সহ্য হলো না, টুংরার মেজাজ ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠলো, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আগাপাস্তালা আরম্ভ করলে টুংরা আড়বাঁশী দিয়ে ঝাবড়ুকে বেদম প্রহার। যে জানোয়ার এমন ধারা গোলা গোসাই মানে না, মিছেমিছি তাকে তিনসঙ্খ্যে আহার জুগিয়ে পুষে রেখে লাভ কি! মরুক বেটা—লাঠি খেয়েই মরুক, টুংরা আজ ওকে আস্ত রাখবে না।

ভালুকটাকে মারতে মারতে আড়বাঁশীটা শেষ পর্য্যন্ত ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে গেল। এতেও কিন্তু রাগ পড়লো না টুংরার, ভয়ানক সে চটে গেছে ঝাবড়ুর উপর, এত বড় আশ্পর্কী বেটা জানোয়ারের যে টুংরা মাঝিকে থাবা চালায়। আড়বাঁশীটা ভেঙ্গে যেতেই টান মেরে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে টুংরা, তারপর সে এক লহমায় চড়ে



বসলো হঠাৎ ভালুকটার পিঠের উপর। ভালুকটাকে বাগিয়ে ধরে গা থেকে তার জামাখানা কোন রকমে খুলে ফেললে টুংরা। ভালুকটাও ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, রাগে সে একেবারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। টুংরা ভালুকটাকে মাটির উপর কাত ক'রে ফেলে গলাটা তার দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে; টুংরা বনাম কাবড়ু, চললো ওদের ধ্বস্তাধস্তি কিছুক্ষণ ধরে; কেউ কারো কাছে হার মানতে চায় না, এমন ধারা ব্যাপার।

টুংরা মাঝির ছুটুমা খাদী মেঝেন মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছে। সদর দোরের আঙুড় তেলে বাড়ী ঢুকতেই টুংরার কাণে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ভালুকটার সঙ্গে টুংরা একেবারে ঘন্থ যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওরা দুটোতেই, এ যেন ঠিক জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের লড়াই। কারণটা ঠিক বুঝতে পারলে না খাদী মেঝেন, শশব্যস্তে ছুটে গিয়ে পিছন দিক থেকে তাড়াতাড়ি ভাক দিলে খাদী মেঝেন,—টুংরা—টুংরা!

টুংরা তখন ভালুকটার উপর চেপে বসে এলোপাখাড়ি ঘূষি মারতে আরম্ভ করেছে। খাদী মেঝেন টুংরার হাত ধরে টানতে টানতে ভালুকটার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার একপাশে বসিয়ে দিলে টুংরাকে। ভালুকটা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাঠফাটা রোদে খুঁটির একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিব বের ক'রে হাঁপাতে লাগলো ভালুকটা, মুখ দিয়ে ওর অবিশ্রান্ত লালার বরছে।

খাদী মেঝেন টুংরাকে একটা ধমক দিয়ে বললে,—এ সব তোর কি কাণ্ড বল্ দেবি, এই ক'রেই দেখছি কোন দিন হয়ত বিপদ ঘটাবি।

দাঁতে দাঁত চেপে টুংরা বললে,—বেটাকে আজ আমি নিষাঘত খুন করবো।

খাদী মেঝেন একটু শাসিয়ে বললে,—তেল মেখে আগে চানটা ক'রে আয় দেখি, খাবার আমি ঠাই করছি ততক্ষণ।

পাখা দিয়ে খানিক বায়ড় ক'রে টুংরাকে একটু ঠাণ্ডা করলে খাদী মেঝেন। তারপর সে তেলের ভাঁড়টা টুংরার দিকে এগিয়ে দিলে। ছোট একটা গামলা ক'রে হেঁসেল থেকে কতকগুলো ভাত বেড়ে খানিকটা পচুই মদের সঙ্গে ভাতগুলোকে চটকে ঝাবড়ুর কাছে নিয়ে গিয়ে গামলাটা তার মুখের সামনে ধরে দিলে খাদী মেঝেন। সঙ্গে সঙ্গে গামলায় মুখ ডুবিয়ে চক্ চক্ শব্দে ভাতগুলো খেতে আরম্ভ করলে ঝাবড়ু, এতক্ষণে ওর ঘড়ে যেন প্রাণ এলো। ভালুকটাকে একবার জল দেখিয়ে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিয়ে এলো খাদী। টুংরা তখন মাথায় খানিকটা তেল রগুড়ে গামছা কাঁধে ফেলে চান করতে বেরুচ্ছে।

টুংরাকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাণ্ডা ক'রে হাঁড়ি হেঁসেল গুটিয়ে দিলে খাদী মেঝেন, বেলা তখন প্রায় পড়ে এসেছে। দাওয়ার একপাশে মাচুলির উপর বসে বসে চুটি ফুঁকছে টুংরা, খাদী মেঝেন হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে,—বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে বোটা, কাল যাবে সব লগন বাঁধতে।

টুংরা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ভীম মাঝি তা হলে ঠিকই বলেছে। টুংরা একটু মুচকি হেসে বললে,—কালই—লগন তাহলে কালই বাঁধা হবে ?

খাদী মেঝেন বললে,—ই বোটা, তুইও যাবি ওদের সঙ্গে—কনেটা এক লজর দেখে আসবি।

টুংরা হাসতে হাসতে বললে,—কনে আমার দেখা আছে ছুটুনা, রামপুরের সবাই আমার চেনা।

খাদী মেঝেন বললে,—কনে দেখতে যেতে হবে কিন্তু বাগঝাঁপা, ওই গায়েরই লখু মাঝির বিটির সঙ্গে কথা চলছে কিনা, আজ সকাল বেলা লখু মাঝিকে কথা দিয়ে এসেছে তোরা গড়ম বাবা ।\*

বাগঝাঁপার লখু মাঝি, কে সে ? টুংরা ত তাকে চেনে না, তার বেটীর সঙ্গেই বা সম্বন্ধ কি টুংরার,—খাদী মেঝেন এ বলে কি ! টুংরা একটু আশ্চর্য্য হলো, খাদী মেঝেনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে একটু গম্ভীর ভাবে সে বলে উঠলো,—ছুটুমা !

খাদী মেঝেন সাড়া দিলে,—কি বেটা ।

টুংরা একটু অপ্রসন্ন ভাবে স্বর টেনে বললে,—ও আবার কি বলছিস, রামপুরের রাবণ মাঝির বিটির সঙ্গেই ত কথাবার্তা চলছিলো ।

খাদী মেঝেন জবাব দিলে,—রাবণ মাঝির বিটিটা যে দুখী হয়ে গেছে বেটা, বাবা যে ওখানে মত করবেক নাই ।

টুংরাই মাঝি মত করবে না, এ আবার কি গোলমালে কথা । মত ত সে আগেই করেছে, ভীম মাঝি নিজের কানে শুনে এসেছে । ভীম কি তাহলে টুংরার কাছে মিথ্যে বলেছে ? কিন্তু মিথ্যে বলবার লোক ত ভীম মাঝি নয় । টুংরা একটু গোলমালে পড়লো— ব্যাপারটা আজ টুংরাই মাঝির কাছে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে টুংরাকে, বাগঝাঁপায় বিয়ে টুংরা করবে না, জান গেলেও না ।

মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল টুংরার । ভীম মাঝিকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসবে নাকি,—বাগঝাঁপা, না, রামপুর ? রামপুরের কথাই ত সে বরাবর বলে আসছে । দুলালীকে হাতছাড়া করতে কোনমতেই রাজি নয় টুংরা, যে যা বলে বলুক ; বিয়ে যদি

করতে হয় টুংরাকে তাহলে ওই রামপুরেই, বাগকাঁপা ভালুকঝাঁপার মধ্যে টুংরা মাঝি নাই।

খাদী মেঝেন জানে ছলালীর নামে টুংরা আজও পাগল, ছলালীর কথা সে ভুলতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু উপায় কি, সেটি যে আর হবার নয়। টুংরাকে নিঝুম মেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খাদী মেঝেন বলে উঠলো,—বসে বসে কি ভাবছিল বেটা,—খা আর একটা চুটি খা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো টুংরা, ভীম মাঝির কাছে একবার যেতে হবে, ভীমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা বিশেষ দরকার। পচুই মদের ভাঁড়টা এনে টুংরার সামনে ধরে দিলে খাদী মেঝেন। মদ ত আজ খেতেই হবে টুংরাকে, ডবল নাক্রায় খেতে হবে; একটু নেশা না করলে টুংরাই মাঝির সামনে হয়ত গুছিয়ে সব কথা বলতে পারবে না টুংরা। মদের ভাঁড়টা মুখের উপর তুলে ধরে ঢক ঢক ক'রে পচুই মদ খানিকটা গিলে কেললে টুংরা, তারপর সে ভাঁড়টা একধারে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে, বেলা পড়ে আসছে।

সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেরে ছোট ঘরের দাওয়ায় একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়েছে টুংরা। ভীম মাঝির সঙ্গে তার দেখা হয় নি, শুয়ে শুয়ে টুংরা নিজের মনেই আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো, থেকে থেকে শুধু ছলালীর কথাই ভেসে উঠছে টুংরার মনে। ছলালীকে না পেলে টুংরা মাঝি বাচবে কেমন ক'রে!

টুংরাই মাঝি এতক্ষণে বাড়ী ফিরলো। খাটিয়ার উপর শুয়ে শুয়েই টুংরা একটু উঁকি মেরে দেখে নিলে। টুংরাই মাঝির খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই রাত হয়ে গেল প্রায় গ্রহর দেড়েকের উপর। বড় ঘরের

চালার টুয়াই মাঝির শোবার জন্ত একটা মাহুর পেতে দিলে খাদী মেঝেন। টুংরা এখনো ঘুমোয়নি, ইচ্ছে করেই সে জেগে আছে আজ। টুয়াই মাঝি মাহুরের উপর বসে বসে থইনি রগড়াচ্ছে, শোবার আগে একটু চুন-তামাকুল খাওয়া তার বরাবরকার অভ্যাস। ধীরে ধীরে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো টুংরা, টুয়াই মাঝির কাছে কথাটা এবার পাড়তে হবে। খাদী মেঝেনের সঙ্গে টুয়াই মাঝির পরামর্শ চলছে টুংরারই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। টুংরা গিয়ে ধীরে ধীরে টুয়াই মাঝির সামনে দাঁড়ালো।

টুয়াই মাঝির সঙ্গে কথাবার্তা যে টুকু হলো—টুংরার পক্ষে তা লোভনীয় নয়। বাগঝাঁপার লখু মাঝির মেয়ের সঙ্গে টুংরার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালই, বয়েস হয়েছে এককুড়ির কাছাকাছি। দেখে শুনে মেয়েটাকে পছন্দ ক'রে এসেছে টুয়াই মাঝি, কথা এক রকম দিয়েই এসেছে; টুংরাকে এবার যেতে হবে টুয়াই মাঝির সঙ্গে বাগঝাঁপায় লগন বাঁধতে।

টুংরার মনটা ভয়ানক দমে গেল, কথাটা তাহলে মিথ্যে বলে নি খাদী মেঝেন। রামপুরে টুংরার বিয়েটা কি তাহলে ভেঙ্গে গেল শেষ পর্যন্ত? কিন্তু টুংরা ত ও বিয়ে ভাঙতে চায়নি। বিয়ে যদি করতে হয় টুংরাকে তাহলে ওই রামপুরেই, আর যদি না হয় ত বিয়ে ক'রে কাজ নাই টুংরার। বাগঝাঁপার লখু মাঝির মেয়ে—টুংরার পক্ষে পরামর্শ না ক'রে কেন সেখানে কথা কহিতে গেল টুয়াই মাঝি। টুংরা ওসব মানে না, বিয়ে ওখানে করবে না টুংরা, কোনমতেই না।

চুন-তামাকুল শেষ ক'রে একটা চুটি ধরালে টুয়াই মাঝি, চুটি খেতে খেতে টুংরার দিকে চেয়ে সে বললে,—সকালবেলা পাড়ার পাঁচজনকে খবর দিয়ে দে, লগন বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে।

টুংরা মাঝি বহুকাল থেকে ইতস্তত করছে, মনের কথাটা সে বুঝে বলতে পারছে না টুয়াই মাঝির সামনে। ফয়সালা কিন্তু এর একটা হওয়া দরকার, এফুনি—দেখি ক'রে লাভ নাই কোন। টুংরা একটু অসুযোগের সুরে বলে উঠলো,—গড়ম বাবা!

টুয়াই মাঝি টুংরার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলে একটুখানি, বললে,—কিছু বলছিল?

টুংরা একটু জোর গলায় বলে উঠলো,—বাগঝাঁপায় বিয়ে টিয়ে আনি করবো না, উকথাটি আর বলিস না।

টুয়াই মাঝি একটু বিস্মিত হয়ে বললে,—কেনে বল দেখি?

টুংরা মাঝি জবাব দিলে,—ওখানে ত আগে থেকে কথা হয়নি, কথাবার্তা ত ঠিক হয়ে আছে আর এক জায়গায়।

টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—তার মানে?

টুংরা বললে,—রাবণ মাঝিকে তুই কথা দিস নাই?

টুয়াই মাঝি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে সবই, ছালালীকে টুংরা এখনো ভুলতে পারেনি; কিন্তু সেটি যে আর কোনমতেই হবার নয়। টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—কথা আমি সত্যি দিয়েছি রাবণ মাঝিকে, ছালালীর বিয়ের ব্যবস্থা আমাকেই ক'রে দিতে হবে, তার জন্তে ছেলে আমি একটা খুঁজছি।

টুংরা মরিয়া হয়ে বলে উঠলো,—আমার সঙ্গে এর কথা হয়ে আছে গোড়া থেকেই।

টুয়াই মাঝি একটু গম্ভীর ভাবে বললে,—সে আর হয় না, পঞ্চগেরামী সমাজ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে ছালালীর বর হবে কানা, কিম্বা খোঁড়া, কিম্বা কুঠে বা ওই রকমেরি একটা কিছু; এই তার শাস্তি।

ছালালীর ঘটক

টুংরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—কানা—খোঁড়া—কুঠে,—এ তুই  
কি বলছিস গড়মবাবা !

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—খাটি কথাই বলছি ।

টুংরার মাথাটা যেন বৌ বৌ ক'রে ঘুরতে লাগলো, কানা—  
খোঁড়া—কুঠে ? তাহলে যে টুংরার আর কোন আশাই নাই।  
টুংরা একটা তোক গিলে বললে,—এই কি তোদের শেষ কথা, গড়ম  
বাবা ?

টুয়াই মাঝি জবাব দিলে,—এর উপর আর কথা নাই ।

টুংরার মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো, জোর গলায় বলে উঠলো টুংরা,—  
ইটা কিন্তু রীতিমত জলুম ।

টুয়াই মাঝি একটু রুচকপটে বললে,—চুপচাপ শুয়ে পড়গে যা, রাত  
হয়েছে ।

টুংরা মাঝি বললে,—বাগঝাঁপায় বিয়ে কিন্তু করবো না আমি, এখন  
থেকেই বলে রাখছি ।

টুয়াই মাঝি কিছুক্ষণ টুংরার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে,—  
তা বেশ, কাল আমি ওদের জবাব দিয়ে দিব ।

“টুংরা আর বেশি কিছু বলতে পারলে না, ওর বুকের ভিতরটায়  
কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলো ; হতাশ ভাবে টুয়াই মাঝির দিকে  
নিশেধে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো টুংরা । খাদী মেঝেনকে জলজ ক'রে  
টুয়াই মাঝি বলে উঠলো,—ওকে শুইয়ে দিয়ে আয় ।

খাদী এসে সামনে দাঁড়াতেই ভান্সাগলায় বলে উঠলো টুংরা,—  
ছুটু মা !

খাদী মেঝেন টুংরার হাত ধরে বললে,—রাত হলো বেটা, শুবি  
চল ।

টুংরা বুঝি এবার ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেললে। টুয়াই নাঝির পাথরের মত শক্ত বুক খানা হঠাৎ যেন একটু ছলে উঠলো, তার অজ্ঞাতেই ঝরে পড়লো একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু উপায় নাই, কোন উপায় নাই।

রাত তখন অনেক। কৃষ্ণ পক্ষের জম্বাট বাঁধা গাট অন্ধকার একটু যেন ক্যাকাসে হয়ে এসেছে, মিট মিটে তারার আলো, ঝাপসা হয়ে আছে আকাশ খানা। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উদ্ভাস্ত চকল বাতাস একটানা অন্ধকারের বকে লুটোপুটি খেতে খেতে হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে পড়েছে, মন্থর হয়ে উঠেছে তার গতি; চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, ধরিত্রীর চোখে যেন সবেমাত্র আলস লেগেছে। নিখিল বিশ্ব চরাচরব্যাপী সীমা-হীন শুকতাকে বকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রকৃতি যেন পাহারা দিচ্ছে দিগন্ত বিধারী তার কালোরঙের ডানার মধ্যে ঢেকে। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, শীতাল পাড়া নিরুন্ম। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে কোন্ এক ঘরছাড়া হাংলা কুকুরের উৎকট ঘেউ ঘেউ শব্দ অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

টুংরার চোখে ঘুম নাই, খাটিয়ার উপর পড়ে পড়ে চোখ বুজে সে ছুলালীর কথাই ভাবছে। শরতান মোহন নাঝি টুংরার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো টুংরার কলজেকটাকে ভেঙ্গে দিয়ে, সে আঘাত আজো ভুলতে পরে নি টুংরা, মোহন নাঝির দুশমনি কোনমতেই সে ভুলতে পারে না। আজ কিন্তু একা মোহন নাঝিই নয়, টুংরার আজ ঘরে বাইরে শত্রু, টুয়াই নাঝি পধ্যস্ত চরম দুশমনি আরম্ভ করেছে টুংরা নাঝির সঙ্গে। ছুলালীর সে বিয়ে দিতে চার অগ্র কারো সঙ্গে, টুংরা নাঝি বাতিল। কি আশ্চর্য! যার সঙ্গে ছুলালীর বিয়ে হবে সে নাকি হবে কানা কিম্বা খোড়া কিম্বা কুঠে—কি ভয়নক কথা। এই নাকি ওদের আইন। কোথাকার এক কানা খোড়া এসে লুটে নিয়ে



যাবে ছুলালীকে টুংরার চোখের উপর দিয়ে, আর টুংরা—পারবে টুংরা চোখ বুজে তাই সহ্য করতে ! টুংরাই মাঝি যে ছুলালীর সঙ্গে কানা ছেলেই খুঁজছে, খোঁড়া ছেলের সম্মান করছে, হয়ত বা কোন কুঠেকেই ধরে নিয়ে আসবে শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে হোক । ছুলালীর বিয়ের ভার যে এখন টুংরাই মাঝির উপর । কেউ এরা দুজনে না টুংরার মনের কথা, বুঝতে কেউ চাইলে না টুংরা যায় ; টুংরা যে পাগল, সবাই বলে টুংরা মাঝি আস্ত একটা পাগল । টুংরার নাকি ছিট আছে মাথার ; হবে হয়ত । কিন্তু ছুলালীকে কোন মতেই ভুলতে পারছে না টুংরা, টুংরা যে তাকে ভালবাসে । তাকে বলবে এও হয়ত পাগলের এক পাগালামি, কিন্তু টুংরা মাঝি সত্য । তাকে ভালবাসে, ছুলালীর সঙ্গে হাসতে হাসতে জান দিতে পারে টুংরা । কিন্তু টুংরাই মাঝি কি বুঝবে তার মনের কথা, টুংরার এ ভালবাসার কিছুমাত্র কি দাম আছে টুংরাই মাঝির কাছে । তার চাই কানা ছেলে—খোঁড়া বর—কুঠে জামাই, সমাজের বিধান । তাই হোক, কানা ছেলেই পাবে টুংরাই মাঝি ; টুংরা তাকে কানা ছেলেই যোগাড় ক'রে দেবে, টুংরার এতে বত কতিই হোক ।

ধীরে ধীরে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়লো টুংরা । তার কানে এসে বাজছে যেন অম্পট নিশির ডাক, কে যেন জোর ক'রে ঘুম থেকে জাগ দিলে টুংরাকে ; তাকে যে আজ তৈরি হতে হবে—যেমন ক'রে হোক তৈরি হতে হবে, আর দেরি নয়—আজ রাত্রের মধ্যেই ।

উঠানের এদিক ওদিক একটু ঘুরে কিরে নিলে টুংরা, কেউ কোথাও জেগে নাই ; খাদী মেঝেন ঢেঁকি শালে নিঃসাড়ে পড়ে আছে ছোঁড়া একখানা মাদুরের উপর, বড় ঘরের দাওয়ায় টুংরাই মাঝির একটু একটু নাক ডাকছে ।

উঠান বেয়ে পা টিপে টিপে আবার ফিরে এলো টুংরা, নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো সে তার ছোট ঘরটার সামনে। দরজার পাশা দুটো ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়লো টুংরা ঘরের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলে আবার দরজাটা। ঘরে ঢুকেই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিলে টুংরা, পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা সে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নিলে। আচমকা যেন টুংরা একটু চমকে উঠলো, টুংরা কি ভয় পাচ্ছে? না—না—ভয় ত সে পাচ্ছে না, ভয় পেলো যে চলবে না টুংরার। ঘরের মধ্যে আলো জলে উঠতেই দেওয়ালে টাঙ্গানো কাঁড় ধনুক গুলোর উপর নজর পড়লো টুংরার, মুহূর্তের জন্ত সে কি যেন একটু ভেবে নিলে, চোখদুটো ওর জলে উঠলো। ছোট বড় মাঝারি তিনটে ধনুক, লোহার গজালে আটকানো গোটা পাঁচেক কাঁড়ভরতি বাঁশের চোঙা পাশাপাশি দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। বাঁশের চোঙার পাশে ঝকঝকে এক থানা ঝালদার টাঙ্গি, বাঘ মেরে টুংরা এই টাঙ্গি বখশিশ পেয়েছে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। গোটা তিনেক বহনও ঠেসানো আছে একধারে ঘরের এক কোণে। তীরন্দাজ টুংরা মাঝির শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম এই ঘরেই সে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, এ ঘরখানা তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্ত, এই তার অস্ত্রশালা। চোঙা থেকে বেশ ধারালো দেখে তীর এবং বাছাই ক'রে নিলে টুংরা, শান পাথরে ঘষে ঘষে ফলাটা আর একটু চকচকে ক'রে নিলে, তীরের ডগাটা হয়ে উঠলো ছুঁচের মত সরু। এইবার ঠিক হয়েছে, এই আজ পারবে টুংরার মনের আশা মেটাতে।

তীরটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে হাতের কাছেই রেখে দিলে টুংরা। তারপর সে কাঠের একটা ভাঙ্গা বাস্ক থেকে বের করলে

ছোট মত একটা আয়না। বাজের ডালার উপর কেরোসিনের আলোটা একপাশে নামিয়ে রেখে আয়নার পিছন দিকে একটা ঠেকা দিয়ে আয়নাটাকে খাড়া ক'রে দিলে টুংরা বাজের ঠিক মাঝখানটায়। আয়নার সামনে বসে বসে নিজের মুখখানা একবার ভালো ক'রে দেখে নিলে টুংরা। একমাথা বাঁকড়া চুল, চুলগুলোতে ভাল ক'রে চিকনি পড়েনি আজ ক'দিন থেকে, টুংরার মুখ খানা তার নিজের চোখেই যেন শুকনো ঠেকছে, চেহারা খানা হয়ে উঠেছে ঝড়ো কাকের মত। জল্ জল্ ক'রে জলছে টুংরার চোখ দুটো, আয়নার মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। টুংরার তালিম করা শিকারী চোখ, জ্বলে শিকার করবার সময় ঠিক এই ভাবেই জল্ জল্ ক'রে জলতে থাকে বাঘের চোখের মত, দৃষ্টি তার তীরের মতই তীক্ষ্ণ। এই চোখ মাহুঘের কত কাজেই না লাগে, চোখ ঘর নাই লোক বলে তাকে অন্ধ। অন্ধরা ত কাঁড় দেখুক চালাতে পারে না? কাঁড় দেখুক ওরা চালাবে কেমন ক'রে, চোখে দেখতে পেলো ত! আদপে যে ওরা দেখতেই পায় না,—কি সাংঘাতিক!

আয়নার সামনে মুখ রেখে নিজের চোখদুটোকে আর একবার দেখে নিলে টুংরা, চোখ তার ঠিকই আছে। হঠাৎ কি মনে ক'রে ধীরে ধীরে চোখ দুটো একবার বুজে ফেললে টুংরা; অন্ধকার—চন্দিকে শুধু ঘুরঘুটি অন্ধকার। জল্ জল্ ক'রে আলো জলছে টুংরার সামনে, এক ফোঁটা আলো কিন্তু চোখ বুজে সে দেখতে পাচ্ছে না, সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা। টুংরার মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন সে ডুব গেছে একটা অন্ধকার কুয়ার মধ্যে, টুংরাকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে টুংরা যেন হাঁপিয়ে উঠলো, অন্ধলোকগুলো দিনরাত এই অন্ধকার কুয়ার মধ্যে ডুব ঘেরে এইভাবে দিনের পর

দিন বেঁচে থাকে কেমন ক'রে, আশ্চর্য্য ! টুংরা আবার তাড়াতাড়ি চোখ মিলে তাকালো, আঃ কি আরাম, এইত সে দিবিয় আবার দেখতে পাচ্ছে। অন্ধের চেয়ে কানা কিন্তু ঢের ভালো, কানা লোকগুলো একটা চোখে তবু দেখতে পায়, দেখতে হয়ত ভালই পায়, কাজকর্ম কোন কিছুই আটকায় না তাদের।

ডান হাতের চোটা দিয়ে নিজের ডান চোখটা হঠাৎ চেপে ধরলে টুংরা, চোখটা সে একেবারে বন্ধ ক'রে দিলে। এরি নাম কানা, একটা চোখ না থাকলেই কানা ; কিন্তু একটা চোখ বন্ধ করেও সব কিছুই ত দেখতে পাচ্ছে টুংরা, তবে আর ক্ষতিটা কি ? কোন ক্ষতি নাই, এতেই টুংরার কাজ চলে যাবে। লোকে বলবে কানা—তা বলুক, লোকের কথা গ্রাহ্য করে না টুংরা। ঢুলালীর জন্তে চোখ যদি একটা উপড়ে ফেলতে হয় টুংরাকে, সেটা কি তার পক্ষে খুবই একটা কঠিন কাজ হবে ? কঠিন হয়ত হবে একটু, কিন্তু উপায় নাই, টুংরাই মাঝি যে ঢুলালীর জন্তে কানা ছেলেই চায়। ভেবে আর লাভ নাই কোন, ঢুলালীকে পেতে হলে এ ক্ষতিটুকু টুংরাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে, টুংরা সে জগু প্রস্তুত।

ডান-হাতি পূবধারের দেওয়ালে ঠেসানো ঝক ঝকে তীরটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে টুংরা। আয়নার সামনে মুখ রেখে ডান চোখের মনিটাকে লক্ষ্য ক'রে তীরের ডগাটা সে চোখের কাছে এঁয়ে ধরলে। টাটকা শানধরানো তীরের ফলা ঝক ঝক ক'রে উঠলো লক্ষের আলো লেগে, ছুঁচুলো ওর ডগাটা যেন লক লক করছে সাপের জিভের মত। এই তীর দিয়ে কত জানোয়ারকেই না ঘায়েল ক'রে দিয়েছে টুংরা, বিঙেফুলি বাঘ পর্য্যন্ত সে সাবাড় ক'রে দিয়েছে একটি তীরেই। আজ কিন্তু বাঘ নয়, ভালুক নয়, বনবরা বা শামকল পাখী নয়, টুংরার আজ

শিকারের লক্ষ্য তার নিজেরি একটা চোখ। পারবে না টুংরা জোর ক'রে এই তীরটা চোখে বসিয়ে দিতে? পারবে, এটুকু যে তাকে পারতেই হবে। টুংরার সামনে হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়ালো না? কার যেন ছায়া পড়লো সামনের দেওয়ালে,—কে ও? টুংরার চোখের সামনে কার ও ছায়ামূর্তি? ও যে দুলালী, দুলালী যেন টুংরার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে; কি মিষ্টি তার হাসি, টুংরা যে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাকে; টুংরার দিকে এক দৃষ্টে করুণ ভাবে চেয়ে আছে দুলালী। কি সে চায় আজ টুংরার কাছে? টুংরার এই চোখটা? তাই দেবে, দুলালীকে আজ খালি হাতে ফেরাবে না টুংরা, কোনমতেই না।

তীরটাকে হুঁহাত দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ডগাটা তার চোখের সামনে উঁচিয়ে ধরলে টুংরা,—চোখটা তার বুজ্জ গেল কেন হঠাৎ? টুংরার কি হাত কাপছে? না—না—হাত ত তার কাপেনি, হাত টুংরার কাপবেনা।

আয়নার দিকে লক্ষ্য রেখে দেহ মনের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ভান চোখের মনির উপর তীরটাকে হঠাৎ ঘ্যাচ ক'রে বসিয়ে দিলে টুংরা, ফলাটা প্রায় আধখানা দেধিয়ে গেল চোখের মধ্যে। তীরটা টেনে তুলতেই ফিং দিয়ে রক্ত ছুটলো, ভ্রনহাত দিয়ে চোখটাকে পেপে ধরলে টুংরা, হঠাৎ সে ভয় পেয়ে যেন আঁতকে উঠলো নিজের মনেই। খেয়ালের কোঁকে হঠাৎ আজ একি কাণ্ড ক'রে বসলো টুংরা! কাজটা কি বেশ ভাল হলো? টুংরার মন সায় দিয়ে বললে,—ঠিক হয়েছে। কিন্তু একি, রক্ত যে আর কোনমতেই বন্ধ হতে চায় না। মেটে ঘরের শুকনো মাটি ভিজ্জ গেল টুংরার চোখের রক্তে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে যেকের উপর লুটিয়ে পড়লো টুংরা। টুংরা কি

সত্যি সত্যি কান্না হয়ে গেল ? তা হয়ত গেল, তা যাক—তার জন্ত কোন আপসোস নাই টুংরার, দুলালীর জন্ত সে কি না করতে পারে। চোখের জ্বালা কিন্তু ক্রমশই বেড়ে চললো, এ যে আর কোনমতেই সহ করতে পারছে না টুংরা। মেঝের উপর পড়ে পড়ে ছটকট করতে লাগলো টুংরা, হাত বাড়িয়ে কোন রকমে দরজাটা খুলে বার দিকে সে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগলো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না টুংরা, হাত পা গুলো থর থর ক'রে কাঁপছে, ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে টুংরা আবার দরজার উপর মুখ খুবড়ে সেই খানেই গড়িয়ে পড়লো। চৌকাঠের উপর মাথা রেখে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে টুংরা হঠাৎ জোর গলায় চীৎকার করে উঠলো,—গড়ম বাবা—গড়ম বাবা !

টুয়াই মাঝিকে জাগাতেই হবে, সে এসে একবার দেখুক টুংরা মাঝি নিজের হাতে গোথ একটা উপড়ে ফেলেছে, কান্না ছেলে যে তার দরকার। টুংরা প্রাণপণ শক্তিতে জোর গলায় আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—গড়ম বাবা—গড়ম বাবা !

টুয়াই মাঝির ঘুম ভেঙ্গে গেল আচম্বিতে, কে যেন কাকে ডাকছে। টুংরার গলা না ? টুয়াই মাঝি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। উঠানের শুদিক থেকে কি রকম যেন একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। টুংরার ঘরে আলো জ্বলছে না ? আবার সেই গোঙানির শব্দ। টুয়াই মাঝি জোর গলায় একটা হাঁক দিলে,—খাদী —খাদী !

টুয়াই মাঝি হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারলে না, তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়ালো, ছুটতে ছুটতে টুংরার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়তেই বুকটা তার ছুর ছুর ক'রে কেঁপে উঠলো হঠাৎ ; দরজার মাঝখানটায় মুখ খুবড়ে পড়ে আছে টুংরা, চৌকাঠের বার দিকে মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে। ঘরের ভিতর থেকে লম্ফের আলোটা তাড়াতাড়ি বাইরে

এনে এদিক ওদিক একটু দেখে নিলে টুয়াই মাঝি। মেঝের উপর রক্তের ছড়াছড়ি, রক্ত মাথানো ঝকঝকে তীর একটা দরজার পাশে পড়ে রয়েছে, টুংরার মুখ চোখ ভেসে গেছে রক্তে। টুয়াই মাঝি ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো, এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! ধপ্ ক'রে সেই খানেই বসে পড়লো টুয়াই মাঝি, টুংরার মাথাটা কোলের উপর তুলে ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে সে ডাকতে লাগলো,—টুংরা—টুংরা!

সাদা শব্দ পাওয়া গেল না কিছু মাত্রই। টুংরার ডান চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। আলোটা টুংরার মুখের সামনে তুলে ধরে চোখের পাতাটা তার একটু খানি ফাঁক ক'রে দিতেই গল্ গল্ ক'রে আরও খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। টুয়াই মাঝি একটু লক্ষ্য ক'রে চেয়ে দেখলে টুংরার চোখের মধ্যে গর্ত হয়ে গেছে অনেক খানা। টুংরার অবস্থা দেখে টুয়াই মাঝি আঁতকে উঠলো, জোর গলায় সে ডাক দিলে আবার,—খাদী—খাদী!

টেকি-শাল থেকে সাদা দিলে খাদী মেঝেন। টুয়াই মাঝি ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—এক ঘটি জল আর একটা পাখা, শিগগীর নিয়ে আয়—খুব শিগগীর।

তারপর সে টুংরার কানের কাছে মুখ রেখে আকুলকণ্ঠে ডাকতে লাগলো আবার,—টুংরা—টুংরা!

টুংরার চৈতন্যের লেশমাত্র নাই, বহুক্ষণ আগেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

ছোট্ট একটি কুঁড়ে। রামপুর সাঁওতাল-পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে প্রকাণ্ড যে মহলের বাগানটা সরাসরি প্রায় কান্দরের ধারে গিয়ে ঠেকেছে, সেই বাগানের শেষ প্রান্তে ফাঁকা ময়দানের উপর কুঁড়ে একখানা বাঁধা হয়েছে কান্দরের ঠিক তীর ঘেঁষে। ছোট্ট এই কান্দর—নিতান্ত অপরিচরিত একটা পার্কৃত্য নদী, ছোট ছোট পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে শ্রোত জোগায় এই পাহাড়ী নদীর বুকে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায় কান্দরের জল। বৎসরের বাকি সময়টা কান্দরের বুকে জনে থাকে শুকনো বালির স্তূপ, কান্দর থেকে জল পাবার দরকার হলে উপরের শুকনো বালিগুলো সরিয়ে দিয়ে একটু খানি খুঁড়ে নিতে হয়। রামপুর গাঁ ছেড়ে মহল বাগান পার হয়ে এসে নির্জন এই কান্দরের ধারে দুলালীর জন্ম কুঁড়ে একখানা তোলা হয়েছে, লোকালয়ের সঙ্গে আজ আর তার কোন সম্পর্ক নাই, সমাজ থেকে সে বিতাড়িত। সর্দার রাবণ মাঝি চেয়েছিলো দুলালীকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে, যেখান থেকে দুলালীর বার্ষটুকু পর্যন্ত তার কানে এসে না পৌঁছয়। সমাজ কর্তারা কিন্তু রাবণ মাঝির এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি, দুলালীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে দশ জনের চোখের সামনে থেকে। তাই ইচ্ছা ক'রেই গ্রামের এক প্রান্তে জঙ্গলের ধারে একদম ফাঁকার মধ্যে দুলালীর বসবাসের জন্ম কুঁড়ে ঘর একখানা তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট ওই কান্দরের ধারে। সমাজের বিধি বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে, সমাজের মুখে চুন কালি দিয়ে যে দুচারিনি এমন ভাবে কুলত্যাগ করে



অনায়াসে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে ; সাঁওতালী সমাজ তাকে কমা করে না।

পাথরভি কলিয়ারি থেকে দুলালীকে ধরে আনার পর জোর ক'রে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত এক মুলোর সঙ্গে। বিয়ের আগে যেয়েদের চরিত্র স্থলন সাঁওতালী সমাজে ভয়ানক একটা গুরুতর অপরাধ, এ অপরাধের সামাজিক শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। তাই সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী বিকলাঙ্গ ছেলে একটা যোগাড় করে নিতে হয়েছে দুলালীর জন্ম, অনেক খোজাখুঁজির পর টুয়াই মাঝি শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে এসেছে এক বাতিকগ্রস্ত বিয়ে-পাগলা মুলোকে ; বাধ্য করা হয়েছে দুলালীকে কুংসিং রোগগ্রস্ত পল্লু নাচার ওই মুলোর গলায় মালা দিতে। এই তার শাস্তি, জীবন্ত ওই বোঝার ভার আজীবন তাকে বয়ে যেতে হবে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, এখন থেকে মুলোকে নিজেই ঘর করতে হবে তাকে সারাজীবন ধরে ; মুলো মাঝি তার লাঙা-করা স্বামী।

টুয়াই মাঝির এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাবণ মাঝি কোনমতেই রাজি হতে পারেনি, প্রথম দিকটার মুলোর চেহারা দেখে সে আঁতকে উঠছিলো ভয়ে। কি কদর্য চেহারা ওই মুলো মাঝির, হাতের আঙ্গুলগুলো তার কুষ্ঠ রোগে কয়ে গেছে একেবারেই, আঙ্গুলের ছিন্ন নাত্র নাই। ডানপায়ের ডগায় পুরু ক'রে খানিকটা তাকড়া জড়ানো, বাঁ পায়েও গোটাটিনেক আঙ্গুল প্রায় নাই বললেই হয়। নাকটা মুলোর ধ্যাবড়া হয়ে গেছে কাশব্যাদির চাপে, চোঁট দুটো হয়ে উঠেছে অসম্ভব পুরু, বিধাতার ক্রুদ্ধ অভিশাপ সর্বাঙ্গে যেন তার চিত্তিত হয়ে ফুটে উঠেছে দূষিত চামড়ার আবরণ ভেদ ক'রে রক্তমুখী রেখায় রেখায়। রাবণ মাঝি হাতজোড় ক'রে অমরোধ করেছিলো সমাজ চাইদের কাছে মুলোর মত ছেলের হাতে যেন দুলালীকে

তুলে দেওয়া না হয়, বড়জোর একটা কানা কিম্বা খোঁড়া কিম্বা,—কিন্তু কোন আপত্তিই শেষ পর্যন্ত টেকলো না রাবণ মাঝির, হুলোর সঙ্গেই দুলালীর বিয়ে তাকে দিতে হলো। রাবণ মাঝির বুকখানা পাথর হয়ে গেছে, এও তাকে আজ সয়ে নিতে হজ্ঞো, সয়ে হয়ত নিতে হবে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু। সদ্ধার রাবণ মাঝি নিজের যে একজন সমাজের বিধানকর্তা, সমাজের মঙ্গলের জন্য কঠোর না হয়ে তার উপায় নাই। সমাজের এ বিধান যেনে নিতে রাবণ মাঝির বুকটা যেন ভেঙ্গে চূরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু উপায় নাই,—কোন উপায় নাই। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস জোর করে তাকে বৃকের মধ্যে চেপে রাখতে হয়েছে, চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে রাবণ মাঝির কর্তব্যের প্রচণ্ড প্রদাহে। বৃক টুয়াই মাঝির কাছে প্রতিশ্রুতি সে ভঙ্গ করেনি, বিষ্ণু সনাত্তপতিদের কঠোর বিধান মাথা পেতে গ্রহণ করেছে রাবণ মাঝি, সামাজিক বিধানের খোঁটায় নির্মম ভাবে বলি দিয়েছে সে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে। একটা মাত্র মেয়ে, বানের জলে ভেসে গেল সেও। তা যাক, মনে মনে সাস্থনা একটা খুঁজে নিয়েছে রাবণ মাঝি,—দুলালী বলে মেয়ে তার একটা ছিলো, আজ কিন্তু সে বেঁচে নাই, রাবণ মাঝির কাছে মরে সে একদম ভুত হয়ে গেছে। তা যাক—রাবণ মাঝির কোন দুঃখ নাই, রাবণ মাঝি স্থখ দুঃখের বাইরে।

হুলোকে দেখে দুলালীর সে কি আতঙ্ক, সে কি তার কান্না। এর চেয়ে যে তাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হাত পা বেঁধে ঠেলে দেওয়া অনেক ভালো ছিলো। হুলোর সঙ্গে দুলালীর বিয়ে, এ ও কখনো সম্ভব! বিয়ের নামে সমাজের এ অত্যাচার, শাস্তির নামে সমাজের এ রীতিমত জুলুম। এ জুলুম আজ সহিতে হলো দুলালীকে, আজ যে তার দাঁড়াবার আর এতটুকু জায়গা নাই কোথাও। রাবণ মাঝিও শেষ পর্যন্ত বইতে

পারলে না ছুলালীর বোঝা, বাপের ভিটেয় এতটুকু ঠাই হলো না তার।  
 ছুলালী আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোথায় তার নিরাপদ আশ্রয়।  
 আশ্রয় যে দিয়েছিলো তাকে অন্তরের গভীরতম কোণে একান্তে চুপি  
 চুপি কাছে ডেকে, মন তার ভরে দিয়েছিলো অক্ষরন্ত ভালবাসা দিয়ে,  
 জীবনের সব কিছু পিছনে ফেলে একমাত্র ছুলালীকে সঞ্চল ক'রে  
 স্বেচ্ছায় যে একদিন হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো অন্ধকারের অঁখে  
 দরিয়ায় লহরী বড় ঝঞ্ঝা মাখায় ক'রে, তাকে যে আজ বহুদূরে ফেলে  
 এসেছে ছুলালী। সেই যে তার দুনিয়ার সব থেকে বড় আশ্রয় সে কথা  
 কি ভুলেও একবার ভেবে দেখেছিলো ছুলালী—যেদিন সে পাথরভরি  
 ফাঁকা ধাওড়ায় মোহনকে একা ফেলে রাখণ মাঝির সঙ্গে রাগ ক'রে চলে  
 এসেছিলো! কি ভুলই না করেছে সেদিন ছুলালী। কিন্তু তুল যদি সে  
 একটা করেও থাকে—মোহন তাকে একলাটি এমন ভাবে ছেড়ে দিলে  
 কেন? হোর ক'রে যদি ছুলালীকে সে ধরে রাখতো, কার সাধ্য ছিলো  
 মোহনের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এখন আর  
 সে কথা ভেবে লাভ নাই কোন, ছুলালী জানে মোহনকে সে  
 হারায়নি, মোহনকে সে হারাবে না কোন দিনই। ছুলালীর মন বলছে  
 আবার তাকে ছুটে আসতে হবে ছুলালীর কাছে। সামাজিক বিধানের  
 এই নাগপাশ থেকে মুক্তি যে ছুলালীকে পেতেই হবে। সমাজের এ  
 অত্যাচার চোখবুজে কখনই সহ্য করবে না ছুলালী। মুক্তির উদ্দেশ্যে সে  
 ক'রে নিতে পারতো নিজের জীবন দিয়ে, কিন্তু সুকুরুননিকে সে কার  
 হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে। শুধু মেয়েটার মুখ চেয়ে সব কিছু আজ  
 সয়ে নিতে হলো ছুলালীকে। মোহন যদি ফিরে আসে কোনদিন  
 এ মেয়ের ভার তারই হাতে তুলে দেবে ছুলালী। মোহনের জীবনে  
 ছুলালীর প্রয়োজন যদি শেষ হয়েও থাকে তাতেও ছুলালীর আপসোস

নাই কোন, স্থূরমনি কে মোহনের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে  
 নিশ্চিত। তারপর সে ভেবে চিন্তে নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা একটা ক'রে  
 নিতে পারবে, সামাজিক বিধানের বেড়া জালে ঘিরে কার সাধ্য  
 দুলালীকে আটকে রাখে সে দিন। হুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ কি তার, কিছু  
 মাত্র না; সমাজের মাতব্বররা জোর ক'রে যে যা বলে বলুক, দুলালী  
 জানে হুলো মাঝি তার কেউ নয়। হুলোর সঙ্গে জোর ক'রে দুলালীর  
 বিয়ে দেওয়া—এ শুধু দুলালীর বাইরেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা,  
 দুলালীর কাছে কতটুকু তার মূল্য। হুলোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্বীকার  
 ক'রে না দুলালী, দুলালীর চোখে নিতান্তই সে দয়ার পাত্র, এর বেশি  
 কিছু নয়। অবস্থার চাপে পড়ে হুলোর বোঝা আজ ঘাড় পেতে নিতে  
 হয়েছে দুলালীকে। রাবণ মাঝি পর্যাস্ত দুলালীর সঙ্গে যে এতখানা  
 শত্রুতা করবে একথা কোনদিন ভবতে পারেনি দুলালী। দুলালীর  
 জীবনে আজ মহা এক দুর্ঘোষের কাল রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে সন্দেহ  
 নাই, কিন্তু তবু সহস্র বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা ঠেলে যেমন ক'রে হোক  
 দুলালীকে বেঁচে থাকতে হবে, ধৈর্য্য সে হারাবে না কোনমতেই।  
 সাময়িক একটা ঝোঁকের বশে মোহনকে সে দূরে ফেলে চলে এসেছে,  
 কিন্তু একান্ত উন্মুখ ঘরছাড়া মনখানি তার সব সময় যে পড়ে আছে  
 তারই কাছে। দুলালী জানে সকল অভিমান মন থেকে ঝেড়ে ফেলে  
 মোহনকে একদিন ছুটে আসতে হবে দুলালীর কাছে আসতেই হবে।  
 রাবণ মাঝি বাপ হয়ে যে শত্রুতা করেছে আজ দুলালীর সঙ্গে, দুলালীর  
 মনে চিরদিন তা শেল হয়ে জেগে থাকবে, এ ক্ষত যে মুছবার নয়। রাবণ  
 মাঝি এও আজ পারলে! দুলালীও পারবে, এ যে তার জীবনের মহা  
 এক অগ্নি পরীক্ষা। তাই হোক, হুলো মাঝিকে নিয়েই ঘর সংসার পেতে  
 বসবে দুলালী, হুলোর বোঝা সে প্রাণপণে টেনে যাবে যতদিন পারে।

পাচখানা গাঁয়ের লোকে চোখ মিলে দেখুক—সর্দার রাবণ মাঝির মেয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে ঘর বেঁধেছে কুঠ রোগী এক হুলোর সঙ্গে। এতে যদি সাঁওতাল সর্দার রাবণ মাঝির উচু মাথা আরও থানিকটা উচু হয়ে উঠে উঠুক, দুলালী তাতে বাধা দিতে চায় না। দুলালী জানে মনে প্রাণে সে নিষ্পাপ, এই সান্দানাটুকু সঞ্চল ক'রেই সব কিছু সে সয়ে নিতে পারবে। দেবতার কাছে মনে মনে এইটুকু শুধু প্রার্থনা করে দুলালী—মোহন যেন তাকে ভুল না বোঝে, বাইরের লোকে যে যা বলে বলুক, সব দুঃখ ভুলে যাবে দুলালী—মোহন যদি আবার তাকে তেমনি করে কাছে টেনে নেয়।

সকাল বেলা ভরপুর একপেট পান্ডা ভাত খেয়ে ছাগল চরাতে বেরিয়ে যায় হুলো মাঝি। বন জঙ্গল ডাঙ্গা ডহর ঘুরে ঘুরে সারা দিন সে নিজের মনেই ছাগল চরিয়ে বেড়ায় বাঁশের একটা লাঠি বগলে। কিরবার মুখে কাদরের ডোবায় ছাগলগুলোকে একবার জল দেখিয়ে কুঁড়েয় সে আবার কিরে আসে সন্ধ্যা লাগবার আগেই। এ এক রকম ভালই আছে হুলো, দিন তার কেটে যাচ্ছে বেশ আনন্দেই। গাঁয়ের ভিটের এতকাল সে কি স্থখেই বা ছিলো, না একটা ভাই বন্ধু, না একটা ছেলে পিলে পরিবার, না একটা কিছু। তাপপাতার ভাঙ্গা চালায় পড়ে পড়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও মৌখিক একটা তত্ত্বতলাস করবায় মাগুম ছিলো না কেউ। বেড় কুড়ি প্রায় বয়েস হুলো হুলোর কারো হাতের দুটা রাঁধা ভাত একটি দিনের জন্তও জুটেনি হুলোর ভাগো, বরাবর তাকে নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে হাত পুড়িয়ে খেতে হয়েছে। তাও হয়ত কোনদিন দুটো জুটতো, কোনদিন বা ঢক ঢক ক'রে একঘটি জল খেয়েই দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকতে হতো ফুটো চালায় হেঁড়া একটা তালাই পেতে। লোকটা যে কখন মরছে বা বাঁচছে ভুলেও কখনো উকি মেয়ে একটু খোঁজ নেয়নি কেউ। এমন ভাবে একা একা বেঁচে থাকার মানে

হয় না কোন। মাঝখানে তাই বিয়ের জন্তে একবার চেষ্টা করেছিলো  
 হলো বছর পাঁচসাত আগে, ডানহাতের আঙ্গুলগুলো তার তখনো পর্যন্ত  
 ঠিকই ছিলো বেবাক, বা হাতটা সবে তখন একটু একটু কইতে আরম্ভ  
 করেছে। কনে একটা দেখে শুনে বোগাড় ক'রে ফেলেছিলো হলো,  
 দেখতে শুনে চেহারাটাও তার মন্দ ছিলো না, খালি দোষের মধ্যে চোখ  
 দু'টি তার কানা,—কানা মানে একেবারেই অন্ধ। প্রথম দিকটায় হলো  
 কিন্তু খুব খুঁকেছিলো, কানা কানাই সই, হাত ধয়ে ধরে ঘর সংসারের  
 কাজকর্ম কোন রকমে সে চালিয়ে নিতে পারবে, ফুটো চালায় পড়ে পড়ে  
 সময় অসময় দুটো স্থখ দুঃখের কথা কইবার তবু ত একটা সঙ্গী পাওয়া  
 যাবে। ভেবে চিন্তে কিন্তু কানা মেয়ে বিয়ে করতে শেষ পর্যন্ত সাহস  
 পায়নি হলো, অন্ধের যে অশেষ জালা,—রৈঁধে বেড়ে সে ত পাওয়াতে  
 পারবে না হলো মাঝিকে, নিজের হাতে হলোকেই শেষে খেটে খুটে  
 তিনবেলা সেবা করতে হবে কানা বোয়ের। একে হলো খোড়া লেড়া  
 মাহুব, অষ্ট পহর নিজেকে নিয়েই সামাল সামাল, তার উপর একটা  
 জলজীয়ন্ত কানা মেয়ের বোঝা দিন রাত সে বয়ে বেড়াবে কত। এ হয়  
 না, ভেবে চিন্তে মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত জবাব দিয়ে দেয় হলো। এতে  
 অবশ্য খুব বেশি ক্ষতি হয়নি কানীর : মাস দুইতিন পরে হঠাৎ একদিন  
 নদী পেরোতে গিয়ে ময়ূরাক্ষীর হড়পা বানে বার কয়েক হাবুডুবু খেয়ে  
 কানী দৈবাৎ মারা পড়ে যায়, লাসটা তার পরের দিন নীচের ঘাটে  
 ভেসে উঠেছিলো।

হলো মাঝি তার পরেও আরও কিছুদিন এখান ওখান ঘোরাঘুরি  
 করেছিলো উপযুক্ত একটি কনের ধান্দায়, কিন্তু কোন জায়গাতেই বিশেষ  
 তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি, ভগবানের মার—যে দেখে সেই  
 পিছিয়ে যায়। স্বাস্থ্য কিন্তু মোটের উপর ভালই ছিলো হলের, আর

চেহারা খানাও তার এমন কিছু মন্দ ছিলো না ; ঘোষের মধ্যে শুধু হাত  
 পা গুলো একটু ক্ষয়ে গেছে । তাতে কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ কিছু আটকাই  
 না হুলোর, নিজের হাতেই সব কিছু সে করতে পারে আজো ; গাছে  
 উঠে কাঠ ভাঙতে, নদীর বানে গাঁতার কাটতে বা খাল বিল খানা ডোবার  
 খোলা ভাঙ্গা দিয়ে জল হিঁচে চুনো মাছ ধরতে হুলোর সঙ্গে পাশা দেওয়া  
 যার তার পক্ষে সহজ কথা নয় । টিল ছোঁড়াটাও বরাবর তার অভ্যাস  
 আছে ভাল রকমই । বেশি দিনের কথা নয়—মাস পাঁচ ছয় আগে পাহাড়  
 ধারে ছাগল চরাতে গিয়ে আস্ত একটা বুনো শেয়ালকে একেবারেই শেষ  
 করে দিয়েছিলো হুলো কাঁউ পাথরের টিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে, শেয়ালের মুখ  
 থেকে সেদিন জলজ্যান্ত একটা ছাগলের বাচ্চাকে হুলো ছিনিয়ে নিয়ে  
 আসে । পাহাড়তলির গো-চরে টিল দিয়ে গোধা সাপ আর অজগরের  
 বাচ্চা মারা এক সময় বাতিক ছিলো হুলোর, সে অভ্যাস তার একেবারে  
 উপে যায় নি আজো । ইচ্ছে করলে এই খোঁড়া হাতেই কাঁড়দেহুক পর্য্যন্ত  
 চালাতে পারে হুলো মাঝি, বিদ্যোটা তার পরখ করা আছে । হুলো  
 মাঝির গুণ ছিলো অনেক, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে তারিফ করবার  
 লোক ছিলো না কেউ । নিজের উপরেই সে মাঝে মাঝে অকারণে  
 বিরক্ত হয়ে উঠতো, সব সময়েই যেন খা খা করতো মনের ভিতরটা,  
 দুনিয়ার ভাবগতিক দেখে হুলো একেবারে মূসড়ে পড়েছিলো । ভালুক-  
 পোতার টুয়াই মাঝি হঠাৎ সঙ্গে দুটো লোক নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে  
 একদিন হুলো মাঝিদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির । সন্ধান নিয়ে হুলোকে  
 তারা বের করলে খুঁজে, রামপুরের রাবণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে হুলো  
 মাঝির কিয়ের বিলকুল ঠিকঠাক । হুলো কিন্তু সেদিন বিশ্বাস করতে  
 পারেনি টুয়াই মাঝির কথা, হেসে প্রথমটা উড়িয়ে দিয়েছিলো । কিন্তু  
 শেষ পর্য্যন্ত তাদের নাছোড়বান্দা ভাব বেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে

হলো হুলো মাঝিকে, আসতে হলো তাকে টুয়াই মাঝির সঙ্গে খোঁড়াতে  
 খোঁড়াতে রামপুর পর্যন্ত। তারপর,—তারপর যা হলো হুলো মাঝির  
 পক্ষে নিতান্তই তা আশাতীত; হুলালীর মত হুন্দরী মেয়ে সে হলো  
 কি না হুলো মাঝির বৌ, এমন কথা যে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি  
 হুলো। দোষের মধ্যে মেয়েটা একটু দাগী, বিয়ের আগেই ঘর ছেড়ে  
 সে পালিয়ে ছিলো, মেয়ে হয়েছে একটা। তা হোক, হুলো মাঝি ওসব  
 পরোয়া করে না, তার ভাতজল করবার যে একটা লোক জুটলো এই  
 তার পক্ষে যথেষ্ট। হুলালী মেকেন—হুলো মাঝির বৌ, ভাবতেও যেন  
 মনটা কেমন হলে উঠে হুলোর, শরীরটা তার আচমকা বেন কাটা দিয়ে  
 উঠে। টুয়াই মাঝির বাহাহুরি আছে, হুলোর জন্তে যেটুকু সে করেছে  
 পর হয়ে পরের জন্তে এতটা কেউ করে না। হুলো মাঝির হিলে  
 একটা ক'রে দিয়েছে টুয়াই মাঝি, হুলোর এখন বরাত।

ছোট একটা পাতার কুঁড়ে। তারি মধ্যে মাথা গুঁজে কোন রকমে  
 হুলালীর দিন কেটে যায়। কুঁড়ের পাশে ছোট মত একটা চালাঘর  
 সে নিজের হাতেই বেঁধে নিয়েছে গোটা কয়েক শালের খুঁটি আর  
 কতকগুলো ডালপালা দিয়ে। কুঁড়েটা তার এত ছোট যে দু'জনের বেশি  
 লোক ধরেনা। কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে আগুড় এঁটে স্কুরমনিকে  
 বুকের কাছে জড়িয়ে নিয়ে রাত্রির বেলা কুঁড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে হুলালী;  
 হুলো মাঝির শোবার ব্যবস্থা ওই চালা ঘরে—কুঁড়ে ঘরের পাশে।  
 চালার একধারে হুলো মাঝির ছাগল রাখবার খোঁয়াড়। নির্জন কাদরের  
 ধারে প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছের নীচে হুলালীর এই কুঁড়েখানা বাঁধা  
 হয়েছে। কাদরের শুকনো বৃক ভরে উঠেছে বর্ষার জলে, ঘোলা জলের  
 একটানা স্রোত তর তর ক'রে বয়ে যাচ্ছে কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে। এপারে  
 হুলালীর কুঁড়ে, ওপারে একটা শাল পিয়ালের বন, কুঁড়ের একেবারে



সামনা সামনি ; লোকে বলে ওটাকে পাতাড়ির জঙ্গল। কাঁদরের খানিক উজানে বনের লাগাও ছোট্ট একটা পাহাড়, পাহাড়ের নীচে বঘা ভোম আর মছলীদের একটা বস্তি। বস্তির চারিদিকে বড় বড় ধান মাঠ, অল্প ধানের চারায় কাঁদরের এপার ওপার মাঠগুলো সব ভরতি। কাঁদরের এ ধারটায় প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে বড় বড় ভুট্টার ক্ষেত, ক্ষেতের লাগাও এক একটা ঘাসের মাচান, কুঁড় ঘরে বসে রাত জেগে পাহারা দেয় জনার ক্ষেতের রক্ষকরা, মাচার উঠে নাখে নাখে কেনেস্তারা টিন বাজায় শেয়াল তাড়াবার জন্ত। ভাতের ভরা বধা, এ সময়টা নানারকম ফসলের মরসুম ; চারিদিকে শুধু মাঠ ভরতি সোনার ফসল, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ।

কুঁড়ে ঘরের লাগাও পড়ো জমির উপর এক টুকরো আনাছের ক্ষেত নিজেব হাতে তৈরি করে নিয়েছে ছালাসী, শাক সবজী ফল মূল যতটুকু এর থেকে পাওয়া যায় ততটুকুই আসান ; সংসারের সকল চাপ যে এখন ছালাসীর উপর, খেটে খুটে যেমন করে হোক নিজেব দৈনন্দিন খরচাটা তাকে চালাতেই হবে। চাষবাসের মরসুম এটা, খেটে খেতে পারলে জন মজুরির অভাব নাই। সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় ছালাসী মেয়েটাকে কোলে ক'রে, টুকরো এককালি কাপড় জ্ঞানো পান্ডাভাতের জামবাটি হাতে ঝুলিয়ে। সারাদিন সে গৃহস্থদের ধান ক্ষেতে চাষের কাজে বেগুরা খাটে, সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ী ফিরে আসে কাপড়ের ফালিটায় ক'রে সের খানেক চাল বেঁধে নিয়ে। মুন্সি কামিনদের মজুরি বাবত পয়সা দেওয়ার রেওয়াজটা এখানে কম, সাধারণতঃ চাল ধান দিয়েই মজুর খাটানো হয় এ অঞ্চলে। ছালাসী গিয়ে অগ্রাগ্র কামিনদের সঙ্গে কোনদিন বা ধান নাঠে আফর মারে, কোনদিন বা কাদা ভুঁইয়ে

গুঁড়ি বেয়ে ধান পোতে, কোনদিন বা এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বড়ান  
ধানের জোল জমিতে নিড়ান দেয়।

সন্ধ্যার আগে বাড়ী কিরে দোকান থেকে তেল মশলা সওদাপাতি  
কিছু সংগ্রহ ক'রে এনে কুঁড়ের সামনে কাঠের উলুনে ভাত চাপিয়ে  
দেয় ঢুলালী, মাটির একটা হাঁড়ি ক'রে। দিন-মজুরির উপার্জন তার  
সামান্যই, সেই সঙ্গে বাড়ীর দুটো শাকপাতা এটা সেটা মিলিয়ে  
তিনটে প্রাণীর সংস্থান তাকে ওই থেকেই কোন রকমে ক'রে নিতে  
হয়। তাতেও ঢুলালীর দুঃখু নাই, দিন কোন রকমে কেটে যায়  
তার, কিন্তু গাঁ বস্তু ডি-ডিহেলী ঘরবাড়ী ছেড়ে নির্জন এই কাঁদরের  
ধারে ফাঁকা কুঁড়ের বাস করতে ঢুলালীর মন যেন এক এক সময়  
হাঁপিয়ে উঠে, সন্ধ্যার পর রীতিমত ভয় করে ঢুলালীর, শেয়ালের ডাক  
শুনে বুকটা তার ছম্ ছম্ ক'রে উঠে, মাঝে মাঝে হেঁড়োল আর বন-  
শূরোরও নাকি দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় কাঁদরের ধারে, ভূট্টাশ্বেতের  
আশে পাশে। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেরে সকাল সকাল শুয়ে  
পড়ে ঢুলালী কুঁড়েঘরে আগল এঁটে। কালো মেঘে আকাশ যখন  
ছেয়ে যায়, ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে দুপুর রাতে, গুড় গুড় শব্দে মেঘ  
ডাকতে থাকে, ঢুলালী তখন কুঁড়ের মধ্যে চুপচাপ নিঝুম ঘেরে পড়ে  
থাকে চোখ কান বৃজে; ভয় গেলে সে স্বকুরমনিকে জড়িয়ে ধরে  
বৃকের মধ্যে। কুঁড়ের পাশে চালাঘরে অঘোরে নাক ডাকতে থাকে  
মুলো নাকির। মাথার উপর শিমুলগাছের ডগা থেকে শকুনের বাচ্চাগুলো  
মাঝে মাঝে ডান ঝাপটায়, কুঁড়ের বাইরে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে  
থাকে আঁধারবুড়ীর ঝাঁপি খোলা বিরাট একটা অজগরের নিঃশ্বাসের  
মত। কুঁড়ের মধ্যে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় কত স্বপ্ন দেখে ঢুলালী, মাঝে  
মাঝে সে নিজের মনেই চমকে উঠে দুঃস্বপ্ন দেখে।

দুলালীর সব চেয়ে দুঃসহ মনে হয় হুলোর সব, তার ক্লেদাক  
 কুংসিত দেহখানার দিকে চেয়ে দুলালীর সারামন বিষিয়ে উঠে তৃণায়,  
 মন তার তিক্ততার ভরে উঠে হুলো যখন খুশির আয়েজে মুখখানা  
 বিকৃত ক'রে হাসতে হাসতে দাঁড়ায় এসে তার সামনে। হুলোর জিব  
 দিয়ে যেন জল সরতে থাকে দুলালীকে দেখে, তাঁটার মত চোখ দুটো  
 তার উৎকট লালসায় জল জল ক'রে জলতে থাকে বুঝু বস্ত্রপত্তর  
 মত। দুলালী ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ায় হুলোর সামনে থেকে, হুলোকে  
 সে জোর ক'রে খেদিয়ে রাখে, কোন সময়ই সে কোনদিক দিয়েই  
 আমল দেয় না তাকে। দুলালী মনে মনে ভাবে কতদিনে নিষ্কৃতি পাবে  
 সে দুর্ব্বহ জীবনের এই দুঃসহ বিড়ম্বনা থেকে। মুক্তি সে পাবে,  
 বার থেকে মুক্তির ডাক তার কানে পৌঁছবে একদিন—এ ভরসা দুলালীর  
 রক্তের কণায় কণায় সব সময় যে জেগে রয়েছে। কিন্তু তবু দুলালীর  
 মন যেন বুঝতে চায় না, এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠে দুলালী; কুঁড়ে  
 থেকে বেরিয়ে কাদরের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে  
 কুরুলিয়া নদীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দুলালী—ছোট্ট এই কাদরটা  
 যেখানে গিয়ে মিশে গেছে কুরুলিয়ার বুকে। কতদিন—কতদিন যে  
 হয়ে গেল—হয়ত বা একযুগ, কুরুলিয়া নদীর ঘাটে জল ভরতে যায়নি  
 দুলালী—আগে যেমন বেলা পড়লে প্রত্যহ সে কলসী ঝাংখে ছুটে  
 যেতো জল ভরবার নেশায়। ও ঘাট যে তার কতকালের চেনা, দুলালীর  
 কলসীর ছাপ আজো হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে ঘাটের পাড়ে, কালো  
 পাথরের বুকে। ওপারের ওই ঘুসকুটার পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় সেই  
 কালোপাথরের চাঁতাল, ও যেন আজ দুলালীর কাছে জীবন্ত একটা  
 স্বপ্ন। পাহাড়ের নীচে নদীর ঠিক কিনারায় মোহনের তীরবেধা সেই  
 নিমগাছ,—গাছটা কি এর মধ্যে আরও খানিকটা বেড়ে উঠেছে?

ভাবতে ভাবতে ছালালীর বিহ্বল দৃষ্টি সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে আরও  
 বহু দূরে। ধূসর রঙের আকাশটা যেখানে গিয়ে মাটি ছুঁয়েছে তারই  
 যেন কাছাকাছি শুষ্ক পীকৃত কালো ধোঁয়া হালকা হাওয়ার ভেলায় চড়ে  
 আকাশ গাঙে যেন ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড মেঘের আকারে। ওগুলো  
 হয়ত অজয় পারের কয়লা খনির ধোঁয়া, চিমনির ধোঁয়া দেখলেই যে  
 চিনতে পারে ছালালী। চরণপুরের খাদটা বুঝি আরও খানিক  
 বাঁয়ে, শেমল্লার ঘাট থেকে বরাবর সড়প চলে গেছে সোজা  
 একেবারে চরণপুরের খাদ পর্য্যন্ত। টমাস সাহেব কি আজো সেখানে  
 চাকরি ক'রে? কে জানে সায়েবটা আজো বেঁচে আছে কি না, অত  
 বেশি মদ খেলে ত মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। মোহনের হাত থেকে খুব  
 সে দিন বেঁচে গেছে সায়েব, আর খানিক হলে মোহন হয়ত ওকে  
 একেবারেই শেষ ক'রে কেলতো। কিন্তু পাথরডির খাদে ঠিক আগে-  
 কার মতই মোহন কি আজো কাজ করছে? কে জানে—খেয়ালী  
 মানুষ, এর মধ্যে সে অল্প কোনদিকে গিয়ে পড়লো কি না তাই বা  
 কে বলতে পারে,—ছালালীর মন কিন্তু ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছে।  
 কে জানে—আরো কতদিন তাকে মোহনের পথ চেয়ে এই ভাবেই  
 কাদরের ধারে কুঁড়ে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, কতদিন—আরো  
 কতদিন, ছালালীর দিন যে আর কাটে না।

ভাবতে ভাবতে ছালালীর মন ভরাক্রান্ত হয়ে উঠে। পাহাড়তলির  
 মহলীরা পূর্বের গায়ে হাটবাজার সেরে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরবার  
 মুখে একসঙ্গে সব হৈ হৈ ক'রে কাদরের জলে গিয়ে নানে। ছালালীর চমক  
 ভেঙ্গে যায়,—বেলা পড়ে গেছে, রান্না বামনা যোগাড় করতে হবে।

সুকুমনি কুঁড়ের সামনে বসে বসে নিজের মনেই খেলা করছে।  
 ছালালী কুঁড়ের বাইরে কাঠের উন্নটটা তাড়াতাড়ি ধরিয়ে ভাতের

হাড়িটা চাপিয়ে দিলে। একটা কানা উঁচু জামবাট ক'রে স্বকুরমনির  
 কতকগুলো গুড়মুড়ি বেড়ে দিয়ে তরকারি কুটতে বসলো ছলানী।  
 ছলানীদের নিজের ক্ষেতে কালি কচু উঠে গেছে এর মধ্যেই, ভাদ্রমাসের  
 এ ক'টা দিন বাদ দিয়ে আশ্বিনের প্রথম দিকে ধলি-কচু উঠবে।  
 পাকা চাবা রাবণ মাঝি। মুন্সি মান্দের সঙ্গে নিয়ে মাঠের কাজে  
 হাড়ভাঙ্গা সে পরিশ্রম করে আজো, দো-ভুঁইয়ে তার কোন ফসলটি  
 বাদ যায় না। ছলানীর না রাবণ মাঝিকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে ঐটা সেটা  
 পাঠিয়ে দেয় ছলানীর কাছে। কতকগুলো কালিকচু, মশু একটা ছাঁচি  
 কুমড়া, সের দুই আড়াই আথের গুড়, আর কয়েক সের হালিভানা  
 চাল ছলানীর না সে দিন কিষ্টু মাঝির বোয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে  
 দিয়েছিলো। কিষ্টু মাঝির বো জনার ক্ষেতে কাজ করতে এসে চুপি  
 চুপি ওগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে ছলানীর কাছে। ছলানী ওসব  
 নিতে চায় না, বাদের সঙ্গে সব সম্পর্কই তার ছিন্ন হয়ে গেছে ইহ  
 জীবনের মত, অবস্থার চাপে পড়ে তাদের কাছ থেকে হাত পেতে  
 কোন সাহায্য নিতে প্রবৃত্তি হয় না ছলানীর। জিনিসগুলো সঙ্গে  
 সঙ্গে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করেছিলো ছলানী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেরত  
 সে আর দিতে পারেনি; ছলানী জানে এতে তার মায়ের বুকেই  
 শেল বিঁধবে। তরকারি কুটতে বসে ঘুরে ফিরে শুধু মায়ের কথাই  
 মনে পড়ছে ছলানীর, মেয়ের সঙ্গে তার দেখা করবার হুকুম নাই,  
 রাবণ মাঝির নিষেধ। এসব কথা মনে হলে বুক ফেটে কাঁদে আসে  
 ছলানীর। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আরও কয়েকটা  
 শুকনো কাঠ সে উত্তনের মুখে ধরে দিলে, উত্তন নিবে ছাই হয়ে  
 গেছে। বহুকষ্টে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনটা সে কোন রকমে আবার জ্বলে  
 ফেললে।

জামবাটি ক'রে মুড়ি খেতে খেতে দুলালীর মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। দুলালী চেয়ে দেখে হলো মাঝির ছাগলগুলো একসঙ্গে সব ছটোপুটি করতে করতে স্কুরমনির বাটির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গুড়মুড়ি খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। দুলালী তাড়াতাড়ি ছাগলগুলোকে ডাকিয়ে নিয়ে চালাঘরের একপাশে খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে বার দিক থেকে আগুড় বন্ধ ক'রে দিলে। হলো মাঝি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে কাঁদরের ধার দিয়ে, সারাদিন ছাগল চরিয়ে এতক্ষণে বাড়ী ফিরছে হলো। দুলালীকে নিজের হাতে ছাগল খোঁয়াড়তে দেখে দূর থেকেই হলো হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো, ছাগলের ঝামেলা সে পারত পক্ষে পোয়াতে দেয় না দুলালীকে।

এই ছাগল ক'টি হলো মাঝির নিজস্ব সম্পত্তি। নিজের বলতে মূল্যবান অস্থাবর বা কিছু তার ছিলো,—অর্থাৎ খান দুইতিন থালা বাটি, দু'একখানা ছেঁড়া কাপড়, কাচ ভাঙ্গা পুরানো একটি ফুটো লণ্ঠন, ছেঁড়া একখানা খেজুর পাতার তালাই, বোয়ান কাঠির তৈরি একটা নাছ-ধরা ঘুঘু, ছোট্ট একটি বাঁশের লাঠি, আর সেই সঙ্গে টাড বাচ্চা মিলিয়ে মুড়-গুন্তি গোটা পাঁচেক ছাগল ;—এগুলো হলো বাড়ী থেকে আসবার দিন সঙ্গে নিয়েই এসেছে, ভিটের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে একেবারেই। হলো মাঝির বরাত ভাল, দুলালীর মত পরিবার পেয়ে বর্ন্তে গেছে হলো। কিন্তু দুলালী যেন কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের, সব সময়ই কেমন যেন একটা গম্ভীর ভাব, হুলোর সঙ্গে বেশ হেসে খেলে কথা কয় না দুলালী। এটা কিন্তু হলো মাঝি ভাল বোঝে না। কে জানে—নতুন নতুন হয়ত এই রকমই হয়, একটু খানি সয়ে রয়ে কোন রকমে টেকে থাকতে পারলে দু'দিন বাদে আবার ঠিক হয়ে যাবে সবই। হলো মাঝি কিন্তু হাল ছাড়ছে না

কোনমতেই, উঠতে বসতে তিনবেলা তাকে খাঁটাপেটা করলেও ছলালীর এই কুঁড়ে ছেড়ে একটি পা-ও সে নড়ছে না আর কোন দিকে। মাঝে মাঝে এক আখটু দাঁত খিঁচুনি, দরকার মত সামান্য ছ' একটা গালি-গালাজ—একসঙ্গে ঘর সংসার করতে হলে ওগুলো প্রায় ঘটেই থাকে, হুলো মাঝি তাকে পরোয়া করে না।

ভাতের হাড়িটা উছন থেকে নামিয়ে কচু-শাক তুলতে গেছে ছলালী কুঁড়ে ঘরের পিছন দিকটায়। স্বকুরমনি গুড়মুড়িগুলো শেষ ক'রে খালি বাটিটা নিয়ে পেলা করছে নিজের মনেই কুঁড়ে ঘরের সামনে। হুলো মাঝি বাশের লাঠিটা চালা ঘরে ঠেসিয়ে দিয়ে টাঁক থেকে ছুটো পেয়ারা বের করে স্বকুরমনির সামনে ধরে বললে,—  
খাবি ?

মেয়েটা হাসতে হাসতে হানাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল হুলোর দিকে, পেয়ারা ছুটো তাড়াতাড়ি স্বকুরমনির হাতে গুঁজে দিলে হুলো, স্বকুরমনি খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাকা পিয়ারায় কামড় দিতে আরম্ভ করলে। ছলালীর এই মেয়েটাকে বেশ লাগে হুলোর, মেয়েটা কি চমৎকার দেখতে, এটা যদি হুলোর নিজের মেয়ে হতো! স্বকুরমনির দিকে চেয়ে চেয়ে হুলোর মনে কেনন ঘেন একটা আমেজ খেলে যায়। তা এ এক রকম নিজের মেয়েই বলতে হবে বৈকি, বড় হলে হুলোকেই ত সে বাবা বলে ডাকবে। হুলো মাঝি মেয়েটার দিক একদৃষ্টে চেয়ে আদর ক'রে ডাক দেয়,—বিটি, এ বিটি!

সাদা দিবার ফুরসৎ নাই স্বকুরমনির, পাকা পিয়ারায় কামড় দিতে দিতে খিল খিল করে মেয়েটা হেসে উঠলো। হুলো মাঝি এদিক ওদিক একটুখানি চেয়ে ঝপ্ ক'রে তুলে নিলে স্বকুরমনিকে একেবারে তার বুকের উপর, খোঁড়া হাতেই মেয়েটাকে ছ' হাত দিয়ে উপর দিকে

তুলে ধরে দোল খাইয়ে আদর করতে লাগলো হুলো, স্কুরমনি হিহি ক'রে হাসতে আরম্ভ করেছে। দুলালী এসে হঠাৎ সামনে দাঁড়াতেই হুলো যেন একটু তটস্থ হয়ে উঠলো। মেয়েটাকে নিয়ে এই ভাবে আদর করতে দেখে দুলালীর মন মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, দুলালী একটু কড়া স্বরে বললে,—তোকে আমি বার বার নিষেধ করেছি না, মেয়েকে আমার কোনদিন তুই কোলে নিবি না !

হুলো একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—ক্ষেতিটা কি—বলি কোলে যদি নিলুমই একবার তাতে এমন ক্ষেতিটা কি।

দুলালী বললে,—ক্ষেতি আছে, যথেষ্ট ক্ষেতি আছে, খবরদার বলছি আজ থেকে তুই মেয়েকে আমার ছুঁস না।

এই বলে দুলালী স্কুরমনির হাত ধরে চড় চড় ক'রে টানতে টানতে হুলোর কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ধপ্ ক'রে মাটির উপর বসিয়ে দিলে। পিয়ারা দুটো স্কুরমনির হাত থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাঁদরের জলে; স্কুরমনি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। হুলো মাঝি একটু চোখ তেড়ে বললে,—ইটা আবার কি রকমটা হলো, মেয়েটাকে মিছেমিছি কাঁদালি কেনে বল দেখি।

দুলালী একটু নাক সিটকে বললে,—ওরে ঘাটের মড়া, তোর হাতের ছোঁয়া জিনিস মেয়েকে আমার দিস না—দিস না—দিস না, এক কথা কত দিন বলবো !

কথায় কথায় হুলোর ব্যাধিগ্রস্ত দেহটাকে ইঙ্গিত ক'রে স্বযোগ পেলেই হুলোর মনে খোঁচা দেয় দুলালী, মনটা হুলোর খিঁচড়ে উঠলো! ভয়ানক। দুলালী যেন সব সময়ই হুলোর কাছ থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে রাখতে চায়, মেয়েটাকে হুলো আদর করতে গেলেই দুলালী



যেন দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে মারতে। এটা কিন্তু ছলোর বেশ ভাল লাগে না, ছলো একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে,—মেয়েটা কি তোর একলার ?

ছলালী একটু চোখ তেড়ে বললে,—আর কার শুনি ?

একটুখানি ভারিকি চালে বলে উঠলো ছলো মাঝি,—কাঠবেটা আর কাঠবিটি—ইকথার তবে অর্থটা কি শুনি। নিজের বেটা নিজের বিটি—কাঠবেটা আর কাঠবিটি—এই ত দুটো কথা, তোর বিটিটা তা হলে ই পক্ষে কে হলো আমার, কাঠবিটি হলো নাই ?

ছলালীর ভিতরটা গুরগুর করতে লাগলো রাগে, কচু শাকের তরকারিটা পোস্তা দিয়ে নাড়তে নাড়তে দাঁত খিঁচিয়ে বললে ছলালী,—বেরো খালতরা—বেরো আমার নামনে থেকে, ডুব দিয়ে এসে পিণ্ডি দুটো গিলবি ত এই বেলা গিলে লে, হাঁড়ি নিয়ে আমি বসে থাকবো না।

পিণ্ডি গেলা ছলো মাঝির অভ্যাস হয়ে গেছে, ভাত ত তাকে খেতেই হবে, কিন্তু—

উত্তনের মধ্যে আগুন জ্বমে গেছে বিস্তর, কাঠ কয়লাগুলো গিস্ গিস্ করছে; ছলো মাঝি একটু স্থর নানিয়ে বললে,—আগুনটা সেন নিবুস না, কাঁ করে আমি এলুম বলে।

ছলালী রান্নাবান্না শেষ ক'রে মেয়েটাকে তেল মাখাতে বসলো। ছলো মাঝি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাকার দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো একটা ভুট্টাক্ষেতে। নট নট শব্দে কতকগুলো ভুট্টা ভেঙ্গে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছলো বেঁধে ফেললে কৌচড়ে। উকি মেরে চারিদিক একবার লক্ষ্য ক'রে দেখে নিলে ছলো—আশে পাশে কেউ কোথাও আছে কি না, তারপর সে তাড়াতাড়ি ভুট্টাক্ষেত থেকে বেরিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো এসে কুঁড়ে ঘরের সামনে। গোটা চারেক ভুট্টা কৌচড় থেকে বেছে নিয়ে উপরকার পাতাগুলো ছাড়িয়ে দুলালীকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো হলো,—দিস ত ই কটা আগুনে ফেলে।

দুলালী একটু রেগে বললে,—ফের তুই চুরি ক'রে পরের ক্ষেতে জনার ভান্ডতে গিয়েছিলি !

হলো একটু ইতস্তত ক'রে বললে,—চুরি ক'রে কি রকম, ক্ষেতে আমি পাহারা দিই না !

দুলালী একটু ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—যার ক্ষেতে পাহারা দিস তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিস ?

হলো মাঝি বিকৃত মুখখানা আর একটুখানি বিকৃত ক'রে বললে,—কি যে তুই বলিস দুলালী, চাইতে গেলে দিতো কখনো এতগুলো ? একটা কি দুটোর বেশি মাথা ঠুকলেও না।

দুলালী গর্জে উঠে বললে,—তাই বলে তুই পরের ক্ষেতে চুরি ক'রে জনার খাবি, অভরপটা হাংলা চোর কোথাকার !

হলো মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—তা আমি খাব, মাঝে মাঝে তু'একটা খাব, তাতে এমন দোষ হয়না কিছু।

হাল ছাড়ানো ভুট্টাগুলো নিজের হাতেই উত্তনের মধ্যে ফেলে দিলে হলো, বাকি গুলো একটা টুকরি ঢাকা দিয়ে রেখে লে চালাঘরের এক পাশে।

চড়বড় শব্দে ভুট্টাগুলো ফুটতে লাগলো উত্তনের মধ্যে, হলো একটা চেল কাঠ দিয়ে ভুট্টাগুলো উটে পান্টে সেকে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। হাতে তার আঙ্গুলের চিহ্নমাত্র নাই, হু'হাতের চেটো দিয়ে কাঠটাকে কোনরকমে চেপে ধরে ভুট্টাগুলো নাড়া দিতে লাগলো

হুলো, কাঠটা কিন্তু বারে বারেই ফস্কে যেতে থাকে ; হুলো একটু করুণ ভাবে ছালালীর দিকে চেয়ে বললে,—দে না একটু ভুট্টাগুলো পুড়িয়ে ।

ছালালী একটা ঝড়ার দিয়ে বললে,—কেবল যদি কোনদিন তুই না বলে পরের ক্ষেতে জনার ভাঙতে যাস—সেদিন কিন্তু লোকজন ডেকে ধরিয়ে দিব আমি ।

এই বলে ছালালী ভুট্টাগুলো পুড়িয়ে লোহার একটা চিমটে দিয়ে ধরে হুলোর সামনে নামিয়ে দিলে একটা শালপাতার উপর । ভুট্টার কামড় দিতে দিতে হুলো একটু রহস্ত ক'রে বললে,—বেশ ত, ভুট্টাচুরির দায়ে দে না একদিন ধরিয়ে, দিন কতক না হয় জেহেল পেটেই আসবো । কোটে গিয়ে তুই সাক্ষী দিবি ত ?

এই বলে সে নিজের মনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো ।

ছালালী একটু মুখ বেকিয়ে বললে,—হি হি ক'বে আবার হাসি দেখ খালভরার, মরণও উ হয় না ।

এবার কিন্তু হুলো মাঝি সত্যি সত্যি চটে উঠলো ভীষণ, মরণ তুলে গাল—সে যে মরণের বাড়ী ; ছালালীর দিকে চেয়ে একটু ভারীগলায় বলে উঠলো হুলো,—আমি মলে খুব খুশী হস তুই, না ?

ছালালী কোন জবাব দিলে না, হুলো মাঝি বলে যেতে লাগলো,—ভেবেছিস আমি মরে গেলে মনের মত আর একটা কাউকে জুটিয়ে নেব ফের তাকে তুই সাঙো করবি ?

ছালালী একটা ধমক দিয়ে বললে,—খবরদার ।

চোখ তেড়ে বলে উঠলো হুলো মাঝি,—ও কথা তুই মনেও ভাবিস না, মরে ভূত হয়ে সে শালার আমি ঘাড় মটকাব—জরুর বলছি ঘাড় মটকাব, এমনি ক'রে দু'হাত দিয়ে ধরে মড় মড় মড়াস—মড় মড় মড়াস—

মুলো মাঝি ঘাড় মটকাবার মত সামনে কাউকে না পেয়ে পোড়া ভুট্টাগুলোকেই হাঁটুর উপর চাপ দিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে লাগলো,—মড় মড় মড়াস—মড় মড় মড়াস—

মুলো মাঝির কাণ্ড দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠলো দুলালীর, হো হো ক'রে সে হেসে উঠলো। দুলালীর হাসি দেখে হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল মুলোর, ঠোট দুটো তার বিকৃত হয়ে উঠলো কান্নার চাপে। এ আবার কি নতুন উপদ্রব, মুলোর দিকে চেয়ে দুলালীর ক্রুতটো কুঁচকে উঠলো আপনা থেকেই। হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের মনেই আদিগোতা ক'রে উঠলো মুলো,—মামুয়ের পরিবার যদি এমনধারা বেবাগা হয় তবে তার জীবনেই ষিক।

দুলালী একটু মুখ বঁকিয়ে বললে,—পরিবার—তোর চোন্দ পুরুষের পরিবার, খালভরা কুঠে কোথাকার। ফের যদি ও কথা মুখে আনিস কোনদিন—ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিব।

এবার কিন্তু মুলো মাঝি ফেটে পড়লো রাগে, দুলালীর সামনে চাই চাই ক'রে বার কয়েক মাথা খুঁড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে বলে উঠলো মুলো,—ঘাট হয়েছে, এই নাক মলছি আর এই কান মলছি, আজ থেকে যদি তোর সঙ্গে আর কথা কই ত আমার নামে কুকুর পুবে রাখিস।

এই বলে মুলো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়লো। হুটাত টুকরো গুলো টান মেরে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাঁদরের জলে, তারপর সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো কাঁদরের ধারে ধারে, উত্তর দিকের হুড়ি পথটা ধরে।

দুলালী পিছন থেকে একটা ডাক দিলে,—চললি কুথা?

মুলো মাঝি বলে উঠলো,—যে দিকে ছুঁচোখ বায়, যেখানে আমার খুশি।

বলতে বলতেই হুলো মাঝি হন্ হন্ ক'রে সরে পড়লো হুলালীর সামনে থেকে। হুলালী থ মেরে গেল হুলো মাঝির তেজ দেখে, হুলো মাঝিও রাগ ক'রে যায়। কিছু যাবে আর সে কোন্ চুলোয়, পেটের জ্বালা উঠলেই একুনি আবার ফিরে এসে পিতলের কানা উচু থালাটা পেতে চূপচাপ বসে পড়বে ফ্যানভাত খেতে বিশ হাত জিব বের ক'রে, এ হুলালীর বেশ জানা আছে।

দেখতে দেখতে বেলা ডুবে গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, লক্ষটা তাড়াতাড়ি জেলে নিয়ে শুবুরনিকে খাওয়াতে বসলো হুলালী। খেয়ে দেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হুলালীর কোলে ঘুমিয়ে পড়লো মেয়েটা, কুঁড়ের মধ্যে শুবুরনিকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে এসে লক্ষ নিবিয়ে চূপচাপ বসে পড়লো হুলালী। হুলোর কিন্তু আর দেখা নাই সেই থেকে।

দেখতে দেখতে বহুক্ষণ কেটে গেল, হুলো কিন্তু ফিরে এলো না; বসে বসে নিজের মনেই ভাবতে লাগলো হুলালী। বর্ষাকাল—অন্ধকার রাত, রাগের মাথায় সত্যি সত্যি কোনদিকে গিয়ে পড়লো নাকি! খোঁড়া নাহুস খানা ডোবার মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকলেও সারারাত আর হুদিস পাওয়া যাবে না। ও সব পারে—ভুলে বিশ্বাস নাই এতটুকু, কোন বিপদ আপদ ঘটলে ভুগতে হবে শেষে হুলালীকেই। নিকট বসে থেকে লাভ নাই, উঠে একটু হুলো মাঝির খোঁজ করা দরকার; আছে হয়ত কাঁদরের ধারে কোথাও ঝোপে ঝাড়ে বসে, ও আপদ কি এত সহজে বিদেয় হয়।

হুলালী দোরের আগুড় টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো উত্তর দিকের সড়ি পথটা ধরে, হুলো মাঝি যে দিক দিয়ে গেছে। রাত হয়েছে একটুখানি, চাঁদটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে পাতলা মেঘের ফাঁকে, পথ ঘাট দেখা যাচ্ছে কোন রকমে আবছা আলো অন্ধকারের

মধ্যে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কানরের ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল ছুলালী, চারিদিক সে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলো খোপে ঝাড়ে কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে হুলো। হুলো কিন্তু ছুলালীর চোখে পড়লো না, পথ ঘাট নিরুন্ম। ছুলালী ধীরে ধীরে ডাক দিতে আরম্ভ করলে,—হুলো—ও হুলো!

কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা জামগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো ছুলালী। জায়গাটা ভয়ানক অন্ধকার, ছুলালীর বুকে যেন ছম্ ছম্ করতে লাগলো, ছুলালী আর একটু দৌর গলায় ডাক দিলে,—হুলো—ও হুলো!

ছুলালীর পিছন দিকে জামগাছের নীচের দিককার একটা ডাল থেকে ঝুপ্ ক'রে কে মাটির উপর লাফিয়ে পড়ে নাকি হুরে হঠাৎ বলে উঠলো,—কাঁও।

আচমকা ভয় পেয়ে চমকে উঠলো ছুলালী, চীৎকার ক'রে সে বলে উঠলো,—কে ?

হুলো মাঝি পিছন দিক থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ছুলালীর বুকে চাই চাই করছে, হুলোর উপর সে খান্সা হয়ে উঠলো ভয়ানক, দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো ছুলালী,—ভয় দেখাবার আর লোক পেলি না আঁটকুড়ো, মরণ কি তোকে ভুলে আছে! তুই মর—তুই মর—তুই মরে যা, হাড়ে আমার বাতাস লাগুক।

আবার সেই মরণ তুলে গাল। ছুলালীর আর কোন কথাই শুনতে চায় না হুলো, এবার হয়ত সত্যি সত্যি মরবার ব্যবস্থাই করতে হবে হুলোকে। হুলো মাঝি মুখে কিছু বললে না আর, জামগাছের গুঁড়িটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তড় তড় ক'রে উঠে চললো উপর দিকে। ছুলালী একেবারে অবাঁক হয়ে গেল হুলো মাঝির গাছে

ওঠা দেখে ! কিন্তু অসময়ে এই রাতির বেলা লাভ কি তার অনর্থক  
এ সব ঝগড়াট ক'রে, লোকটার নেহাত মাথা খারাপ নাকি !  
জানগাছের নীচে থেকে ছুলালী আর একটা ডাক দিলে,—হুলো !

হুলো মাঝি সাড়া দিলে না। ছুলালী একটু লক্ষ্য ক'রে উপর  
দিকে চেয়ে দেখে হুলো গিয়ে চড়ে বসেছে একেবারে জানগাছের  
ডগায়। বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো ছুলালীর, হাত পা কলকে হঠাৎ  
পড়ে গেলে লোকটাকে আর আশ্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ আবার  
কি নতুন উপদ্রব শুরু করলে হুলো।

জানগাছের ডগা থেকে হুলো মাঝি বলে উঠলো,—যদি তা হলে,  
দিই এখান থেকে লক্ষ্য একটা ঝাঁপ ?

কি সৰ্কনাশ, লোকটা শেষে আত্মহত্যা করবে নাকি ! হুলো মাঝির  
কাণ্ড দেখে ছুলালীর বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো ভয়ে।

বগভাল থেকে হুলো মাঝি ছুলালীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে,—  
আমি ম'লে হাড়ে তোরা বাতাস লাগে, না ? দিই তাহলে এখান  
থেকে ঝাঁপ।

ভয়ে ছুলালীর মুখ শুকিয়ে গেল, সত্যি সত্যি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে !  
উপের দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো ছুলালী,—তোরা পায়ে  
পড়ি হুলো, গাছ থেকে তুই নেমে আয়।

হুলো মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—বল্ তবে আর মরো তুলে  
গাল দিবি না।

ছুলালী বললে,—ঘাট হয়েছে, ভালোয় ভালোয় তুই নেমে আয়  
দেখি।

হুলো মাঝি হাত দুই তিন নেমে এসে আর একটা ডালে চেপে  
বসলো, বললে,—পরিবার বলে ডাকলে আর রাগ করবি না ত ?

ঠিক ক'রে বল এই বেলা, নৈলে আজ গাছ থেকে পড়ে তোর ছায়ে  
আত্মঘাতী হব।

হুলালী মুহু একটা ধমক দিয়ে বললে,—নেমে আয়।

হুলো বললে,—উহ, মরণ তুলে আর গাল দিবি না কথা দে, নৈলে  
এই দেখ পড়লুম এবার ঝাঁপিয়ে।

হুলালী একটু বিব্রত হয়ে বললে,—হুলো।

হুলো মাঝি গাছের একটা ডালকে ঝটপট শব্দে নাড়া দিয়ে একটু  
দোল খেয়ে বললে,—কথা তা হলে দিলি ?

হুলালী ভয় পেয়ে বলে উঠলো,—দিলুম।

—মরণ তুলে আর গাল দিবি না ?

—না।

—পরিবার বলে ডাকলে আর রাগ করবি না ?

হুলালী একটু মুখ বেকিয়ে বললে,—না—খালভরা না,—তুই নেমে  
আয় দেখি।

নীচের ডালে পা বাড়িয়ে আর একবার বলে উঠলো হুলো,—  
ঠিক ত ?

হুলালী এবার বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—থাক তবে তুই  
গাছের উপর বসে, চললুম আমি এখান থেকে।

হুলো মাঝি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—এই যে নাথছি।

হুলালী হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো কুঁড়ের দিকে। হুলো মাঝি  
গাছ থেকে নেমে জোর গলায় ডাক দিলে,—হুলালী—হুলালী !

হুলালী আর সাড়া দিলে না, হুলো মাঝি ডানপায়ের জাকড়াটা শক্ত  
ক'রে জড়িয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললো কুঁড়ের দিকে  
মুখ ক'রে।



রাত্তির খাওয়া লাগিয়া শেব ক'রে চুপচাপ কুঁড়ের মধ্যে শুয়ে পড়েছে ছালালী মেয়েটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে। কুঁড়ের লাগাও কাঠাড় দিয়ে ঘেরা চালাঘরের মেঝের উপর ফাঁকার দিকটায় একটা তালাই পেতে শুয়ে আছে হুলো। রাত তখন অনেক, সারাদিন পরিশ্রমের পর নিঃশাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ছালালী। হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ রেখে কে যেন চুপি চুপি ডাক দিচ্ছে,—ছালালী—ও ছালালী !

ঘুমের ঘোরেই আবছা যেন শুনতে পাচ্ছে ছালালী, কিন্তু জেগে উঠে সাড়া দিতে পারছে না, ঘুমে তার চোখ দুটো যেন সঁটে ধরেছে। ছালালীর গায়ের উপর কে যেন হাত রাখলে, আবার সেই ফিস ফিস আওয়াজ,—ছালালী—ও ছালালী।

ছালালীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, ভয় পেয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো,—কে ?

শিয়রের দিকে হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে লক্ষটা ধরিয়ে নিলে ছালালী, চেয়ে দেখে তার বিছানার পাশে চুপচাপ এক ধারে ভূতের মত বসে আছে হুলো, কুঁড়েরের আঙুড়টা খোলা। আপাদ নস্তক জ্বলে উঠলো ছালালীর হুলো মাঝিরক দেখে, ছালালী হঠাৎ গর্জ্জে উঠলো রাগে,—ইখানু এসে চুপচাপ কেনে বসে আছিস হারামজাদা, কার হুকুনে আমার কুঁড়ের এসে চুকেছিস তুই ?

হুলো মাঝি একটা ঢোক গিলে বললে,—বাইরে ভয়ানক গরম করছে কি না—তাই—

দাঁত খিচিয়ে বলে উঠলো ছালালী,—তাই কুঁড়ের মধ্যে একটু হাওয়া খেতে এসেছিলি ! বেরো আঁটকুড়ো বেরো, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

‘ছুলালীর ভাব গতিক দেখে কুঁড়ের মধ্যে আর বসে থাকতে সাহস হলো না হুলোর, ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো সে কুঁড়ে ঘরের বাইরে। ছুলালী আর একটা ধমক দিয়ে বললে,—কের যদি কখনো এমনধারা দেখি—

হুলো একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললে,—মিছে মিছি এত চটখিস কেনে বল দেখি, কি এমন বে-অন্ডায় কাজটা ক’রে ফেলেছি।

জোর গলায় বলে উঠলো ছুলালী,—কের যদি কখনো রাত বেরাত আমার কুঁড়েয় এসে ঢুকিস, সেদিন কিন্ত তোকে আর আমি আশ্ত রাখবো না।

কুঁড়েঘরের আগুড়টা আবার ভিতর থেকে বন্ধ ক’রে দিয়ে খিলটাকে একটা কাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত ক’রে বেঁধে দিলে ছুলালী। হুলো মাঝি চালাঘরের সামনে একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে চুটি টানতে লাগলো চৌ চৌ শব্দে। ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে হুলো যেন একটু মুসড়ে পড়েছে। কানরের ওপার থেকে হঠাৎ কতকগুলো শেয়াল ভেকে উঠলো, রাত্রে বৃষ্টি শেষ প্রহর এটা।

## এগাদেয়া

টুংরা মাঝি বহু কষ্টে সেরে উঠেছে। সরকারী হাসপাতালে গিয়ে ভান চোখটা তাকে একেবারে তুলে ফেলতে হয়েছিলো, ঘা শুকোতে সময় লাগে প্রায় মাসখানেকের উপর। খাদী মেঝেন মাসাধিক কাল টুংরার শিয়রে বসে অক্লান্ত সেবা করেছে। টুংরাই মাঝিকে অসময়ে ধান চাল বিক্রি করে নগদ কিছু টাকা পয়সাও খরচা করতে হয়েছে টুংরার চোখ সারাতে। তার উপর বাজে খরচাও তার কম হয়নি, ঘরে তৈরি সের দুই আড়াই গাওয়া ঘি—সরকারী ডাকতর বাবুর মান, আর হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারকে পান খেতে সের পাঁচেক কচু, গোটা তিনেক ডিংলে, আর ঘটি খানেক আখের গুড়,—ঘাড়ে ক'রে বাসায় তাদের পৌছে দিয়ে এসেছে টুংরাই মাঝি নিজে, চিকিৎসার সে ক্রটি হতে দেয়নি কোন দিক থেকেই। « ছেঁলেটার নেহাত বরাত ভাল, তাই একটা চোখের উপর দিয়েই এ যাত্রা সে কোন রকমে রেহাই পেয়ে গেল। কিন্তু যে রকম তার মতিগতি আর আক্কেল বুদ্ধির দৌড় তাতে কোন ভরসাই আর রাখা যায় না টুংরার উপর, টুংরাই মাঝি ওর আশা ভরসা ছেড়েই দিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরবার মুখে সেই দিনই ভীম মাঝির কাছ থেকে খবর পেয়েছে টুংরা ভালুকপোতার কুলিমুড়ায় এসে, কোথাকার এক মুলো মাঝির সঙ্গে ছালালীর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। মুলো মাঝির সর্কান্দে কুষ্ঠ, হাতপায়ের আঙ্গুল গুলো নাই, ফুলো ফাঁপসা বিকৃত চাবড়ার ঢাকা কদম্বা তার চেহারা খানা দেখলে নাকি বমি আসে।

কি সাংঘাতিক, তার সঙ্গে হলো কিনা ছালালীর বিয়ে। টুয়াই মাঝির এ বড়বন্ধ, টুংরাকে ফাঁকি দিয়ে—দূরে তাকে সরিয়ে রেখে মুলোর সঙ্গে ছালালীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে টুয়াই মাঝি; টুংরা যখন গোথে ঠুলি এঁটে পড়েছিলো হাসপাতালে। রাবণ মাঝির এ শয়তানি, একটা কুঠের হাতে মেয়েটাকে অনায়াসে তুলে দিতে পারলে, অথচ টুংরার কথা একবারও সে ভেবে দেখলে না। টুংরার বিরুদ্ধে বড়বন্ধ করেছে ওরা সকলে মিলে; এও কি আজ টুংরাকে চোখ বুজে সরে যেতে হবে? ছালালীর জন্তে কি না করেছে টুংরা, নিজের হাতে নিজের একটা চোখ-কেই সে তীর দিয়ে উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু কানা ছেলের খোঁজ ত কই পড়লো না, সমাজের তখন দরকার হলো একটা কুঠে। এ সমস্ত কারসাজি টুয়াই মাঝির, ছালালীকে ঘরে আনলে তার বংশের মান বেতো, তাই টুংরার মনের কথা ভাল রকম জেনেও নিজে গিয়ে মুলো মাঝিকে ধরে এনেছে টুয়াই মাঝি, মুলোর হাতেই শেষ পর্যন্ত ওরা ছালালীকে গছিয়ে দিয়েছে। কি চমৎকার বিচার, টুয়াই মাঝির বাহাদুরি আছে। টুংরা কিন্তু আর কোন সম্বন্ধই রাখতে চায় না টুয়াই মাঝির সঙ্গে, টুংরাকে যদি ভিক্ষে মেগে খেতে হয় সেও আচ্ছা, টুয়াই মাঝির খবরদারি মেনে চলা টুংরার পক্ষে আর সম্ভব নয় কোন মতেই।

টুংরার মনটা আজ ক'দিন থেকে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোথাকার এক হাত-পা-বোঁচা মুলো, সে কি না হঠাৎ ছালালীকে বিয়ে করে কোথেকে আজ উড়ে এসে জুড়ে বসলো। কি কদম্বা চেহারা লোকটার, টুংরা সেদিন চমকে উঠেছিলো মুলো মাঝিকে দেখে, দূর থেকে সে লোকটাকে চিনে এসেছে। কাদরের ধারে কুঁড়ে বেঁধে ঘর সংসার, বেশ জন্মিয়ে ফেলেছে মুলো, ফাকা কুঁড়ের ছালালীকে নিয়ে দিন কাটছে বেশ আরামে। কে এই মুলো মাঝি, কোন্ সাহসে ছালালীর

মত মেয়েকে সে বিয়ে করতে আসে। কি তার যোগ্যতা, কিছু মাত্র না। কিন্তু তবু—তবু সে আজ দুলালীর সাদাকরা সোয়ানী, দুলালী আজ মুলো মাঝির পরিবার। কি স্পর্ধা এই মুলোর, টুংরার পক্ষে এ যে একেবারে অসম্ভব; টুংরা মাঝি এ সহিতে পারবে না—কোন মতেই না। দুলালীকে পাবার আশা মন থেকে যদি একেবারে মুছে ফেলতে হয় টুংরাকে তাও হয়ত সে পারে, কিন্তু তার চোখের সামনে মুলোর মত একটা অবাস্তব লোক দুলালীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেশ আরাম ক'রে মনের স্থখে ঘরকন্না করবে,—টুংরা মাঝি বেঁচে থাকতে সেটি হচ্ছে না। মুলো মাঝি আজ টুংরার শত্রু, টুংরা তাকে ছেড়ে কথা কইবে না, বরফার হলে মুলোকে সে একেবারে শেষ করে ফেলবে। টুংরা মাঝির একটা চোখের দাম—সে যে অনেক, মুলোর মত তিনটে লোকের জ্ঞান নিয়েও উত্তল হবে না। খুন ? তা হলে কি মুলো মাঝিকে শেষ পর্যন্ত খুন করবে টুংরা ? ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই টুংরা হঠাৎ চমকে উঠলো। কিন্তু না, ভাববার এতে কিছু নাই, মুলো মাঝিকে যদি খুন করতেও হয় তাতেই বা টুংরার আপত্তি কি। দুলালীকে বাঁচাতে হবে মুলো মাঝির খপ্পর থেকে, সেজন্য টুংরা সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত। টুংরা যদিও বেঁচে আছে অন্ততঃ ততদিন অপর কারো ঠাই নাই দুলালীর জীবনে। মুলো মাঝিকে সরাতেই হবে, সালিসের বিচার—সমাজের বিধান—ও সব টুংরা মানে না, এবার সে নিজের পথ বেছে নেবে নিজে।

রাবণ মাঝি আবছা একটা খবর পেয়েছে মোহন নাকি ফিরে এসেছে কলিয়ারি থেকে। ক'দিন ধরে এই অঞ্চলেই নাকি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোহন, সাহস ক'রে সে বেরুতে পারেনি বাইরে; কোথায়

যে সে লুকিয়ে আছে—কোন খানে তার আড্ডা সে খবরটা কিন্তু সঠিক  
 ভাবে বলতে পারছে না কেউ। রাবণ মাঝি গোপনে কিষ্টু মাঝিকে  
 সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলো ঘুসককাটার, কিন্তু ঘুসককাটার লোক মোহন  
 মাঝির কোন খবরই বলতে পারেনি। গুজব হয়ত সত্য নাও হতে  
 পারে, কিন্তু তবু রাবণ মাঝি একটু সজাগ আছে। চুপি চুপি এসে  
 আবার হয়ত সে ছুলালীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ঘাবার চেষ্টা  
 করতে পারে, অসম্ভব নয়। মোহনকে যদি সত্যি সত্যি কোন দিন আবার  
 দেখতে পাওয়া যায় রামপুর মৌজার ত্রিসীমানার মধ্যে—সেদিন কিন্তু  
 রাবণ মাঝি এমনি তাকে ছেড়ে দেবে না, দুর্ভোগ তার অনিবার্য।  
 মোহন যদি ধরা পড়ে—শত্রু ক’রে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কুকুর লেলিয়ে  
 দেবার ব্যবস্থা করবে রাবণ মাঝি, তার পর তাকে জল বিছুটির চাবুক  
 মারতে মারতে দূর ক’রে দেওয়া হবে রামপুরের সীমা ছাড়িয়ে। যে  
 ক্ষতিটা সে করেছে রাবণ মাঝির সহজে তা ভুলবার নয়। গোপনে  
 গোপনে মোহন মাঝির সন্ধান রাখবার ব্যবস্থা করেছে রাবণ মাঝি,  
 লোকজনদের বলে দেওয়া আছে কাছাকাছি তাকে দেখতে পেলে সঙ্গে  
 সঙ্গে যেন রাবণ মাঝিকে খবর দেওয়া হয়।

সে দিন কিন্তু খাঁটা খবরটাই পাওয়া গেল, মোহন মাঝি ফিরে  
 এসেছে। কান্দরের ওপারটার পাতাড়ির জঙ্গলে ঝাঁকড়া মত একটা  
 ঢাকলতা গাছের নীচে চুপচাপ বসেছিলো মোহন, শালভাঙ্গার মদ দোকান  
 থেকে ফিরবার মুখে রামপুরের চরণ মাঝি দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে,  
 পাশ কাটিয়ে অল্প পথ দিয়ে ঘুরে এসে চুপি চুপি রাবণ মাঝির কাছে  
 সংবাদটা পৌঁছে দিলে চরণ; বেলা তখন পড়ে আসছে। খবরটা শুনে  
 রাবণ মাঝি নিজের মনেই গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—হুম, তারপর সে  
 বীরে ধীরে তাকালো আবার চরণ মাঝির দিকে, বললে,—সুখন মাঝিকে

খবর দে, আর কিছুকে আমার নাম ক'রে বল্ জগন মাঝি আর  
হপনাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে মহল বাগানে গিয়ে দাঁড়াতে; আমি  
আসছি।

চরণ মাঝি দীর্ঘে দীর্ঘে বিদেয় হয়ে গেল। 'রাবণ মাঝি উঠে পড়লো  
হাতের কাজ ফেলে, 'পিঁড়কির' দোর 'দিয়ে' বেরিয়ে হন্ হন্ করে সে  
এগিয়ে চললো পশ্চিম দিকে মুখ করে, গা-বাইরে মহল বাগানে গিয়ে  
জনা হলো সব এক জায়গায়। রাবণ মাঝি গম্ভীর ভাবে বললে,—খবর  
সব শুনলি ত ?

সুখন মাঝি একটু স্বর চড়িয়ে বললে,—শুনলুম সদ্ধার, আমরা ওকে  
একুণি গিয়ে ধরে কেলবো, যেমন ক'রে হোক ওকে ধরতেই হবে।

রাবণ মাঝি অতটো একটু কুণ্ঠিত ক'রে বললে,—ঠিক কথা, যেমন  
ক'রে হোক ধরতেই হবে; চল তা হলে আর দেরি নয়।

মহল বন পিছনে রেখে দুটা ক্ষেতের পাশ দিয়ে কান্দরের ধারে গিয়ে  
উঠলো রাবণ মাঝি লোক গুলোকে সঙ্গে নিয়ে। উত্তর দিকে আরও  
খানিকটা উত্থানে ঢুলালীর কুঁড়ে থানা দূর থেকে রাবণ মাঝির চোখে  
পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে। সামনের ঘাট দিয়ে কান্দর  
পার হয়ে পাতাড়ির বনে ঢুকে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললো সব চরণ  
মাঝির পিছু পিছু। প্রত্যেকের মুখে চোখে চাপা একটা উত্তেজনার  
ভাব। রাবণ মাঝির চোখ দুটো জল্ জল্ ক'রে জলছে। সুখন মাঝি  
দৃঢ় নুষ্ঠিতে চেপে ধরে আছে তার বেউড় বাঁশের লাঠি থানা, হপনা  
মাঝির রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, কিছু মাঝির কোন সাড়া শব্দ নাই;  
চরণ মাঝি ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললো। পিছন দিকে একটু  
খানি ঘুরে ঝোপের আড়াল দিয়ে চুপি চুপি সব হাজির হলো গিয়ে  
ঝাঁকড়া মত সেই চাকলতা গাছটার নীচে, চরণ মাঝি ওই জায়গাতেই

মোহন মাঝিকে দেখে এসেছিলো। মোহন মাঝি কিন্তু নাই সেখানে, আশে পাশে অনেক খোঁজ করা হলো, মোহন কারো চোখে পড়লো না।

রাবণ মাঝি আর একবার বেশ ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে চরণ মাঝিকে,—এই খানেই ঠিক দেখেছিলি ত, ঠিক এই চাকলতা গাছের নীচে ?

চরণ মাঝি সায় দিয়ে বললে,—ই সন্দার, এই খানেই সে বসেছিলো চাকলতা গাছে হেলান দিয়ে, নিজের চোখে দেখে গেছি আমি।

রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত ভাবে বললে,—তা হলে সে গেল কোথায়, খুঁজে তাকে বের করা দরকার।

সুখন মাঝি লাঠিটা একটু মাটির উপর ঝুঁকে বললে,—নিশ্চয়ই সন্দার, খুঁজে তাকে বের করাই দরকার।

সন্দার রাবণ মাঝি সুখনের দিকে চেয়ে বললে,—তুই আর হপনা পাহাড়তলিটা ঘুরে আয় একটু, আমরা ততক্ষণ পাতাড়ির জঙ্গলটা খুঁজে দেখি।

হপনাকে সঙ্গে নিয়ে সুখন মাঝি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল পাহাড় তলির পথ ধরে, পাতাড়ির বনটা এরা পাতি পাতি ক'রে খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দিলে—এমুড়া থেকে ওমুড়া পর্য্যন্ত।

হুলো মাঝি আজ ছাগল চরাতে যায়নি, সারা দিন সে কুঁড়ে আগলে চালাঘরে বসে আছে ঠায়। ক'দিন থেকে মনটা বেশ ভাল নাই হুলোর, শরীরটাও বেশ ভাল যাচ্ছে না, ডান পায়ের ঘাটা দিন দিন যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ছাগলগুলোর গলায় পাগা দিয়ে পাশাপাশি একসঙ্গে বেঁধে দিগ্‌দড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে হুলো। কাদরের ধারে এখন খেলাই ঘাস, চরে একটু খেতে পারলেই হলো; আমপালাও



কতকগুলো ভেঙ্গে রেখেছে হুলো, সন্ধ্যার দিকে ছাগলগুলোর মুখে ধরে দিলেই চলবে। বড় পাঠীটা বাচ্চা দিয়েছে গোটা তিনেক, বাটগুলো ওর সব সময়ই টুল টুল করছে দুখে। দুলালীকে কতদিন কানে কানড়ে বলে দিয়েছে হুলো মাঝি পাঠীটাকে দুয়ে মেয়েটাকে রোজ একটু ক'রে দুধ পাওয়াতে, কিন্তু দুলালী কি হুলোর কথা কানে তুলবে। ওর মন মেজারের হৃদিস পাওয়া ভার, হুলো মাঝির কোন কথাই সে গ্রাহ্য করে না। ও গাঁহের বাউরী মুন্সিগুলোর সঙ্গে মাঠে ঘাটে কাজ করতে দুলালীকে পই পই ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে হুলো। বাউরীগুলো নাকি লোক ভাল নয়, গেরস্তর মাঠে কাজ করতে ওরা নাকি কামিনদের দিকে ইঁ ক'রে সব চেয়ে থাকে, হুলো মাঝি ছাগল চরাতে গিয়ে নিজের কানে শুনে এসেছে বাগাল ছেলদের কাজ থেকে। ঝড়ো বাউরী বলে তাকড়া জোয়ান বাউরীদের একটা বদমাইস ছোঁড়া সেদিন নাকি দুলালীকে চোখ ঘুরিয়ে ইসারা কবেছিলো, নছলীপাড়ার বাগাল ছেলেরা নিজে দেখেছে। দুলালী কিন্তু স্বীকার করে না ওসব কথা, ঝড়ো বাউরীর নাম করতেই দুলালী সেদিন তেড়ে যেন মারতে এলো হুলো মাঝিকে। কে জানে—ঝড়ো বাউরী বলে ছোঁড়াটা যে কে আর কি যে তার সম্বন্ধ দুলালীর সঙ্গে—দুলালীই জানে। বাগাল ছেলদের মধ্যে এক আদটু কানা ঘোঁসা কিন্তু শুনে এসেছে হুলো, দুলালীর নামের সঙ্গে ঝড়ো বাউরীর নাম জড়িয়ে কি যেন সব আলোচনা করে। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে হবে হুলো মাঝিকে, দুলালীর মধ্যে সত্যি সত্যি কোন দ্রবম বেচাল যদি ধরা পড়ে কোন দিন—সেদিন কিন্তু প্রলয় কাণ্ড ক'রে বসবে হুলো, হুলো মাঝিকে জান দিতে হয় সেওভি আচ্ছা। ঝড়ো বাউরীর আওতা থেকে দুলালীকে সরাতেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

পাহাড়তলি খোঁজ ক'রে ফিরে এলো সুখন মাঝি, মোহনের কোন পাক্তা পাওয়া গেল না। পাতাড়ির জঙ্গলেও সে নাই, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হয়েছে। রাবণ মাঝি একটু হতাশ হয়ে বললে,—তাহলে সে পালিয়েছে, দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই হয়ত সরে পড়েছে।

সুখন মাঝি বলে উঠলো,—ধরা তাকে পড়তেই হবে সন্দার, আমাদের চোখ এড়িয়ে কতক্ষণ সে লুকিয়ে বেড়াবে।

কিছু মাঝি একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—কিন্তু সন্দার, আমার যেন কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছে, চরণ মাঝি লোকটাকে ঠিক দেখেছে ত ?

চরণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—খুব ভাল ক'রে দেখেছি আমি, মোহন মাঝি এসে বসেছিলেন ওই চাকলতা গাছের নীচে।

রাবণ মাঝি একটু হেসে বললে,—ভুল ও হয়ত হতে পারে, কিন্তু তবু আমাদের সজাগ থাকতে হবে, দুশমনকে আর দুশমনি করবার এতটুকু স্বযোগ আমরা দিব না।

সুখন মাঝি আর হপন মাঝি একসঙ্গে বলে উঠলো,—কিছুতেই না।

ঈশান কোনে ভয়ানক মেঘ করেছে, হয়ত বা ঝড় উঠবে, বেলাও আর বেশি নাই। সকলে মিলে কাঁদরের পথ ধরে ফিরে চললো আবার বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। রাবণ মাঝি ডান দিকের সোজা পথটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ-হাতি স্ফুড়ি পথটা ধরে বললে,—এই দিক দিয়ে একটু ঘুরে চল দেখি।

সকাল থেকে ছুলালী গেছে বেওরা খাটতে, ফাকা কুঁড়ের মুলো মাঝি আজ একা। দূর থেকে রাশন মাঝিকে লক্ষ্য করেছে মুলো, কাঁদরের ধার দিয়ে একসঙ্গে ওদের হৈ-চৈ ক'রে আসতে দেখে মুলো

যেন একটু ভড়কে গেল। রাবণ মাঝি ভয়ানক লোক, একটি গিনেট  
 তুলো তাকে চিনে নিয়েছে। তুলালীর বিবেচনায় সে কি তার  
 ভয়ানক ঘৃণি, সে কি তার চোখে মুখে উগ্র জলন্ত ভাব; একটি  
 বারের বেশি দ্বিতীয়বার রাবণ মাঝির মুখের দিকে তাকাতে আর  
 সাহস হয়নি তুলোর; রাবণ মাঝিকে দেখলে তুলোর ভয় করে। দূর  
 থেকে রাবণ মাঝিকে সদলবলে আসতে দেখে রাবণ মাঝি কুঁড়ে ঘরের  
 আগুড়টা তাড়াতাড়ি ঠেসিয়ে দিয়ে চটপট গিয়ে দুঃপড়লো একটা  
 ঝোপের মধ্যে। ওরা খানিকটা এগিয়ে না গেলে ঝোপ থেকে আর  
 বেরুচ্ছে না তুলো, তুলো মাঝিকে কেটে ফেললেও না।

কাদর উঠে রাবণ মাঝি বরাবর এগিয়ে চললো তুলালীর কুঁড়ের  
 দিকে মুখ করে। কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালো রাবণ  
 মাঝি, তখন মাঝির দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে সে বলে উঠলো,—ভিতরটা  
 একটু উকি মেরে দেখ দেখি, খোল কুঁড়ের আগুড়টা।

আগুড়টা একপাশে ঠেলে দিয়ে একে একে সব ঢুকে পড়লো কুঁড়ের  
 মধ্যে। ফাকা কুঁড়ে, কেউ কোথাও নাই, সামান্য কয়েকটা জিনিস পর  
 এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। রাবণ মাঝি বার থেকেই একটু উকি  
 দিয়ে দেখে নিলে কুঁড়ের ভিতরটা, তারপর সে গম্ভীরভাবে বলে  
 উঠলো,—ঠিক আছে, বেরিয়ে আয় সব, আগুড়টা আঁকব তেমনি  
 ক'রে বন্ধ ক'রে দে।

রাবণ মাঝি ধীরে ধীরে বিদেহ হয়ে গেল। কাদরের ধারে ধারে  
 এগিয়ে চললো সে বাড়ীর দিকে মুখ করে।

তুলো মাঝি ঝোপের ভিতর থেকে লক্ষ্য করছে ওদের। এতগুলো  
 লোকজন সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ আজ রাবণ মাঝি এদিক দিয়ে এসে পড়লো  
 কেন? কাকে যেন খুঁজছে ওরা, কিছ তুলালীর কুঁড়েটা হঠাৎ তদন্ত

করতে গেল কেন রাবণ মাঝি, বাপারটা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছে না  
মুলো। 'তবে' কি ওরা দুলালীর স্বভাব চরিত্রে কোন সন্দেহ করে?  
অসম্ভব নয়।

বোপ থেকে বেরিয়ে কুঁড়ে ঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো  
মুলো মাঝি। দূর থেকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকগুলোর  
দিকে।

সকাল বেলা গামছার ক'রে দুটো জলখাবার বেঁধে নিয়ে বেওরা  
খাটতে বেরিয়ে গেছে দুলালী, এতক্ষণে সে বাড়ী ফিরছে। দূর থেকে  
রাবণ মাঝিকে সে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু দুলালীর কুঁড়ের এসে হঠাৎ  
আজ ওরা এমন ভাবে হানা দিলে কেন? দুলালী কতখানা স্থগে  
আছে, কি ভাবে তার দিন কাটছে, তাই হয়ত একটু উকি মেয়ে দেপে  
গেল রাবণ মাঝি। কিন্তু কি তার আবশ্যকতা, দুলালীর সঙ্গে  
আর সম্বন্ধ কি রাবণ মাঝির! দুলালীর বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে  
উঠলো। বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে এতখানা শত্রুতা বে কেউ করতে  
পারে—দুলালীর তা জানা ছিলো না।

সুকুরমনিকে কোল থেকে নামিয়ে কুঁড়ের সামনে বসিয়ে দিলে  
দুলালী। মাথার ঝুড়িটা একপাশে নামিয়ে রেখে মুলো মাঝিকে  
লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো,—কিসকে ওরা এসেছিলো এখানে দিয়ে?

মুলো মাঝি একটু মুগ্ধ বৈকিয়ে বললে,—তুঁয়েই জানিস।

কুঁড়ে ঘরের আগুড়টা খুলতে খুলতে দুলালী জিজ্ঞাসা করলে,—  
আমার কুঁড়ের এসে ওরা ঢুকেছিলো কেন?

মুলো মাঝি জবাব দিলে,—কে জানে, কাকে যে ওরা খুঁজছে  
ওরাই জানে,—আমাকে কি বলেছে:

দুলালী একটু আশ্চর্য হয়ে বললে,—খুঁজছে,—কাকে খুঁজছে?

হুলো মাঝি বলে উঠলো,—তা জানি না, তোর এখানে বাইরের লোক কেউ যাওয়া আসা করে কিনা তাই নিয়ে হয়ত কোন রকম ওদের সন্দেহ হয়েছে।

দুলালী হুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক’রে খানিক চেয়ে থেকে বললে,—তার মানে ?

হুলো মাঝি একটু তিরিক্ষিভাবে বলে উঠলো,—কদিন থেকে তোকে বারণ করছি যে ওগাঁয়ের বাউরীগুলোর সঙ্গে অত মেলামেশা করিস না, তা আমার কথা কি কানে তুলবি—ঠেলাটা এখন বোঝ।

দুলালীর মাথাটা হঠাৎ বোঁ ক’রে ঘুরে গেল। তবে কি ওরা দুলালীকে দুশ্চরিত্রা বলে সন্দেহ করে ? কি সাংঘাতিক ! হয়ত ওরা ভেবেছে এই করেই বুঝি দিন চলে দুলালীর, কি ভয়ানক কথা। দুলালীর শিরায় শিরায় যেন আগুনের ফিনকি ছুটে গেল, অপমানের বোঝা ক্রমশই যে ভারী হয়ে উঠছে, এও কি আজ দুলালীকে সহ করতে হবে ?

কুঁড়ে থেকে ধড়মড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো দুলালী। লোকগুলো এখনো বেশি দূর গেতে পারে নি, ভুট্টাক্ষেতের পারে দাঁড়িয়ে কি যেন সব আশ্লেষনা করছে। কে জানে—হয়ত বা আবার কোন্ নতুন ফন্দি আঁটছে ওরা ! দুলালীকে আবার নতুন ক’রে শাস্তি দিতে হবে—তারই হয়ত পরামর্শ চলছে, দুলালী যে আজ ওদের চোখে ভট্টা। দুলালীকে ওরা সন্দেহ করে, কি আশ্চর্য !

রাবণ মাঝি আলপথ দিয়ে এগিয়ে চললো মহল বাগানের দিকে। পিছনে তার স্থপন মাঝি, হপনা, চরণ, কিষ্টু, একসঙ্গে ওরা বাড়ী ফিরছে। দুলালী হঠাৎ কাদরের ধারে ধারে ছুটতে আরম্ভ করলে, রাবণ মাঝির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার, এ সব অত্যাচার চোখ বুজে আর সহ করবে না দুলালী, কোনমতেই সহ করবে না।

ভূট্টাক্ষেতের শেষ প্রান্তে মছলবাগানের লাগাও বাঁওপাথরের ডাক্কাটায় গিয়ে উঠলো ছলালী ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে। কিষ্টু মাঝি পিছন ফিরে চেয়ে ছলালীকে দেখে অবাক হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে জিজ্ঞাসা করলে,—কি হয়েছে ছলালী, অমন ক’রে ছুটছিস বে ?

কিষ্টু মাঝির কথার কোন জবাব দিলে না ছলালী, হন্ হন্ ক’রে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সে রাবণ মাঝির সামনে, রাবণ মাঝির পথ আগলে। হকচকিয়ে উঠলো হঠাৎ সকলেই, রাবণ মাঝি থমকে একটু দাঁড়ালো। ছলালী তাদের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক’রে বলে উঠলো,—আনি জানতে চাই কি জন্তে আমার কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলি তোরা, কোন্ অধিকারে ?

রাবণ মাঝি একটু স্তম্ভিত হলো। যা করে সে ভেবে চিন্তেই ক’রে, যা করেছে সে ভাল বুঝেই করেছে ; তার জন্তে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ছলালীর কাছে ; আশ্চর্য্য ! রাবণ মাঝি কোন জবাব দিলে না হঠাৎ। ছলালী আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো,—কি তোরা মনে করিস আমাকে, এমনি ক’রে দিনের পর দিন পদে পদে আমার অপমান ক’রে যাবি তোরা, আর চোখ বুজে তাই সহ্য করবো আমি ! এ আর আমি সহিবো না।

রাবণ মাঝি একটু চোখ পাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো,—  
হঁসিলাব—এগনো বলছি খুব হঁসিয়ার।

কিষ্টু মাঝি গিয়ে ধীরে ধীরে রাবণ মাঝির হাত ধরে ছলালীর সামনে থেকে সরিয়ে দিলে। রাবণ মাঝির আর প্ররুতি হলো না ছলালীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে, ধীরে ধীরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলে। ছলালী সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝিকে লক্ষ্য ক’রে জোর গলায় বলে উঠলো,—ফের যদি কোনদিন আমার কুঁড়ের গিয়ে হানা দিস

তোরা—সেদিন কিছু আমি পঞ্চ-গেরায়ী সালিশ ডাকবো, দেখবো  
আমি রাবণ নাঝির বিচার তারা করে কি না।

রাবণ নাঝি থমকে একটু দাঁড়ালো, পিছন ফিরে গর্জে খানিক  
ভাকালো সে,—কিছু নাঝি আবার ডাক দিলে,—সুন্দার!

রাবণ নাঝি নিজের মনেই একবার বলে উঠলো,—হুম্। তারপর  
সে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করলে আবার, কিছু নাঝির দিকে  
একটুখানি চেয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো রাবণ নাঝি,—ঠিক আছে চল,  
রাবণ নাঝি ঠিকই আছে।

দুলালীর হুঁচোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে  
পড়লো। ওখানে আর দাঁড়ালো না দুলালী, ক্ষিপ্ত বেগে পা চালিয়ে  
দিলে, ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে ফিরে চললো সে আবার কুঁড়ের  
দিকে। সূর্য্য তখন ডুবে গেছে, ঈশান কোণের কালো মেঘটা ধীরে  
ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশ জুড়ে। শন্ শন্ শব্দে বাড় উঠলো  
হঠাৎ, দুলালী গিরে কুঁড়েঘরে পৌঁছবার আগেই চারিদিক ঘোর ক'রে  
মুঘল ধারে বৃষ্টি নেমে এলো।

হুলো নাঝির মনটা ভয়ানক উসখুস করতে লাগলো। জগন নাঝি  
আজ মদ সাজিয়ে রেখেছে, জনার ক্ষেতের রাখালদের সে আজ মদ  
খওয়াবে, সন্ধ্যার পর কুঁড়ের গিয়ে এক জায়গায় সব জনাবার কথা।  
জগন নাঝি লোক ভালো, ভক্তি ছেদা একটু করে হুলোকে। নাঝে  
নাঝে হুলো গিয়ে জগন নাঝির জনার ক্ষেতে পাহারা দেয়, রাত জেগে  
শেয়াল তাড়ায় বাগানের উপর বসে বলে। জনাবের মরহুম প্রায় শেষ  
হয়ে এলো, গাছগুলো এবার কাটা পড়ে যাবে, তাই ফসল উঠবার আগে  
জগন নাঝির কুঁড়েতে আজ মদ নাংসের একটু আয়োজন করা হয়েছে।

পাশাপাশি জনার ক্ষেতের, জন চার পাঁচ রক্ষকদার জগন মাঝির আঙ্গ  
নিমন্ত্রিত, হুলো মাঝিকেও সন্ধ্যার সময় যেতে বলেছে জগন।

বৃষ্টিটা খুব জোর নেমেছে। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় শব্দে, ঝড়ের  
দোলায় হুলোর চালাঘর থানা কেঁপে কেঁপে উঠছে, প্রকাণ্ড শিমূল গাছটা  
ডালপালা সমেত ধেন হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়বে বলে মনে হচ্ছে।  
মেঘের ভাবগতিক বেশ ভাল বুঝছে না হুলো, ঝড় বৃষ্টি থামবার কোন  
লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। জগন মাঝি হয়ত মদ মাজিয়ে বসে আছে,  
কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে হুলো মাঝি যায় কেমন ক'রে।  
পচুই মদের নেশা হুলোর ভাগ্যে কদাচিৎ জোটে, মদ খেতে পয়সা  
কোথায়। কিন্তু অভ্যাস তার বহুদিনের, মাঝে মাঝে এর ওর কাছ  
থেকে চেয়ে চিন্তে নেশা এক আধটু ক'রে হুলো। জগন মাঝির  
জনার ক্ষেতে শেয়াল তাড়িয়ে মাঝে মাঝে নেশা ভান্টটা চলছে আজকাল  
নন্দ না, কিন্তু সন্ধ্যা থেকে যে রকম দুর্যোগ আরম্ভ হয়েছে—মদের  
মজলিসটা হয়ত বা আজ ভেসেই গেল শেষ পর্যন্ত। মনটা ভয়ানক  
খিঁচড়ে উঠলো হুলোর, ঝড় বৃষ্টি কি আজ আর থামবে না!

কুঁড়ের বাইরে, উত্তরের মধ্যে জল জমে গেছে, শুকনো কাঠগুলোও  
বৃষ্টির জলে ভিজ্জে গেল বেবাক; রান্নাবান্নার জোগাড় আজ আর হয়ে  
উঠবে না। বৃষ্টিটা ধ'রে আসতেই লক্ষটা জেলে ফেললে হুলালী।  
সকাল বেলায় কতকগুলো ভিজ্জে ভাত পড়ে আছে হাড়িতে তাই দিয়েই  
সে কোন রকমে চালিয়ে নেবে আজকের মত। একটা বাটি ক'রে  
কতকগুলো ভাত বেড়ে স্কুরমনিকে খাওয়াতে বসলো হুলালী। দেখতে  
দেখতে বৃষ্টিটা কমে এলো একবারেই, ছিটেফোটা যা পড়ছে তা  
সামান্য। মেঘটা কিন্তু ঘোর ক'রে আছে এখনো, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস  
বইছে সমানে।



হুলো মাঝিকে এবার বেরুতে হবে, দেয়ি ক'রে আর লাড় নাই কোন। একটা মাটির তাঁড় হাতে ক'রে জাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো হুলো, অঙ্ককারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হুলো গিয়ে সে জগন মাঝির কুঁড়েতে। জনার ক্ষেতের রাখালরা তাঁড় নিয়ে সব বসে গেছে হুলো গিয়ে পৌছবার আগেই। জগন মাঝি পচুই মদের ব্যবস্থা করেছে পুরো একটি হাঁড়া, তার সঙ্গে কালদেওয়া মাংসের চাট আর চানড়া পোড়ার চচ্চড়ি। আরোজনের বহর দেখে হুলো মাঝির মনটা যেন নেচে উঠলো, খুশির আমেজে ভরে উঠলো তার ডাব ডাবে চোখ দুটো। জগন মাঝি হুলোকে দেখে বলে উঠলো,—ওই খানেই চুপ চাপ বসে পড় একধারে।

মাটির তাঁড়টা সামনে পেতে কুঁড়ের একপাশে বসে পড়লো হুলো। মদ মাংস আর হৈ-হল্লোড় চলতে লাগলো পুরোদমে। জগন মাঝি হাঁড়া থেকে মদ ঢালতে ঢালতে জটা মাঝির দিকে চেয়ে বললে,—হুলো মাঝির গায়ের দুটো শুনবি না কি ? সিরিং হুলো ভালই করে।

জটা মাঝি খুশি হয়ে বলে উঠলো,—তাই না কি ?

\* জগন মাঝি হুলোর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে,—লাগা দেখি একটা লাগড়ে সিরিং।

হুলো মাঝি চৌ চৌ ক'রে খানিকটা মদ গিলে তাঁড়টা নীচে নামিয়ে রেখে হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো নিজের মনেই। লাগড়ে সিরিং—তা লাগড়ে সিরিং বেশ ভালই জানে হুলো, লাগড়ে সিরিং, দাঁশাই সিরিং, দং সিরিং, সহরুই সিরিং \* বিলকুল তার জানা আছে।

---

\* বিভিন্ন শ্রেণীর সাঁওতালী গান।

হুলো মাঝি দাঁত দিয়ে খানিকটা চামড়াপোড়া ছিড়ে নিয়ে কচ্ কচ্ শব্দে চিবুতে লাগলো, চাটটা যেন দাঁতে ওর বসে গেছে। আরও খানিকটা মদ টেঁসে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ধরলে হুলো একটা লাগুড়ে সিরিং।

হুলো মাঝির গান খুব জনে উঠেছে, জটা মাঝি ঘাড় নেড়ে নেড়ে নাদল বাজাতে লাগলো হুলো মাঝির গানের সঙ্গে। এমন সময় কতকগুলো শেয়াল ভেকে উঠলো হুটাক্ষেতের ওপাশ থেকে। শেয়ালের ডাক শুনেই গানবাজনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। জন দুই তিন তাড়াতাড়ি কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেনেস্তারা বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হুলো মাঝি একটা নাচানের উপর চড়ে জোর গলায় আওয়াজ করতে লাগলো,—হে—লে—লে—লে—লে—হেইয়ো—

নিখুঁত ঘেরে কুঁড়ের মধ্যে পড়ে আছে দুলালী। মেয়েটা তার ঘুমিয়ে পড়েছে বহুক্ষণ আগেই। দুলালীর চোখে ঘুম নাই, আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে নন তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে আজ ভয়ানক দুর্ঘোষ, বাড়ি বৃষ্টি অন্ধকার; দুলালীর মনের কোণেও দুর্ঘোষ আজ ঘনিষ্ঠে উঠেছে, বাড়ি বইছে তার দাঁরা অন্তর জুড়ে। এমন ক'রে কত দিন আর চলে, দুলালী যে আর বইতে পারছে না দুর্দৈব এ জীবনের ভার, মনের জোর তার ক্রমশই যেন কমে আসছে। বিশেষ ক'রে হুলোর সঙ্গে যে আর কোন নতেই বরদাস্ত করতে পারছে না দুলালী, হুলোর সঙ্গে তার সত্যিকারের কতটুকু সম্বন্ধ বাইরের লোক ত তা বুঝবে না। দুলালীকে কি যে তারা ভাবে সে সব কথা ভাবতে গেলেও দুলালীর মনটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠে আপনা থেকেই, নিজেকে তার অত্যন্ত ছোট বসে মনে হয় নিজের কাছেই। শত লালুনা শত অপমান

সহ ক'রে এই ভাবে দুঃসহ এই জীবন ভার বয়ে বেড়াবার সত্যই কোন অর্থ আছে কি ? দুলালী এবার মুক্তি চায়, যেমন ক'রে শোক মুক্তি চায়। কিন্তু যার পথ চেয়ে এত লাঞ্ছনা সহ করেও আশার আশায় বুক বেঁধে দিনের পর দিন গুনছে দুলালী, সে ত কই ভুলেও একবার ফিরে তাকানো না। সে হয়ত আর আসবে না, দুলালী হয়ত একেবারেই নন থেকে মুছে গেছে তার। তা বাক, আপমোস নাই দুলালীর ; সে যদি অন্যাসে দুলালীকে ভুলে থাকতে পারে—দুলালীও জোর ক'রে ভুলে থাকবে তাকে। কিন্তু এভাবে আর নয়, এখন থেকে পালাতে হবে দুলালীকে—যেমন ক'রে হোক।

শুয়ে শুয়ে কত কথাই ভাবতে লাগলো দুলালী, ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো তার জড়িয়ে এলো ঘুমে।

হুলো নাঝি মদের নেশার টোর হয়ে উঠেছে, টলতে টলতে বাড়ী কিরছে হুলো কাদরের ধারে ধারে। মদের নেশার সঙ্গে সঙ্গে গানের নেশাও আজ যেন তাকে পেয়ে বসেছে। এমনিতে হুলো নাঝি গান না, কিন্তু পচুই মদ যদি একটু খানি পেটে পড়েছে তবে আর হুলোর শ্রুতি হাত দেয় কে ; বেতলা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হুলো এক উৎকট রসের স্রষ্টি ক'রে তোলে, হুলো নাঝির এটা বারবরকার অভ্যাস।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কাদরের ধারে বার দুই দিন আহুত খেলে হুলো, মদের ভাঁড়টা সে চুরমার ক'রে ফেললে। হুলোর কিঞ্চিৎ জ্ঞকেপ নাই কোননিকে, নেশার আনন্ডে যন যেন তার উড়ছে। কথাগুলো ক্রমশই জড়িয়ে আসছে হুলোর, মাথাটা তার বন্ বন্ করে ঘুরছে, সোজা হয়ে সে দাঁড়াতে পারছে না, ঘন ঘন পা টলছে ; তবু কিঞ্চিৎ গান ছাড়েনি হুলো, কাদরের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটানা সে গেয়ে চলেছে—

শাওতালী মহলী পাকা ডেমুর খাওয়ালি,

ভাস্করকে ভাত দিতে বুমুক দেখালি—

ও তুই বুমুক দেখালি।

দিলি কুলে কালি—ও তোমর মুখে কালি,

হলি কলঙ্কিনী সবার চোখের বালি,

হায় হায় চোখের বালি—

টলতে টলতে ছালালীর কুঁড়েঘরের সামনে গিরে আগুড়টার একবার  
ধাক্কা দিলে হুলো, ছোরগলায় সে ডাক দিলে একটা,—ঘুমলি নাকি,  
ছালালী—বলি ও ছালালী!

ছালালীর সাড়া শব্দ কিছু মাত্র পাওয়া গেল না। হুলো মাঝি চালা-  
ঘরের সামনেটার চিংপাত হয়ে চোথ বুজে শুয়ে পড়লো গিরে ছেঁড়া  
একখানা তালাইয়ের উপর। ঘরের নেশায় চারিদিক যেন বন্ বন্  
ক'রে ঘুরছে, হুলো মাঝি শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত যেন ঘুরপাক খেতে  
লাগলো নাগরদোলায় চড়ে। বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে কিছুক্ষণের  
মধ্যেই হুলো একেবারে নিরুণ মেয়ে গেল, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়লো  
হুলো।

\* \* \* \* \*

ঝকঝকে একখানা টাঙ্গি হাতে ক'রে এই অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে  
পড়লো টুংরা। হলদিগড়ের পাহাড়ে ঝিঙেফুলি বাঘ মেয়ে এই টাঙ্গি  
সে বকশিশ পেয়েছে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। এই টাঙ্গি দিয়েই  
হুলো মাঝিকে সে খুন করবে আজ, কার সাধ্য টুংরা মাঝির হাত  
থেকে হুলোকে আজ বাঁচায়। টুংরার চোখের সামনে ছালালীকে নিয়ে  
পরম স্থখে ঘরকন্না করবে হুলো, আর টুংরা শাওতাল চোথ বুজে তাই

নির্ঝিবাতে সহ্য করে যাবে, এ হয় না—টুংরা এ হতে দেবে না, টুংরা মাঝির জান কবুল। টুংরার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে হুলোর মত একটা কুঠের হাতে ছলালীকে যারা অনায়াসে তুলে দিয়েছে, টুংরা মাঝি দেখবে কেমন করে তারা টুংরার খন্ডর থেকে হুলোকে আজ বাঁচায়। টুংরা আজ মরিয়া, ছলালীকে অপরের সংসর্গ থেকে বাঁচাবার জন্য জান সে আজ নিতেও পারে, দরকার হলে নিজের জান সে দিতেও পারে। ছলালীর জন্তে কি না করেছে টুংরা, লোকে আজ টুংরাকে বিদ্রূপ ক'রে কানা বলে, এতদিন সে পাগল ছিলো, আজ বলে সব কানা। কানা ত সে ছিলো না, ইচ্ছে ক'রে কানা হয়েছে টুংরা, চোখ একটা সে নিজের হাতে উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু কোন কাজেই লাগলো না তার এতবড় আয়োজন, ছলালীকে পাওয়া গেল না, হুলো মাঝি এসে হঠাৎ তাদের মাঝখানে তুলে দিলে এক দুর্ভেদ্য বাবলা কাঁটার বেড়া। টুংরা এ বেড়া ভেঙ্গে ফেলবে, এ কাঁটা তাকে সরাসরেই হবে, আজ—এই রাতেই। হুলোকে আজ টুংরা মাঝি একেবারেই শেষ ক'রে দেবে, টুংরা মাঝির বিচার। দাঁড়তালী সমাজ যে শত্রুতা করেছে আজ টুংরার সঙ্গে, হুলো মাঝিকে খুন ক'রে পানিকটা তার শোধ তুলে নেবে টুংরা। তারপর যা হয় হোক, টুংরা মাঝি পরোয়া করে না।

ভালুকপোতা পিছনে ফেলে ধান নাঠের আলো আলো দাঁড়ি দিকে মুখ ক'রে এগিয়ে চললো টুংরা। পথঘাট তার সমস্তই চেনা। ডাঙ্গা ডহর বন জঙ্গল পার হয়ে যেতে হবে তাকে অনেকগানা পথ—অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইছে জোর, ঘুণি ঘুণি রুটি পড়ছে, কালো মেঘে সারা আকাশ ছেঁরে আছে। পথ ঘাট সব অন্ধকারে ঢাকা, বিহ্বালের আলো মাঝে মাঝে পথ দেখাচ্ছে টুংরাকে। জবরদস্ত টাঙ্গি একখানা ঘাড়ে ফেলে ভুতের মত এগিয়ে চললো টুংরা। সামনের

জঙ্গলটা পার হয়ে আর থানিকটা এগিয়ে যেতে পারলেই কাদরের ধারে গিয়ে পড়বে সে, তারপর সিঁধে একেবারে দক্ষিণ মুখে উঠবে গিয়ে ছালানীর কুঁড়েতে। রাত প্রায় প্রহর দুইয়ের কাছাকাছি, হুলো হুত নিশিষ্ঠে ঘুমিয়ে আছে কুঁড়ে ঘরে চাটাই পেতে। এ ঘুম তার ভাঙ্গবে না আর, হুলোকে আজ একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে টুংরা। সেই সঙ্গে ছালানীর মেয়েটাকেও শেষ ক'রে দিতে পারলে মন্দ হয় না। মোহন মাঝির নেয়ে, তাকেই বা কেনন ক'রে ছেড়ে দেবে টুংরা? মোহন যে ওর বাপ, মোহন মাঝির ওরসে নে ও নেয়ের জন্ম। দূর থেকে সেদিন ছালানীর কোলে মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে এসেছে টুংরা। মোহনের কাছে হুত ওর কিছু দান থাকতে পারে, কিন্তু টুংরার সে ছাঁটি চোখের বিব। ওটাকেও টুংরা এই সঙ্গে শেষ ক'রে ফেলবে নাকি? গলা টিপে কাদরের জলে ভাসিয়ে দিলেই—বাস, চুকে যাবে সেটা। টাঙ্গির ভার সহিবে না ও কচি মেয়ের ঘাড়, ও বে একেবারে কচি; তার চেয়ে বান্ধব জলে জলসাই, সেই ভাল—সেই চেষ্টাই করবে টুংরা। ছালানীর মনে যদি আঘাত লাগে এতে—টুংরা মাঝি নাচার, মোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে জেনে শুনে যে ভুল একদিন করেছে ছালানী সে ভুলের তাকে মাশুল দিতে হবে, এও টুংরার বিচার, মেয়েটার ব্যবস্থা করতেই হবে টুংরাকে। কিন্তু তার আগে হুলো মাঝির পালা, টুংরা মাঝির আজ প্রদান শিকার হুলো।

তালবারির আমবাগান পার হয়ে অর্জুনকুঁড়ির শাখাটা বাঁয়ে রেখে কাটি জঙ্গলে গিয়ে চুকে পড়লো টুংরা। আর থানিকটা এগিয়ে যেতে পারলেই কাদরের ধারে গিয়ে পড়বে সে।

মোহন মাঝি কয়লা খাদ থেকে ফিরে এসেছে। ক'দিন থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বনে জঙ্গলে। প্রকাশে তার বেরোবার উপায় নাই,

দেশের সঙ্গে যে মহাশক্ততা ক'রে গেছে মোহন, তাই দেশের লোক তার ভিটে মাটি পর্যাস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে আজ, সমাজের বিচার। মোহন কিন্তু মনে মনে জানে অপরাধ সে কিছু নাত্র করে নি। ছালালীকে ভালবাসে মোহন, বাইরের সব কিছুকে তুচ্ছ ক'রে, সংসারের সকল সুখ বিসর্জন দিয়ে স্বৈচ্ছায় সে স্বীকার ক'বে নিয়েছে তার অন্তরের সত্যকে। এতে যদি সমাজের চোখে তাকে অপরাধী হতে হয়—সে সমাজে কোন প্রয়োজন নাই মোহনের, দেশের মায়া সে কাটিয়ে উঠেছে। চুপি চুপি একবার ছালালীর সঙ্গে দেখা করতে হবে মোহনকে যেমন ক'রে হোক। ছালালীকে ওরা আটকে রেখেছে ছোট্ট একটা কুঁড়ের মধ্যে। মোহন জানে ভ্রূংসহ এ শাস্তির বোঝা কোন নতেই বইতে পারবে না ছালালী, ছালালীর পক্ষে এ অসহ। ভয়ানক ভুল করেছে মোহন ছালালীকে ছেড়ে দিয়ে, সে ভুলের ঋণ ছালালীকে যে এই ভাবে শোধ করতে হবে সে কথা মোহন ভাবতে পারেনি। প্রকান্তে তার বেরোবার উপায় নাই, চারিদিকে শত্রু, এ অবস্থায় মুখোমুখি দেখা হলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ তার অনিবার্য। অথবা একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে চায় না মোহন, ছালালীর সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে তাকে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি সে এখান থেকে সরে পড়তে চায়। ছালালীর কুঁড়েটা দিনের বেলা দূর থেকে দেখে এসেছে মোহন, এ পর্যাস্ত সে সন্মোগ পায়নি ছালালীকে ধরবার। উপযুক্ত অবসর, নিশ্চক্ৰ নিশ্চিতি রাত, ঘুরঘুরি অন্ধকারে পথ ঘাট সব ঢেকে দিয়েছে, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই; ছালালীর সঙ্গে দেখা করবার এই উপযুক্ত অবসর।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে কাদরের ধারে ধারে ছালালীর কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চললো মোহন উত্তর দিকে মুখ ক'রে। বিছাভের আলোয় মাঝে মাঝে পথ দেখা যাচ্ছে।

ছালালীর কুঁড়ের সামনে এসে থমকে খানিক দাঁড়ালো টুংরা শিমুল  
 গাছের নীচে। কেউ কোথাও জেগে নাই, অন্ধকারে চারিদিক ভুবে  
 গেছে, অস্পষ্ট বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে  
 সারবন্দী ভুট্টার ক্ষেত, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে ভুট্টা ক্ষেতের  
 উপর দিয়ে। কাদরের ওদারটায় দুর্ভেজ পাতাড়ির বন অন্ধকারে  
 আত্মগোপন করে নিঃশব্দে যেন খাড়া হয়ে আছে কালো রঙের কফিন  
 ঢাকা বিরাট একটা প্রেতপুরীর নত। কাদরের ধার থেকে কোলা  
 ব্যাণ্ডের একটানা ক্যাও ক্যাও শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ার সঙ্গে অন্ধকারের  
 দুক চিরে। কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই টুংরার, টান্ধি হাতে নিঃশব্দে  
 সে দাঁড়িয়ে আছে এসে ছালালীর কুঁড়ের কাছে, জিঘাংসার প্রতিমূর্তি  
 রক্ত-লোলুপ জীবন্ত এক নিশচরের নত। যে বাড় বইছে আজ  
 টুংরা মাঝির মনের মধ্যে, বাইরের এ দুঃখোগ তার কাছে নিতান্তই  
 তুচ্ছ। রাত এখন কতখানা কে জানে, পাতাড়ির জঙ্গলে শেয়াল  
 ডাকছে, ছপূর রাত হয়ত গড়িয়ে গেছে। দেরি করে আর লাভ  
 নাই কোন, তুলো মাঝিকে শেষ করতে হবে, এই তার উপযুক্ত  
 অবসর।

পা টিপে টিপে ছালালীর কুঁড়ের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো  
 টুংরা। ভিতর থেকে কুঁড়ের আগল বন্ধ, দোরের কাছে কান খাড়া  
 করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো টুংরা, ভিতর থেকে সাড়া শব্দ কিছুমাত্র  
 পাওয়া গেল না, নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্যাস্ত না। আগুড়খানা খুলে  
 ফেলতে হবে ভিতর দিকে হাত বাড়িয়ে, ভয় পেলে চলবে না টুংরার ;  
 অন্ধকারের মধ্যে থেকেই তুলো মাঝিকে কোন রকমে খুঁজে নিতে হবে,  
 তারপর এক লহমায় কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি আবার সরে পড়তে  
 হবে টুংরাকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।



মনের জোর যতই থাক টুংরার তবু ওর গা-টা যেন ছন্ ছন্ করতে লাগলো। আশে পাশে কেউ কোথাও জেগে নাই ত! চারিদিক একটু ঘুরে ফিরে ভাল ক'রে দেখে নেওড়া দরকার। টুংরা পা টিপে টিপে ছললীর কুঁড়ে ঘরের পিছন দিকটা চক্কর মেয়ে ঘুরে এলো একটু খানি, চারিদিক নিম্নম। চালাঘরের এক কোনে হুলো মাঝির ছাগল গুলো টুংরার সাদা পেয়ে হঠাৎ ছটোপুটি ক'রে উঠলো। হঠাৎ একটু চমকে উঠলো টুংরা, তাড়াতাড়ি সে সরে পড়লো ওখান থেকে, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আবার নিম্নম। ভয় পেলে চলবে না টুংরার, ভয় পাবার কিছু নাই এতে; এতখানা যখন সে এগিয়ে এসেছে তখন এর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে কিছুতেই আজ ফিরবে না টুংরা, পথের কাটা তাকে সরাতেই হবে।

ঘুরে ফিরে চালাঘরের সামনে এসে থমকে একটু দাঁড়ালো টুংরা, কে যেন চালার একপাশে গুয়ে রয়েছে উত্তর দিকে মাথা ক'রে; কাঠাড়ের পাশ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটাকে, অন্ধকারে পড়ে আছে সে এক ধারে ভুতের মত। কে ও লোকটা—ও কি হুলো? হুলো মাঝি এখানে? আর একটা বিজ্ঞাতের ঝিলিক দিতেই সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে চিনে ফেললে টুংরা, হুলো মাঝিই বটে; চালাঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া একটা চাটাই-এর উপর হাত পা ছড়িয়ে মড়ার মত পড়ে আছে হুলো। টুংরার মনটা যেন ভরে উঠলো এক পৈশাচিক আনন্দে, সর্বোচ্চ গুর গুর ক'রে কাপছে, উৎকট উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার ধমনীর রক্ত; হাতের টাঙ্গিখানা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে হুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো টুংরা, হুলোকে সে মুক্তি দেবে আজ, ওর অভিশপ্ত জীবনের এইখানেই শেষ। আর একটু আলো—বিজ্ঞাতের আর একটা ঝিলিক, কাম—একদম ফরসা, লক্ষা প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছে টুংরা। টাঙ্গি

খানা দৃঢ় মুষ্টিতে উঁচিয়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে টুংরা যেন মুহূর্ত্ত গুণতে লাগলো । কালো মেঘের বুক ফুঁড়ে ঝিকঝিক ক'রে উঠলো হঠাৎ এক বলক বিদ্যুত, হুলো মাঝির গলাটাকে লক্ষ্য ক'রে মারলে টুংরা এক কোপ । ঘুমের ঘোরেই অশ্রুট একটা আৰ্ত্তনাদ ক'রে উঠলো হুলো মাঝি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কোপ, এক—দুই—তিন—উপর্যুপরি তিনটে কোপ ; হুলো মাঝি সাবাড় হয়ে গেল, একেবারে শেষ ।

হুলোকে কি অচ্যায় ভাবে খুন করলে টুংরা ? একি হত্যা ? না—না—এ বিচার, টুংরা মাঝির বিচার । এই সঙ্গে ছলালীর মেয়েটাকেও হাতের কাছে পাওয়া গেলে নন্দ হত্যা না, শুটাকেও কোন রকমে সাবাড় ক'রে দিতে পারলে,—কিন্তু সে বুঝি আর হয় না, কুঁড়ের মধ্যে হঠাৎ আলো জলে কেন ?

হুলো মাঝির গোষ্ঠানির শব্দ পেয়ে কুঁড়ের মধ্যে জেগে উঠেছে ছলালী, ছাগল গুলোর হটোপুটির শব্দ শুনে যুন তার আগেই ভেঙ্গে গেছে । হুলো হঠাৎ এমন ভাবে চাপা গলায় চীৎকার ক'রে উঠলো কেন ! এত রাত্রে ছলালীর কুঁড়ের এসে চোর-চণ্ডাল কেউ হানা দিলে নাকি ? ছলালীর যেন কেমন একটা সন্দেহ হলো, দেশলাইয়ের কাঠি জেলে লক্ষটা তাই তাড়াতাড়ি সে ধরিয়ে নিলে, বার দিকটা একটু ঘুরে আসা দরকার ।

কুঁড়ের মধ্যে আলো জলে উঠতেই টুংরা মাঝি তাড়াতাড়ি সরে পড়লো, ধরা পড়লে চলবে না টুংরার, যেমন ক'রে হোক তাকে পালাতে হবে, বাঁচতে হবে টুংরা মাঝিকে ।

লক্ষটা জেলে নিয়ে কুঁড়েঘরের আগুড় খুলে ছলালী এনে বাইরে দাঁড়ালো, কি ভয়ানক দুৰ্যোগ, আঁচল দিয়ে লক্ষটা কোন রকমে আড়াল ক'রে চালাঘরের দিকে এগিয়ে চললো ছলালী, গা-টা তার ছম্‌ছম

করছে। চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুলালীর চোখ পড়লো  
 হুলোর দিকে, দুলালী হঠাৎ আঁতকে উঠলো ভয়ে,—হুলো নাকির  
 গলাটা একেবারে দু'কাক, রক্তের ঢেউ খেলছে মেঝের উপর, ধড়  
 থেকে মাথাটা তার ছিটকে পড়েছে খানিক দূরে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য,  
 দুলালীর দেহের রক্ত বেন হিম হয়ে আসছে, চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে  
 ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো দুলালী। কে এমন ভাবে খুন করলে  
 হুলোকে? দুলালী কি করবে এখন? খুনেটা যদি হঠাৎ তার  
 সামনে এসে দাঁড়ায়, দুলালীকেও সে খুন করবে নাকি? ভয়ে দুলালীর  
 অন্তরাখ্যা শিউরে উঠলো, বুকের ভিতরটা ছর ছর ক'রে কাঁপছে।  
 ঝড়ের বেগে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে দুলালী কান্দরের ধারে ধারে,  
 ভুট্টা ক্ষেতের রাখাদের কাছ থেকে যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়।  
 দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে লক্ষটা গেল নিবে, অন্ধকারেই ছুটতে  
 লাগলো দুলালী জগন নাকির ভুট্টা ক্ষেত লক্ষ্য ক'রে, জোর গলায় সে  
 চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো,—জগন কাকা—জগন কাকা,—  
 চোর—চোর!

মোহন নাকি ওদিক থেকে এসে পৌঁছে গেছে দুলালীর কুঁড়ের  
 প্রায় কাছাকাছি। কান্দরের ধারে ধারে এগিয়ে আসছে মোহন উত্তর  
 দিকে মুখ ক'রে, দুলালীর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে। মেয়ে  
 নাচুনের চীৎকার শুনে মোহন একটু থমকে দাঁড়ালো, কে বেন  
 সামনে দিয়ে ছুটে আসছে, অন্ধকারে চেনা যায় না।

দুলালী আবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—জগন কাকা—জগন কাকা,  
 —চোর—চোর—খুনে—

মোহন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ও যে দুলালী; গলার  
 আওয়াজ শুনেই দুলালীকে চিনে কেলেছে মোহন। কিন্তু দুলালী

এমন ভাবে চীংকার করছে কেন, কোথায় চোর—কোথায় খুনে !  
মোহন মাঝি হঠাৎ যেন একটু ভাংকাচ্যাংকা মেরে গেল ।

অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে দুলালী প্রায় এসে পড়েছে মোহনের একেবারে সামনে । বাঁ-হাতি মোড় ফিরে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে পাশে ছুটতে লাগলো দুলালী, ভয়ানকভাবে কেবলই সে ডাক দিতে লাগলো,  
—জগন কাকা—জগন কাকা !

দুলালীর পিছু পিছু হন্ হন্ করে খানিকটা এগিয়ে গেল মোহন ভুট্টা ক্ষেতের হুড়ি পথ ধরে । দুলালী তখনও চীংকার করছে ।

পিছন দিক থেকে হঠাৎ ডাক দিলে মোহন,—দুলালী—দুলালী !

দুলালী ভয় পেয়ে আরও জোরে চীংকার করে উঠলো,—জগন কাকা—চোর—চোর—খুনে—

ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে দুলালীকে লক্ষ্য করে প্রাণপণ শক্তিতে আবার চীংকার করে উঠলো মোহন,—দুলালী—দুলালী—ভয় নাই আমি, চোর ডাকাত খুনে আমি নই, দুলালী—দুলালী— !

দুলালী তখন পৌছে গেছে জগন মাঝির কুঁড়ের প্রায় কাছকাছি, প্রাণপণ শক্তিতে ডাক দিচ্ছে সে তখনো,—জগন কাকা—জগন কাকা !

জগন মাঝি কুঁড়ের ভিতর থেকে হাঁক দিলে একটা,—কে ?

তাড়াতাড়ি লগ্ননের আলোটা জ্বলে ফেললে জগন মাঝি, দুলালী গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার কুঁড়ের সামনে । জগন মাঝি শব্দবাস্তে বলে উঠলো,—কে রে, দুলালী নাকি, কি হয়েছে ? ব্যাপার কি ?

দুলালীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় আর একবার সে বলে উঠলো,—খুন—খুন !

জগন নাথি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—খুন—কোথায় ?

কাঁদরের ধার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে ছলানী, সর্ষাক তার অবশ হয়ে আসছে, জগন নাথির কুঁড়ের সামনে হাত পা ছড়িয়ে ছলানী একেবারে লুটিয়ে পড়লো, ধীরে ধীরে চৈতন্ত যেন গুর লোপ পেয়ে আসছে।

জগন নাথি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলে না, অল্পমানে নে এঁচে নিলে মালায়ুক রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি ভুট্টা ক্ষেতের বাগাদের নাম ধরে জোরগলায় হাঁক দিতে লাগলো জগন নাথি। ছলানীর সাড়া পেয়ে আগেই তারা জেগে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে একে একে সব জমা হতে লাগলো এসে জগন নাথির কুঁড়ের সামনে। ওদেরি একজনকে লক্ষ্য ক'রে জগন নাথি বলে উঠলো,—গাঁয়ে গিয়ে খবর দে—কাঁদরের ধারে খুন হয়েছে।

সকলেই হঠাৎ চমকে উঠলো একদিকে, ছুটলো একজন রানপুরের শাওতালদের খবর দিতে। মল্ল বাগানের শুদিকটায় আলো দেখা যাচ্ছে, গাঁ দিক থেকে কতকগুলো লোক হৈ-হৈ ক'রে ছুটে আসছে এই দিকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জগন নাথির কুঁড়ের সামনে লোক জমে গেল বিস্তর। ছলানী এর মধ্যে অচৈতন্ত হয়ে পড়েছে। জগন নাথি পাজা-কোলা ক'রে ছলানীকে শুইয়ে দিলে একটা খাটিয়ার উপর, কিছুক্ষণ তার মুখে চোখে জল দিয়ে হাওয়া করতেই ছলানী আবার গোথ'মিলে তাকালো।

ভুট্টাক্ষেতের একপাশে দাঁড়িয়ে মোহন নাথি দূর থেকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে জগন নাথির কুঁড়ের দিকে। দূর থেকে সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে সবই, ব্যাপারটা কিন্তু কোন মতেই ঠাউরে উঠতে পারলে না

মোহন। চারিদিকে শুধু দোকানের হাঁক ডাক, আরও কতকগুলো লোক লণ্ঠনের আলো আর তীর ধনুক লাঠি মৌটা হাতে নিয়ে গাঁ দিক থেকে ছুটে আসছে। এ ভাবে কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়, কোন রকমে যদি ওরা মোহন মাঝির সন্ধান পায়—মোহনকে ওরা আস্ত রাখবে না।

কাদরের হুড়ি পথ ধরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মোহন আবার তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। এ অবস্থায় দুলালীর সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব নয়, সময়ান্তরে সে চেষ্টা আবার করবে মোহন, দুলালীর সঙ্গে যেমন ক'রে হোক দেখা তাকে করতেই হবে। আখবাড়ীর মাথায় বে-ঘাটে কাদর পার হয়ে পাতাড়ির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়লো মোহন। বড় বৃষ্টি দুর্ব্যোগ এর মধ্যে কিছুটা কমে এসেছে।

রামপুরের প্রায় কুড়ি দেড়েক সাওতাল এসে জমা হয়েছে ভুট্টাক্ষেতের ধারে। দুলালীর কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল সকলেই। নুলো মাঝিকে হঠাৎ কে আজ খুন করতে আসবে ঘুরঘুড়ি এই অন্ধকার রাত্রে! চোর ডাকাতেরই বা সম্ভাবনা কোথায় দুলালীর ওই ভান্স কুঁড়েয়। অথচ নুলোর মত একটা জলজীয়াস্ত লোক হঠাৎ কিনা বেমালাুন একেবারে খুন হয়ে গেল, আশ্চর্য্য! দুলালী ওদের ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে, কুঁড়েয় তাকে ফিরে যেতে হবে।

সমাগত সকলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জগন মাঝি তাড়া দিয়ে বললে,—চল্ তবে, আর দেরি কেনে, ব্যাপারটা দেখেই আসা যাক।

দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে সব এগিয়ে চললো কাদরের দিকে। ভয়ের কোন কারণ নাই, তীর ধনুক লাঠি মৌটা সবই তাদের সঙ্গে আছে, গোটা চারেক লণ্ঠনের আলো পর্য্যাপ্ত। দুলালীর কুঁড়েয় কাছে

গিয়ে এক জায়গায় জমা হলো সব, সকলের মনেই কেমন যেন একটা  
স্বস্ত ভাব। ছালালী চালাঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে ছুলো মাঝির  
শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। জন দুই তিন এগিয়ে গেল আলো  
নিরে, বাকি সকলেই তাদের পিছু পিছু চালাঘরের সামনে গিয়ে ভিড়  
ক'রে দাঁড়ালো। চালাঘরের সামনেই পড়ে আছে ছুলো মাঝি  
গলা-কাটা অবস্থায়, কি ভয়ানক সে দৃশ্য! একই সঙ্গে অনেকগুলো  
লোক ভয় পেয়ে হঠাৎ চাপা গলায় অশ্রু একটা শব্দ ক'রে উঠলো,  
—ই-স-স—!

ভয়ে তাদের গায়ের লোন খাড়া হয়ে উঠেছে। চালাঘরের সামনে  
দাঁড়িয়ে লোকগুলো সব ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে ছুলো মাঝির  
দিকে, এমন সময় কুঁড়ের মধ্যে ছালালী হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো,  
—আমার মেয়ে—আমার মেয়ে কোথায়, হুকুরমনি—হুকু—হুকু!

ছালালীর চীৎকার শুনে জন কয়েক গিয়ে হৈ হৈ ক'রে ঢুকে পড়লো  
কুঁড়ের মধ্যে, জগন মাঝি গিয়ে তাড়াতাড়ি ছালালীর সামনে দাঁড়ালো।  
ছালালী চীৎকার ক'রে কঁদে উঠে বললে,—জগন কাকা, হুকুরমনিকে  
যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; কুঁড়ের মধ্যে একলাটি সে ঘুমিয়েছিলো,  
ফিরে এসে আর যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না জগনকাকা!

কি সর্বনাশ, এবে আবার এক নতুন উপসর্গ, মেয়েটা হঠাৎ কোথায়!

কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লো ছালালী, বুক চাপড়ে সে চীৎকার  
ক'রে উঠলো,—হুকু—হুকু!

লগ্ননের আলো নিয়ে চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হলো,  
হুকুরমনির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা ভয়ানক  
ঘোলাটে হয়ে উঠলো,—ছুলো মাঝি খুন হয়ে পড়ে আছে চালা ঘরের

সামনে, কুঁড়ের মধ্যে ছলানীর ঘুমন্ত মেয়েটাকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছলানীর পিছু পিছু তাকে অন্ধকারে তাড়া ক'রে গিয়েছিলো কে একটা লোক, জগন মাঝির কুঁড়ের ধার পর্যন্ত। সম্ভবত সেই খুনেটাই, ধরতে পারলে ছলানীকেও হয়ত সে আঙ্গ শেষ ক'রেই ফেলতো। ব্যাপারটা অগাগোড়াই ঠিক যেন একটা ভৌতিক কাণ্ডের মত। কে এই খুনে? কি মতলবে সে ছলানীর কুঁড়ের হঠাৎ এমন ভাবে হানা দিলে এসে? মনে মনে সকলেই সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে অতি মাত্রায়, ব্যাপারটা দেখে শুনে সব অবাক মেরে গেল, কারো মুখে রা-শদটি নাই। ছলানী শুধু বুক চাপড়ে চীৎকার করছে,—স্বকু—আমার স্বকু!

২ বার দুই তিন ডাক দেওয়া হয়েছে রাবণ মাঝিকে। কিছুক্ষণ পরে সন্টার রাবণ মাঝিও এসে পড়লো রামপুরের আরও কয়েকজন সাওতালকে সঙ্গে নিয়ে। ছলানীর মাও তার সঙ্গে এসেছে, কোন-রকমেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে ছলানী ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, ছলানীর মা গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই ছলানী একেবারে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বকের মধ্যে, ফুঁপিয়ে সে আর একবার কঁদে উঠলো,—স্বকু—আমার স্বকুরমনি!

ছলানীর মা ছলানীকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কুঁড়ের একপাশে বসে পড়লো, দেখাদেখি সেও হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো কান্নায়, ওদের মা মেয়ের কান্নার রোল রাবণ মাঝির কানে গিয়ে বিঁধতে লাগলো যেন তীরের মত। রাবণ মাঝি ঈষৎ তর্জ্জন ক'রে বলে উঠলো,—আঃ—একটু আশু।

রাবণ মাঝিকে দেখে সকলেই যেন একটু ভরসা পেলে। জগন



মাঝি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো,—সদ্য—  
সদ্য!

সুখন মাঝি ছ'হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি রাবণ মাঝির  
সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো,—সদ্য!

রাবণ মাঝি একটু হাত তুলে ইসারায় তাদের আশস্ত ক'রে বললে,  
—খাম্।

ব্যপারটা ভাল রকম বুঝে উঠতেই আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল  
রাবণ মাঝির। আর একবার চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা  
হলো, খুনে-ডাকাতির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, ছুলাসীর  
মেয়েটারও কোন হৃদিস নাই। রাবণ মাঝি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো।  
এই খুনের ব্যাপার নিয়ে হরত ভয়ানক রকমের একটা হৈ চৈ পড়ে  
যাবে, পাঁচজনে আবার কানাকানি করবে যাওতাল সদ্য রাবণ মাঝির  
পরিত্যক্তা মেয়েটার প্রসঙ্গ নিয়ে। তার উপর পুলিশের হাঙ্গামা—  
খুনখারাপির জবাবদিহি—এসব ত আছেই। কোন দিক আজ  
সামলাবে রাবণ মাঝি! বিপদ যখন আসে তখন চার দিক থেকে ঠিক  
এমনি ভরবই আসে। কুঁড়ের বাইরে একটা ফাকা জায়গায় গম্ভীর  
ভাবে বসে পড়লো রাবণ মাঝি। রাত আর বেশি নাই, পূব আকাশে  
'ভুলকো' তারা জল্ জল্ করছে। সুখন মাঝি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে  
রাবণ মাঝির সামনে দাঁড়ালো, চাপাগলায় বলে উঠলো সুখন,—খুলো  
মাঝির লাসটাকে এইবেলা কোথাও সরিয়ে ফেললে হয় না সদ্য?

রাবণ মাঝি জবাব দিলে,—সে আর হয় না, ওসব ক'রে লাভ নাই  
কোন।

জগন মাঝিও ওই ধরনেরি কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো,  
রাবণ মাঝির জবাব শুনে সে থমকে গেল হঠাৎ।

সকাল বেলা খানা থেকে পুলিশ এসে হাজির হলো সদল বলে। হুলো মাঝির খুনের তদন্ত, জন দুই তিন কনেটবল আর জন পাঁচ সাত চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন খানার বড় দারোগা নিজে। হুলো মাঝির খুনের ব্যাপারটা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে, বিশেষ একটা চাকল্যের সাড়া পড়ে গেছে কাছাকাছি সাওতাল পাড়া গুলোর মধ্যে, হুলালীর কুঁড়ের সামনে লোক জমে গেছে বিস্তর। হুলো মাঝির বিকৃত মৃতদেহখানা কুঁড়ের পাশে একধারে পড়ে আছে চালাঘরের সামনে, সর্বাঙ্গে তার পিপড়ে ধরে গেছে, খড় থেকে মুণ্ডুটা ছিটকে একধারে পড়ে আছে খানিক দূরে, মুখখানার চেহারা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠেছে।

হুলালীর জবানবন্দি ও পাড়ার লোকের সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করতে বেলা হয়ে গেল অনেক খানা। হুলো মাঝির খুন সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এক এক ক'রে সরকারী খাতায় নোট করে নিলেন দারোগা বাবু। হুলো মাঝি বা হুলালীর সঙ্গে কারো কোন আদোয়াতি ছিলো কি না সে সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওয়া হলো যথেষ্ট, কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা ছিলো বলে কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। দারোগা বাবু গোড়া থেকেই যা সন্দেহ করেছিলেন সেই সন্দেহই তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত। হুলো মাঝিকে খুন ক'রে বাইরের লোকের লাভ কি? খুন হয়েছে সে তার নিজের পরিবারের হাতে, হুলালী যেখন নিজে তাকে খুন করেছে, দারোগা বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে হুলো মাঝির সঙ্গে হুলালীর আন্তরিক হৃদয়তা বা মনের মিল কোন দিনই ছিলো না, হুলালীর পক্ষে সেটা কখনো সম্ভব বা স্বাভাবিকও নয়। হুলোর মত একটা অবাহিত ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংসর্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য

ছালালী যে জ্বরে নিজের হাতে খুন করেনি এ কথা কেউ জোর ক'রে  
 বলতে পারে কি ? ছালালী যতই বলুক যে ছলো মাঝির খুনের ব্যাপারে  
 সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তার পারিবারিক অবস্থা দেখে সে কথা কিছু বিশ্বাস  
 করা চলে না কোনমতেই। ছলো মাঝির এই খুনের সঙ্গে ছালালীর  
 যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ! আসল  
 ব্যাপার দারোগা বাবু বহুক্ষণ আগেই অহুমানে এঁচে নিয়েছেন। তাঁর  
 দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থেকে থাকে তা হলে তাঁকে  
 একথা আজ মানতেই হবে ছলো মাঝির হত্যাকারী তার পরিবার  
 ছাড়া অপর কেউ আর হতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে ছালালী নেবেন  
 সম্পূর্ণ তার নিজের চেষ্টায় কিছা অপর কারো সহযোগিতায় ছলো  
 মাঝিকে যে খুন করেছে সে সম্বন্ধে দারোগা বাবু নিঃসন্দেহ। ছালালী  
 কিন্তু স্বীকার করতে চায় না একটি কথাও, ক্রিমিনাল মেন্টালিটির  
 এও একটা লক্ষণ। থানায় নিয়ে গিয়ে কড়া রকমের দুটো ধমক ধমক  
 দিলেই আসামীর মুখ দিয়ে হুড় হুড় ক'রে আসল কথা বেরিয়ে পড়বে—  
 দারোগা বাবুর জানা আছে, পুলিশের লোক এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।  
 দারোগা বাবুকে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত করতে হবে তাই, 'কু' তাঁকে  
 বের করতেই হবে।

ছলো মাঝির মৃত দেহ একটা গরুর গাড়ী ক'রে ময়না ভদ্র জগৎ  
 চালান দেওয়া হলো মহকুমায়। জন চারেক চৌকিদার লাল পাহারা  
 দিয়ে বঙ্গ হাতে হেঁটে চললো গরুর গাড়ীর পিছু পিছু, সঙ্গে তাদের  
 কনেটবল রামদীন পাড়ে। লাল চালানের ব্যবস্থা ক'রে ছালালীকে  
 সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করা হলো ছলো মাঝির খুনের  
 দায়ে। চারি দিকে একটা চাকল্যের সাড়া পড়ে গেল, সকলের মনেই  
 একই প্রশ্ন—ছালালী কি সত্যি সত্যি ছলো মাঝিকে খুন করেছে ?

অরুণ-কুহেলী

হুলালী মেঝেন খুনী, সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও এ কথা বেশ  
যেনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

রাবণ মাঝির মনের মধ্যে ঝড় বইছে,—মেয়ে তার খুনী আসামী ?  
খুন কি সে সত্যিই করেছে ? খুন হয়ত সে করেনি, এতবড় একটা  
দুঃসাহসিক কাজ হুলালীর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। রাবণ মাঝির  
মন বলছে কখনই এ সম্ভব নয়, হুলালী এ কাজ করতে পারেনা—কিছুতেই  
না। কিন্তু পুলিশের লোক যে বিশ্বাস করতে চায় না ওর কোন কথাই,  
হুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই, আটকাতে পারবেনা রাবণ মাঝি।  
হতে পারে সে সাঁওতাল পাড়ার সর্দার, পঞ্চগেরামীর মাথা, কিন্তু  
এই সব পুলিশ পিয়াদার ব্যাপারে যে রাবণ মাঝির কোন হাত নাই।  
হুলালী আজ পুলিশের হাতে বন্দী, রাবণ মাঝি কি করতে পারে তার  
জন্ত ? কিছু না, কিছুমাত্র না।

হুলো মাঝির খুনের ব্যাপারে একটা লোককে সন্দেহ হয় রাবণ  
মাঝির, সে মোহন। মোহন মাঝি কলিয়ারি থেকে ফিরে এসেছে,  
রাবণ মাঝি তার চক্ষু প্রমাণ। হুলালীকে আজো ভুলতে পারেনি  
মোহন, আজও হয়ত সে হুলালীকে ফিরে পেতে চায় ; হুলো তাদের  
মিলনের পথে একমাত্র বাধা, তাই চুপি চুপি এসে হুলো মাঝিকে  
একেবারে শেষ ক'রে ফেলা মোহনের পক্ষে অসম্ভব নয়। এ কাজ  
মোহন মাঝির, সম্ভবপূর্ণ হুলো মাঝিকে খুন ক'রে চূর্ণ চাপ সে সরে  
পড়েছে, রাবণ মাঝির দৃঢ় বিশ্বাস। দারোগা বাবুকে একান্তে ডেকে  
রাবণ মাঝি জানালে তার মনের কথা। হুলো মাঝিকে খুন ক'রে গেছে  
মোহন, এ সম্বন্ধে রাবণ মাঝি নিঃসন্দেহ। মোহন মাঝির নামে কলিয়া  
বর ক'রে শিগগীর তাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করা দরকার, প্রয়োজন  
হলে এ বিষয়ে পুলিশের লোককে সাহায্য করতে রাজি আছে রাবণ,

এ কথাও সে জানিয়ে দিলে দারোগা বাবুকে। দারোগা বাবু চুপ চাপে শুনে গেলেন রাবণ মাঝির বক্তব্য, ধীরে ধীরে তাঁর মুখ দিয়ে ফুটে উঠলো ঈর্ষা একটা অবজার হাসি, রাবণ মাঝির কোন কথাই তিনি গ্রাহ্য করলেন না, দারোগা বাবুর ভাবগতিক দেখে রাবণ মাঝি হতাশ হয়ে পড়লো।

জন তিমেক কনেইবল আর কয়েকজন চৌকিদার মিলে দুলালীকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। খুনের তদন্ত শেষ ক'রে দারোগা বাবু হুকুম দিলেন,—আসামী চালাও।

দুলালী আর একবার কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো,—খুন আমি করি নাই বাবু, সত্যি বলছি, খুন আমি করি নাই।

দুলালীর কোন কথাই শুনলে না পুলিশের লোক, দুলালীকে ওয়া ধরে নিয়ে চললো থানায়; সেখান থেকে সদরে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। চারিদিকে আর একটবার অতি করুণ ভাবে তাকালো দুলালী, চোখ দুটো তার ভরে উঠলো জলে। পুলিশের চোখে সে আজ অপরাধী, গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এতগুলো লোক—দুলালীর জানা চেনা এতগুলো সাঁওতাল—পাড়া ভেঙ্গে যারা দলে দলে এসে জমা হয়েছে দুলালীর কুঁড়ের সামনে,—এরাও কি সব পুলিশের কথা বিশ্বাস ক'রে? কেমন ক'রে বোঝাবে দুলালী যে সত্যিই সে অপরাধী নয়। আজ তাকে পুলিশের হাতে এতখানা লাহিত—এতখানা অপমানিত হতে হলো এতগুলো লোকের সামনে, কিন্তু কই—একটা কথাও ত কইলে না কেউ এ পর্যন্ত দুলালীর দিক হয়ে। এরা শুধু শাস্তি দিতেই জানে, এরা শুধু দুশমনি করতেই শিখেছে; দুলালীর অবস্থার জন্ত নেহত দায়ী আজ এরা—দায়ী আজ সাঁওতালী সমাজ। কিন্তু কে করবে এদের বিচার? দুলালীকে

সর্বস্ব হারা ক'রে—জীবনের সকল সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে এতবড় একটা বিপদের মাঝখানে আজ বারা তাকে ঠেলে দিয়েছে, সেই সমাজ-চাইন্দের বিচার করুন ভগবান। কিন্তু এ আঘাত—এ দুঃখ কি সহিতে পারবে ছালালী ! ছালালী আজ খুনী আসামী, এ কথা যে স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে পারে নি।

পুলিসের লোকগুলোর সঙ্গে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে ছালালী আবার থমকে একটু দাঁড়ালো, পা যেন তার এগোতে চায় না। কোথায় সে চলছে ? সুকুরমনি আবার যদি ফিরে আসে তার ভাঙ্গা কুঁড়ের ! সে কি আর আসবে না ? হয়ত সে আসবে, আবার হয়ত ফিরে এসে কুঁড়ের আশে পাশে ছালালীকে সে খুঁজে বেড়াবে। ক্রিদে পোলে যত ক'রে খাওয়াবে কে তাকে, ঘুম পোলে কে তাকে কোলে ক'রে ঘুম পাড়াবে। ছালালীর ওই ভাঙ্গা কুঁড়ে কেমন ক'রে ছেড়ে যাবে ছালালী ! কার যেন কাছার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না ? সুকুরমনি ফিরে এলো নাকি ? তার কচি হাত দু'খানা বাড়িয়ে সে যে বার বার ছালালীকে পিছু ডাকছে।

থমকে একটু দাঁড়িয়ে রক্তখাসে কুঁড়ের দিকে আর একবার ফিরে তাকালো ছালালী। ছালালীর মা কুঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদা জুড়েছে। ছালালীও কাছার ভেঙ্গে পড়লো, পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলো সে,—সুকু—সুকু—আমার সুকুরমনি !

ছালালীর মা ছালালীর দিকে চেয়ে আর একবার কেঁদে উঠলো হুঁপিয়ে। রাবণ মাঝি কানে হাত চাপা দিয়ে কিষ্টু মাঝির দিকে চেয়ে বললে,—ওকে নিয়ে যা—ওকে তোরা ঘরে নিয়ে যা।

পুলিসের একজন কনেষ্টবল ছালালীকে তড়া দিয়ে বললে,—চল—আর জ্বাকামো করতে হবে না !

যজ্ঞচালিতের মত এগিয়ে চললো ছুলালী পুলিশের তাড়ায়।

রাবণ মাঝি পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। তারই চোখের উপর দিয়ে মেয়েকে তার অপমান করতে করতে ধরে নিয়ে গেল পুলিশের লোক, কোন প্রতিকার করতে পারলে না রাবণ মাঝি। ছুলালীকে ওরা জামিনে পর্য্যন্ত খালাস দিতে রাজি হলো না, ছুলালী যে আজ খুনী মামলার আসামী। কি ভয়ানক কথা! রাবণ মাঝির বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলো; হতভাগী মেয়েটাকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই?

স্থান মাঝি ধীরে ধীরে রাবণ মাঝির সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠেছে, ক্ষুরকণ্ঠ বলে উঠলো স্থান,—ছুলালীকে ওরা ধরে নিয়ে গেল সন্দার!

রাবণ মাঝির সারা অন্তর মথিত ক'রে বাতাসের বুকে ঝরে পড়লো একটা উফ দীর্ঘশ্বাস। হতাশভাবে বলে উঠলো রাবণ,—উপায় নাই, কোন উপায় নাই।

সমবেত জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায়। সন্দার রাবণ মাঝির ক্ষুদ্র পেলে এখনো তারা পুলিশের হাত থেকে জোর ক'রে ছুলালীকে ছিনিয়ে আনতে পারে। রাবণ মাঝি তাদের এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারলে না, বিক্ষুব্ধ জনতা বহুকণ্ঠে উত্তেজনা দমন ক'রে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরলো। মাতালের মত টলতে টলতে মহল বাগানের সুড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললো রাবণ মাঝি, পা যেন তার বাড়ীর দিকে এগোতে চায় না। মেয়েটাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল, কোন ব্যবস্থা করতে পারলে না রাবণ মাঝি। কোন্ মুখে সে বাড়ী গিয়ে চুকবে! মেয়েটা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বানের জলে ভেসে গেল। রাবণ মাঝি তার উপর সুবিচার করেছে কি? সমাজের মুখ চেয়ে কি মর্যাদাসিক আঘাতই না

হেনেছে সে ছলালীর বুকে। জীবন দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে রাবণ মাঝিকে, সে দিন হয়ত কাছিয়ে আসছে। কিন্তু তার আগে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে মেয়েটাকে, যেমন ক'রে হোক তাকে বাঁচতেই হবে। রাবণ মাঝির যথা সর্বস্ব দু'হাত দিয়ে সে ছড়িয়ে দিয়ে আসবে ধূলো মাটির মত, তবু যদি—তবু যদি মেয়েটাকে কোন রকমে বাঁচাতে পারা যায়। সে চেষ্টা যে করতেই হবে রাবণ মাঝিকে।

বাড়ীর দিকে মুখ করে হাঁটতে হাঁটতে মহল বাগানের মাঝামাঝি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো রাবণ। বাঁ-হাতি মুখ ফিরিয়ে আর একটবার সে উত্তরদিক পানে তাকালো, ছলালী তখন দৃষ্টির বাইরে, পুলিশের লোকগুলোকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। রাবণ মাঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সুখন মাঝির দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে একবার তাকালো, সুখনের দিকে চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো রাবণ, —ছলালীকে নিয়ে ওরা চলে গেল সুখন ?

সুখন মাঝি জবাব দিলে,—বহুক্ষণ চলে গেছে সন্ধ্যার, এতক্ষণ ওরা কাটিজঙ্গল পার হয়ে গেল।

রাবণ মাঝির চোখের সামনে দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ তার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল। সুখন মাঝিরও চোখ দুটো ভরে উঠেছে জলে, রাবণ মাঝির ডান হাতটা চেপে ধরে ভাঙ্গাগলায় সে বলে উঠলো,—ঘরে চল সন্ধ্যার।

আরও কয়েক পা হেঁটে যেতেই হাঁপিয়ে উঠলো যেন রাবণ মাঝি, ধপ্ ক'রে একটা গাছের নীচে সে বসে পড়লো। সুখন মাঝি ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—সন্ধ্যার !

রাবণ মাঝির কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে ; উদাস ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠলো,—একটু বসি, এই গাছতলায় একটু বসি।



রাবণ মাঝির চোখে জল ! অতি করুণ ভাবে সর্দার রাবণ মাঝির দিকে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠলো স্থখন,—সদার, তুই কাদছিস ?

রাবণ মাঝি দু'হাত দিয়ে বুক খানাকে চেপে ধ'রে বললে,—কই না—সদার রাবণ মাঝি ত কাদে না, রাবণ মাঝির বুকখানা যে পাথর দিয়ে গড়া ।

কি যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলো রাবণ মাঝি । একটা পর্কতের চুড়া খান খান হয়ে বুঝি ভেঙ্গে পড়তে চায় । রাবণ মাঝির চোখ দুটো ছেপে হয়ত বা তার অজ্ঞাতেই শ্রাবণের ধারার মত নেয়ে এলো অশ্রু পাথর ।

কাপড়ের খুঁট দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে ফেললে রাবণ মাঝি ।

## শান্তা

দায়রা জজের আদালত । চাকলায়কর এক খুনের মামলার আসামী একটি সাঁওতালের মেয়ে । আদালতে ভিড় আজ একটু অস্বাভাবিক রকমের, শহর এবং শহরতলির বহু লোক এসে জমা হয়েছে মামলার বিচার শুনবার জন্য । দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁওতাল, শহরের প্রায় লাগালাগি পাহাড়তলির সাঁওতাল-পল্লীর অধিবাসী এরা । দূর থেকেও অনেকেই আজ বিচার শুনে এসেছে, দুলালীর আজ মামলার দিন । জজসাহেবের আদালত থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে, বিচার-কক্ষ নিস্তব্ধ, চারিদিকে চাপা একটা গম্ভীর ভাব । আসামীর কাঠগড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দুলালী মেয়েন, অভিযোগ তার বিরুদ্ধে গুরুতর, তার দ্বিতীয় পক্ষের সাঙাকরা স্বামী হলো মাঝিকে সে খুন করেছে ।

সরকার পক্ষ থেকে আসামীর বিরুদ্ধে নৃশংস নরহত্যার যে স্তরভিত্তিক অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তা সপ্রমাণ করবার জন্য বারো জন সরকারী সাক্ষী আদালতে উপস্থিত আছে। আসামীর অপরাধ প্রমাণ করবার ভার সরকারের, সে ব্যবস্থা যথারীতি করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে। একে একে সাক্ষীদের ডাক হতে লাগলো। সুদক্ষ সরকারী উকিল মামলার দরকারী ফাইল ও মোটা মোটা আইনের পুঁথি পত্র নিয়ে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে আছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী ছালালী মেঝেন আন্তরিক বীতশ্রদ্ধা ও উৎকট বিষেবের বশবর্তী হয়ে অহেতুক আক্রোশ বশতঃ তার স্ত্রায় সঙ্গত ও আইন সম্মত বিবাহিত স্বামী হুলো মাঝিরে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। আইনের চোখে এ অপরাধের গুরুত্ব যে কতখানি, সরকারী উকিল বাবু মামলা সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক বিবৃতি প্রসঙ্গে মাননীয় জুরি মহোদয়গণের নিকট তথা বিজ্ঞ বিচারপতি শ্রদ্ধেয় জজসাহেব মহোদয় সমীপে গোড়াতেই তা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সাক্ষীদের এজাহারে ক্রমশই প্রকাশ পেতে লাগলো হুলো মাঝির সঙ্গে ছালালীর বনিবনা ছিলো না মোটেই, হুলোকে সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখে নি; হুলো ছিলো ছালালীর জীবনে যেন মূর্ত্তিমান এক বিড়ম্বনা, সুখের পথে কষ্টক। স্ত্রায় ধর্ম্মত হুলো মাঝি যদিও ছিলো ছালালীর স্বামী, তথাপি সে স্বামীত্বের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো, পারিবারিক জীবনে ছালালী তাকে সুখ দেয় নি একটি দিনের জন্য। সরকারী উকিলের পরিচালনায় সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে মামলা সংক্রান্ত যে সকল তথ্য একে একে উদ্ঘাটিত হতে লাগলো ছালালীর পক্ষে তার কোনটাই অস্বকুল নয়। উকিল বাবু ঘটনার পারিপার্শ্বিক থেকে এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন—হুলো মাঝির হত্যাকারী ছালালী ছাড়া অপর কেউ আর

হুঁটে পায়ে না। স্থানীয় সাক্ষীদের এজাহারে স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে হুলো মাঝিকে দুলালী বরাবর ঘৃণা করতো, হুলোকে সে কতদিন বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে গলাধাক্কা দিয়ে। হুলো মাঝিকে তাড়াবার জন্ত, হুলোর হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পাবার জন্ত ঢের আগে থেকেই চেষ্টা ক'রে আসছিলো দুলালী মেয়েন; অপর কোন সহজ পন্থায় তা সম্ভব হয় নি, তাই পথের কাঁটা সে উপড়ে ফেলেছে হুলো মাঝিকে একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়— পরিকল্পিত; সাময়িক উত্তেজনার অভিব্যক্তি নয়, ডেলিবায়েট নার্ডার। আসামীর দ্বারা আদৌ এ কাজ সম্ভব কি না সে বিষয়ে বিচারকদের মনে গোড়াতেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, সরকারী উকিল বাবু তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে ঘটনার পরিস্থিতি ও আসামীর মনোভাব সম্বন্ধে পূর্বেই তা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সর্দার রাবণ মাঝি ও সমাজের অন্যান্য শুভামুখ্যায়িগণ আসামীকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলো স্বচ্ছন্দ ও সুসংযত পারিবারিক জীবন যাপনের। কলিয়ারি থেকে তাকে কিরিয়ে আনার পর দুলালীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তাই হুলো মাঝির সঙ্গে। আসামী 'দুলালী মেয়েন মনে মনে কিন্তু এ ব্যবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি, অপরাধ-প্রবণ তার উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে। ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও সাক্ষীদের জবানবন্দী আসামীকে একবারো দোষী বলেই সাক্ষ্য করে, সরকারী উকিল বাবুর অকাট্য যুক্তিঞ্জাল এই সিদ্ধান্তকেই অমুসরণ করে এগিয়ে চলেছে মামলার সূত্র থেকেই।

দুলালী নির্বাক। আসামীর কাঠগড়া থেকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে চেয়ে আছে বিচারকের দিকে। দর্শকদের চোখে রহস্য যেন ক্রমশই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। আসামীর পক্ষে মামলার তদ্বির করছে

রাবণ মাঝি নিজে। জবরদস্ত উকিল দিয়েছে সে মোটা টাকা খরচ ক'রে। সরকারী উকিলের সঙ্গে সমান তালে তিনি সওয়াল জবাব ক'রে যাচ্ছেন আসামীর পক্ষ নিয়ে। কিন্তু আসামী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ এ কথা প্রমাণ করবার জন্য নির্ভর যোগ্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করতে পারেনি রাবণ মাঝি, শুধু উকিলের তর্কযুক্তি ও আইনের নারপ্যাচ শেষ পর্যন্ত আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত ক'রে বে-কসুর খালাস দিতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে রাবণ মাঝি কোন মতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

সরকারী সাক্ষীদের এজাহার শেষ হতেই বিচক্ষণ বিচারক আসামীর দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার কিছু বলবার আছে ?

হুলালী কি জবাব দেবে ? কি তার বলবার আছে তাও ত সে জানে না। যে কথা সে বলতে চায় তা কি এরা বিশ্বাস করবে ? তার মত কোন লক্ষণই যে দেখতে পাচ্ছে না হুলালী। হুলালীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার জন্য কি বিরাট ব্যবস্থাই না করা হয়েছে, এ সব যে হুলালীর ধারণার বাইরে। হুলো মাঝিকে খুন করেছে বলে হুলালীকে এরা সন্দেহ করে, কি আশ্চর্য্য ! কিন্তু খুন ত সে করেনি, হুলালীর হয়ে কে আজ এদের বুঝিয়ে দেবে যে হুলো মাঝির হত্যাকারী অপর কেউ, হুলালী মেঝেন নয়। এরা সব একসঙ্গে জোট পাকিয়ে হুলালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, হুলালীকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিতে পারলে এরা যেন বাঁচে। কিন্তু ধর্ম—মাথার উপর ধর্ম কি নাই, ভগবান—মারাং বুক—সে কি আজো আছে ? মুক্তির এতটুকু আলো হুলালী যে খুঁজে পাচ্ছে না গভীর এই অন্ধকারের মধ্যে। বিচারকদের কেমন ক'রে সে বোঝাবে তার মনের কথা, সে কথা কি ওরা বুঝবে ?

দুলালী নিকন্তর। আশামীর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে সংক্ষেপে তা আর এক দফা উল্লেখ করে বিজ্ঞ বিচারপতি পুনরায় দুলালীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে ?

দুলালীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো, মুখ দিয়ে তার কথা সরছে না, জজ সাহেবের দিকে চেয়ে ভাঙ্গাগলায় কোন রকমে সে বলে উঠলো,—খুন আমি করি নাই হুজুর, আমি কিছু জানি না ; ধর্ম বলছি, আমি কিছু জানি না।

রাবণ মাঝির বৃকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। মামলার সাতদিন আগে থেকে গাঁ ছেড়ে সে ধরা দিয়ে পড়ে আছে শহরে, মেয়েটাকে যদি কোন রকমে সে বাঁচাতে পারে। রাবণ মাঝির মন বলছে দুলালী একাজ করে নি, একাজ সে করতে পারে না। হুলো মাঝিকে খুন করেছে মোহন—নিশ্চয়ই মোহন, এ বিষয়ে রাবণ মাঝির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। দুলালীর মোহ কোন মতেই কাটাতে পারেনি সে শয়তান, হুলো মাঝিকে তাই রাতারাতি খুন ক'রে চূপচাপ সে সরে পড়েছে। পুলিশের লোকের কাছে মোহন মাঝির নাম পর্যন্ত বাতলে দিয়েছিলো রাবণ মাঝি, কিন্তু কৈ—সে শয়তান ত ধরা পড়লো না, খুনের দায়ে এরা ধরে নিয়ে এলো দুলালীকে। দুলালীর জীবনে কি কুগ্রহই না জুটেছিলো ওই মোহন মাঝি, কি দুশমনিই না করেছে সে রাবণ মাঝির সঙ্গে। একটি বার যদি তার দেখা পেতো রাবণ—পারতো যদি সে মোহন মাঝিকে ধরে এনে কোন রকমে একবার আদালতে হাজির ক'রে দিতে—রাবণ মাঝির মনটা অনেক হালকা হয়ে যেতো, দুলালী হয়ত বেঁচে যেতো খুনের দায় থেকে। কিন্তু সে আর হয় না, সে শয়তান পালিয়েছে—শাস্তির ভয়ে সে পালিয়েছে।

রাবণ মাঝির কপালের রেখাগুলো ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, জল জল ক'রে জলে উঠলো তার চোখ দুটো ; একবার—কোন রকমে একবার যদি সে নাগাল পেতো মোহন মাঝির ! কিন্তু যেয়েটা বে কাদে, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁদেপড়া পাখীর মত হতাশভাবে সে চেয়ে আছে হাকিমের দিকে,—খুন আমি করি নাই হজুর—খুন আমি করি নাই ।

ওরা কি শুনছে ? ছালালীর কথা কি ওরা মন দিয়ে শুনছে ?

রাবণ মাঝির বুকের শিরাগুলোয় কে যেন মোচড় দিয়ে টানতে লাগলো । খুন আমি করি নাই হজুর—কি করণ, কি মর্মান্তিক । রাবণ মাঝির জরাজীর্ণ বুকখানা ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে না, এও এক আশ্চর্য্য !

পাথরের মূর্তির মত শুধু ক্যাল ক্যাল ক'রে কাঠগড়ার দিকে চেয়ে আছে রাবণ মাঝি, করবার তার কিছু নাই, টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো রাবণ মাঝির চোখ দুটো ছেপে ।

হুখন মাঝি পাশ থেকে মৃদু একটা নাড়া দিয়ে বলে উঠলো, —সদার !

কিষ্ট মাঝি একটু সাহস দিয়ে বললে,—কোন চিন্তা নাই সদার, তুই এত ভাবনা করিস না ।

রাবণ মাঝি আবার সজাগ হয়ে উঠলো । বিচারের শেষ পর্য্যন্ত না দেখে সে হতাশ হবে না, হতাশ হলে যে চলবে না তার ; বৈধ্য তাকে রাখতেই হবে ।

রাবণ মাঝির কয়েকজন প্রতিবেশী তার সঙ্গে এসেছে । সদার রাবণ মাঝিকে কোন রকমেই এরা মুসড়ে পড়তে দেয়নি, বরাবর তাকে ভরসা দিয়ে যাচ্ছে—যেয়েটা হয়ত খালাস পেয়ে যাবে । ভালুকপোতার

টুয়াই মাঝি পর্যন্ত লোকজন সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছে আজ রাবণ  
 মাঝির সঙ্গে। সমাজের মুখ চেয়ে সন্ধার রাবণ মাঝির মেয়ের সম্বন্ধে  
 যত কঠোর ব্যবস্থাই এরা ক'রে থাক না কেন, এতবড় একটা খুনের  
 মামলায় মেয়েটার সাজা হয়ে থাক, এটা কিন্তু কারো অভিপ্রেত নয়।  
 ঘটনার পাকচক্রে যে সঙ্গীন অবস্থার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে আজ  
 ছালালীকে, তার মূলে প্রত্যক্ষ যে কারণই থাক—সাঁওতালী সমাজের  
 কঠোর ব্যবস্থা যে কিছুটা অন্ততঃ এর জন্ত দায়ী একথা আজ কোন  
 মতেই অস্বীকার করতে পারছে না টুয়াই মাঝি। বিচার তারা ঠিকই  
 করেছিলো, কিন্তু তবু শাস্তিটা আর একটু হালকা ক'রে নিলেও  
 সমাজের হয়ত বিশেষ কোন ক্ষতি হতো না। কোন রকম দুর্বলতার  
 প্রশ্ন দিতে সেদিন কিন্তু রাজি হয়নি টুয়াই মাঝি, হুলো মাঝির সঙ্গে  
 তাই ছালালীর বিয়ে দিতে রাবণ মাঝি বাধ্য হয়েছিলো। ফল কিন্তু  
 এর কোন দিক থেকেই ভাল হলো না, কেমন ক'রে যে কোন দিক দিয়ে  
 হঠাৎ কি সব কাণ্ড ঘটে গেল,—হতভাগী মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত  
 পড়তে হলো খুনের দায়ে। টুংরাটা বিবাগী হয়ে গেল,—ওরি জন্তে  
 বিবাগী হয়ে গেল, হুলোর সঙ্গে ছালালীর বিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ  
 একদিন মনের খেদে দেশান্তরী হয়ে গেল টুংরা। কোথায় যে সে  
 গেল—কোন পাত্তাই আর পাওয়া গেল না। রাবণ মাঝির মেয়েটাকে  
 ভালবাসতো টুংরা, টুয়াই মাঝি কিন্তু সে ভালবাসার এতটুকু মূল্য  
 দেয়নি। এইখানে কি টুয়াই মাঝি একটু ভুল করেছে? জীবনের  
 শেষ প্রান্তে এসে বৃদ্ধ টুয়াই মাঝি কি হঠাৎ ভুল ক'রে বসলো? না  
 —না—সে সম্ভব নয়, যা করা হয়েছে, বিলকূল সব ঠিকই হয়েছে।  
 এর জন্ত টুয়াই মাঝির যত ক্ষতিই হোক টুয়াইকে তা সয়ে নিতে হবে,  
 কোন উপায় নাই। কিন্তু হতভাগী মেয়েটার মুখের দিকে যে চাইতে

পারছে না টুয়াই মাঝি, আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হলো মেয়েটাকে! হে ভগবান, একেই টুংরা ভালবেসেছিলো! কিন্তু ওটাকে বাঁচাবার কোন শক্তিই নাই যে আজ টুয়াই মাঝির হাতে। এর জন্য যদি টুয়াই মাঝিকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়? পারবে কি—পারবে কি টুয়াই মাঝি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দুলালীর হয়ে সাক্ষী সাক্ষী দিতে? না—না—তা হয়ত সে পারবে না, জীবনে যে কোনদিন মিথ্যে কথা বলে নি টুয়াই; সে হয় না। কিন্তু টুয়াই মাঝি কোন মতেই ভেবে পাচ্ছে না খুনী মানলার একটা আসামীর জন্তে হঠাৎ তার আজ এ দুর্বলতা কেন! মেয়েটা কি যাহু জানে? ওর চোখে মুখে যাহু, ওর সর্বাত্মক যাহু, টুংরাকে ও যাহু করেছিলো; আজ হয়ত টুয়াই মাঝিকেও—বৃদ্ধ টুয়াই মাঝিকে পর্যন্ত যাহু ক'রে ফেলেছে ওই যাহুকরীটা।

রাবণ মাঝির পাশে দাঁড়িয়ে দুলালীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে টুয়াই। মেয়েটা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠছে ভয়ে। বলবার মত কোন ভাবাই সে খুঁজে পাচ্ছে না, আদালতকে বোঝাবার তার কিছু নাই; অতি কৰুণভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু দুটি কথাই সে বলে যেতে লাগলো,—আমি কিছু জানি না হুজুর, ধর্ম বলছি, আমি কিছু জানি না।

চঞ্চল হয়ে উঠলো আবার রাবণ মাঝি, টুয়াই মাঝির ডান হাতটা চেপে ধরে চাপাগলায় সে বলে উঠলো,—উত্তাজ!

টুয়াই মাঝি সাড়া দিলে,—সদার!

ক্ষিপ্ৰকণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—আমি জানি উত্তাজ, মুলোকে কে খুন করেছে, আমি জানি।

টুয়াই মাঝি চাপাগলায় বললে,—একটু আস্তে।



স্থান আর কিছু মাঝি মিলে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো রাবণ মাঝিকে। রাবণ মাঝি একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো,—আমি তাকে জানি যে, সে শয়তানকে আমি চিনি—খুব ভাল ক’রে চিনি।

সরকারী উকিলের বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে। চাপা একটা গুপ্তন উঠলো আদালতের এক প্রান্তে, কোর্ট ইন্সপেক্টর তাকালেন একবার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, জজ সাহেবের আরদালী রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে বলে উঠলো,—এই মাঝি,—গোলমাল কিসের, চূপচাপ বস ওইখানে।

রাবণ মাঝির সঙ্গীরা তাকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলে, চূপচাপ সে একপাশে বসে পড়লো। মনের মধ্যে ঝড় বইছে রাবণ মাঝির, গুরগুর ক’রে কাপছে তার সর্বাস্ব। এরা ত কই ভুলেও একবার মোহন মাঝির নাম করলে না! বিচার এরা করবে কেমন ক’রে, আসল যে আসামী তাকে যে এরা ধরতেই পারে নি। সে পালিয়েছে, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দেশ ছেড়ে সে পালিয়েছে।

মোহনের সম্বন্ধে রাবণ মাঝির যে ধারণাই হোক, মোহন মাঝি কিন্তু পালায়নি। বহুকষ্টে আত্মগোপন ক’রে সাঁওতাল পরগণার এই অঞ্চলেই পাগলের মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাস ছয়েকের উপর। খুনের মামলায় দুলালী আজ আসামী, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক’রে নিয়ে এসেছে, মামলার স্তূপ থেকে এ পর্যন্ত সব কিছুই যে খবর বেখেছে মোহন। সাহস ক’রে সে বাইরে নিজেকে প্রকাশ করতে পাবেনি, চারিদিকে তার শত্রু, মোহনকে তাই বাধ্য হয়ে একটু আত্মগোপন ক’রে থাকতে হয়েছে। পালাতে সে পারেনি কোনমতেই, দুলালীকে এ অবস্থায় একা ফেলে সে যাবে কোথায়! যদি যেতে হয়—দুলালীকে সে সঙ্গে নিয়েই যাবে। কিন্তু সে সুযোগ কি পাবে মোহন? মাঝিলায় যদি দুলালীর

সাজা হয়ে যায়—সে আঘাত যে তীরের মত লাগবে এসে মোহন মাঝির বুকে, মোহন হয়ত সহিতে পারবে না। স্বকুমারি গেছে, মোহনের সেই স্বকু—বড় সাধের, বড় আদরের স্বকু, দুলালীর কুঁড়ে থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল মেয়েটা। মোহন মাঝির পক্ষে এ যে একটা কত বড় আঘাত—জানেন তার অন্তর্ধামী। এরপর যদি দুলালীকেও হারাতে হয়—পাগল হয়ে যাবে মোহন মাঝি, শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যাবে। একটা মাত্র পথ এখনো খোলা আছে মোহন মাঝির সামনে, চেষ্টা করলে দুলালীকে হয়ত সে বাঁচাতে পারে। গভীর হতাশার গহীন অন্ধকার তেলে ক্ষীণ একটা আলোর আভাস মাঝে মাঝে আলোয়ার মত জলে উঠে মোহনকে যেন পথ দেখাচ্ছে, চেষ্টা করলে এখনো হয়ত দুলালীকে সে বাঁচাতে পারে।

জজ সাহেবের আদালতে লোকের ভিড়ে চূপচাপ এসে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মোহন। দূর থেকে সে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে সবই। আসামীর কাঠগড়ায় দুলালী, চোরের মত সর্বান্তে চাদর মুড়ি দিয়ে; দূর থেকে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে মোহন। দশজনের সামনে নিজেকে যেন প্রকাশ করতে কোন মতেই সে ভরসা পাচ্ছে না। মোহন মাঝির মন বলছে,—এগিয়ে যা ভীকু—এগিয়ে যা, কাঠগড়া থেকে দুলালীকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে দাঁড়া এই আদালতের সামনে; দুলালীর সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে পারিস যদি প্রকাশ্য এই আদালতে মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রে দে,—হুলো মাঝিকে খুন করেছি আমি। দুলালী বাঁচুক, বেঁচে যাক সে খুনের দায় থেকে।

মোহন মাঝি তাই করবে, বাঁচাতেই হবে দুলালীকে, এ ছাড়া আর পথ নাই। জান যদি দিতে হয় মোহন মাঝিকে তাও মোহন দেবে, আপদোস নাই। মোহনের বুকটা তবু ছুর ছুর ক'রে কাঁপছে কেন,

ভয় ? কিসের জেল, ফাঁসি, দীপান্তর ? কিন্তু মরতে ত সে প্রস্তুত, তবে  
আর ভয় কিসের ? এ ভয় মোহনকে জয় করতে হবে, যেমন ক'রে  
হোক জয় করতে হবে ।

সাক্ষীদের এজাহার শেষ হয়ে গেছে, বক্তৃতা চলছে সরকারী উকিলের ।  
মামলার কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চললো সমাপ্তির দিকে । দুলালীর এই  
খুনের মামলা এ অঞ্চলে বেশ একটা চাকল্যের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ ক'রে  
সাঁওতালদের মধ্যে । আদালতে আজ ভিড় একটু বেশি । তীরনাজ  
টুংরা মাঝি পর্য্যন্ত খবর পেয়ে গেছে দেহাতের সাঁওতালদের মুখে,  
পুলিস গিয়ে নাকি দুলালীকে ধরে নিয়ে এসেছে জুলো মাঝির খুনের  
দায়ে, সহরের আদালতে, মামলা চলছে দুলালীর বিরুদ্ধে । এ যে  
ভয়ানক গোলমালে কথা, ঠিক যেন একটা হৈয়ালির মত । টুংরাকে  
তাই বহুদূর থেকে ছুটে আসতে হলো, ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে  
হবে । কিন্তু কি আশ্চর্য্য, খুনের দারে ওরা দুলালীকে ধরে নিয়ে  
এলো কেন, মামলা ওদের চলবে কেমন ক'রে !

সহরের রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চলেছে টুংরা । পায়ে তার  
এক হাঁটু লাল ধুলো । টুংরাকে দেখে হঠাৎ যেন চেনা যায় না । মুখে  
তার এক মুখ দাড়ি জমেছে, উস্কো খুস্কো একমাথা রুক্ষ চুল, আঁচুলের  
ভগা ছেপে নখগুলো তার বেড়ে উঠেছে ভালুকের নখের মত । চোখ  
একটা কানা হয়ে গেছে টুংরার, সে অনেক দিনই গেছে । কাঁড় খেজুক  
কাঁধে ফেলে, প্রকাণ্ড একটা ঝোলায় ক'রে কতকগুলো জিনিস পত্র  
পিঠে ঝুলিয়ে তার একমাত্র প্রিয়সঙ্গী বাবড়ুর গলার শিকলটা ধরে  
টানতে টানতে এগিয়ে চললো টুংরা । ভয়ানক তার দেহি হয়ে গেছে,  
তাড়াতাড়ি আদালতে পৌঁছে বটগাছের শিকড়ে ভালুকটাকে বেঁধে দিয়ে  
খুঁজে খুঁজে জঙ্গলাহেবের আদালতে গিয়ে হাজির হলো টুংরা । সরকারী

উকিলের বক্তৃতা চলছে পুরোদমে, পুলিশ পাহারার মাঝখানে কাঠগড়ার উপর শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে হুলালী। বারান্দার এক পাশে চুপচাপ ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো টুংরা, কান খাড়া ক'রে সে উকিল বাবুর বক্তৃতা শুনতে লাগলো। কিন্তু হুলালীকে এরা অনর্থক কষ্ট ক'রে ধরে নিয়ে এলো কেন, টুংরার কাছে এ যেন একটা হেয়ালি। দূর থেকে সে চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সরকারী উকিল মানলার স্বরু থেকে আরম্ভ করে ঘটনার আত্মোপাস্ত আর একদফা বিশদভাবে আলোচনা ক'রে গেলেন জুরি বাবুদের সামনে। সরকারী সাক্ষীদের এক্কাহার, ডাক্তারের রিপোর্ট, ভার প্রাপ্ত দারোগার তদন্তের ফলাফল ও তাঁর জবানবন্দি এবং যে অবস্থায় ও যে পরিবেশের মধ্যে থেকে খুন হয়েছে মূলো মাঝি, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে আসামীর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে হবে বিচারকদের। আসামীর অপরাধ যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে থাকে, আইনের চোখে শাস্তি তার অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে শুধু বিচার ক'রে দেখতে হবে সরকার পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আদালতের সামনে উপস্থিত করেছেন—নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ হয়েছে কিনা। প্রমাণ যদি হয়ে থাকে—জুরি মহোদয়গণ পেনাল কোডের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী আসামীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবেন। প্রমাণ যদি হয়নি বলে তাঁরা মনে করেন, আসামী তা হলে আইনের চোখে নির্দোষ। আসামীর সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার কালীন মাত্র দু'টি শব্দ তাঁরা ব্যবহার করবেন,—দোষী, কি নির্দোষ; গিল্টি, অর নট গিল্টি।

জজসাহেবের পাশে জুরি মহোদয়গণ রীতিমত সজাগ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে ধীরে ধীরে যেন ফুটে উঠতে

লাগলো সক্রিয় মস্তিষ্কের স্থতীকৃত বিচার বুদ্ধি প্রসূত দৃষ্ট একটা পরিণতির  
আভাস,—দোষী, কি নির্দোষ ; গিল্টি, অর নট গিল্টি ?

সরকারী উকিল বাবু পুনরায় বলে যেতে লাগলেন,—জেন্টল মেন  
অব্দি জুরি, আর একটা কথা আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের শ্রবণ  
করিয়ে দিতে চাই, আসামীকে আপনারা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ধরে  
নিরেই আপনাদের বিচার বুদ্ধিকে সব সময়ই পরিচালিত করবেন শুধু  
মামলা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর স্তত্র ধরে। আসামী দুলালী মেঝেনের  
বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও খুঁটি নাটি তথ্যগুলি একে একে  
আপনাদের সামনে ধরা হয়েছে, একমাত্র তারই উপর নির্ভর ক'রে  
এ মামলার বিচার করতে হবে। কোন কারণে যদি আপনাদের মনে  
কিছু মাত্র সন্দেহ জাগে তা হলে ধরে নিতে হবে অভিযোগের সত্যতা  
প্রমাণ হয়নি, এবং সে ক্ষেত্রে আপনারা আসামীকে নির্দোষ বলে  
খালাস দিতে পারেন। কিন্তু দয়া ক'রে সব সময়ই এ কথাটা শ্রবণ  
রাখবেন যে ভিত্তিহীন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আসামীর দোষগুণ সম্বন্ধে  
নতামত ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। আপনাদের যে সন্দেহ  
তা হবে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত ও যথোচিত কারণ সঙ্গত, সরকারী আইনের  
সংজ্ঞায় যাকে বলে রিজ্‌নেবল ডাউট। আমি আশা করি আপনাদের  
ভাবভিক্তি সম্বন্ধে আপনারা একমত হবার চেষ্টা করবেন। আপনাদের শুধু  
সংক্ষেপে নতামত ব্যক্ত ক'রে জানাবেন,—আসামী দোষী, কি নির্দোষ।

মামলার সঙ্গীন মুহূর্ত কাছিঁয়ে আসছে। নিস্তরক বিচার কক্ষের  
আবহাওয়া যেন অতিমাত্রায় ভারী হয়ে উঠেছে সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিরুদ্ধ  
নিঃশ্বাসের চাপে। কারো মুখে সাড়া শব্দ নাই, সকলের মনেই ব্যাপক  
ভাবে যেন জেগে উঠেছে ওই একটি মাত্র প্রশ্ন,—আসামী দোষী, কি  
নির্দোষ ?

সর্দার রাবণ মাঝি রুদ্ধভাবে চেয়ে আছে আদালতের দিকে। কান  
 ঝাড়া ক'রে সে শুনে যেতে লাগলো সরকারী উকিলের শেষ দিকের  
 শব্দগুলো,—আসামী দোষী, কি নির্দোষ। এরা যদি একসঙ্গে  
 আসামীকে দোষী বলে রাগ দিয়ে দেয়, তা হলে যে দুলালীকে বাঁচাবার  
 মার কোন উপায় থাকবে না। এরা যে সব দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে  
 রাজ দুলালীর বিরুদ্ধে, এদের কারো ইচ্ছা নয় যে মেয়েটা বাঁচুক। রাবণ  
 মাঝি টুয়াই মাঝিকে হঠাৎ একটা কাঁকি দিয়ে বলে উঠলো,—উস্তাজ!

রাবণ মাঝির মুখের দিকে শুধু করুণভাবে তাকালো একবার  
 রাই মাঝি।

মনে মনে বেশ বুঝতে পেরেছে দুলালী কি সাংঘাতিক অবস্থার  
 সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। দুলালীর চোখের উপর যেন বলির  
 ঝাড়া নাচছে। হাকিমের দিকে চেয়ে ভাঙ্গাগলায় সে হঠাৎ একবার  
 স্বীকার ক'রে উঠলো,—হজুর!

জজসাহেব তাকালেন একবার দুলালীর দিকে, বললেন,—কিছু  
 বলতে চাও?

দুলালী কাতর কণ্ঠে আর একবার বলে উঠলো,—খুন আমি  
 করি নাই হজুর।

মূল্যহীন অহেতুক কাকুতি, যুক্তিহীন ব্যর্থ আবেদন, জজসাহেব  
 তাঁর ধীরে মুখ ফেরালেন।

মোহন মাঝির মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। দুলালীকে বাঁচাতে  
 লে সময় যে আর নাই। এই বেলা গিয়ে মোহন মাঝি ধরা দিয়ে  
 দবে নাকি? মোহনের হাতপাগুলো কিন্তু থর থর ক'রে কাঁপছে,  
 গিয়ে যেতে যে ভয় করছে মোহনের; ধরা দিতে সে পারছে না  
 কান মতেই।

গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব কত বিকৃত হয়ে উঠলো মোহন মাঝি। তবে কি সে পালাবে, হাকিমের রায় বেরোবার আগেই চুপি চুপি কে পালাবে? না—না—সে ত সম্ভব নয়, তার চেয়ে যে ধরা দেওয়া অনেক ভাল, মোহন মাঝি ধরাই দেবে।

নিজের মনেই কি ভাবতে ভাবতে আদালতের সামনের দিকে ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে গেল মোহন, এদিক ওদিক একটুখানি তাকালো, তারপর সে হঠাৎ কি গনে ক'রে থমকে একটু দাঁড়ালো আবার বারান্দার এক পাশে। গায়ের চাদরখানা কেড়েঝুড়ে মাথার দিকে একটুখানি টেনে দিয়ে মুখটা আর একটু ঢেকে নিলে মোহন। করুণভাবে তাকালো সে আর একবার ভুলালীর দিকে।

ওপাশ থেকে রাবণ মাঝি লক্ষ্য করেছে—এপাশের বারান্দায় কে একটা লোক সর্কাক্ষে চাদর মুড়ি দিয়ে সম্ভ্রান্তভাবে চলা ফেরা করছে, দেখতে ঠিক মোহন মাঝির মত। মুখের কাপড়খানা তার একটুখানি সরে যেতেই লোকটাকে হঠাৎ চিনে ফেললে রাবণ। সন্দ্বিধ রাবণ মাঝির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় সে ডাক দিলে একটা,—সুখন!

সুখন মাঝি সাড়া দিবার আগেই রাবণ মাঝি তার হাত ধরে টানতে টানতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ইদিকে একটু উঠে আয় দেখি।

সুখন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হলো রাবণ মাঝি ওপাশের বারান্দায়। চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটার ডান হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে মুখের কাপড়টা তার সরিয়ে দিলে রাবণ মাঝি। সুখন মাঝি চেয়ে দেখে মোহন, সঙ্গে সঙ্গে সে চেপে ধরলে তার বাঁ হাতখানা। রাবণ মাঝি দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো,—শয়তান, আর তুমি পালাবে কোথায়!

মোহন মাঝি কেমন যেন একটু ভাবাচ্যাকা ঈষরে গেল, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে একটি কথাও সরলো না। স্মৃখন মাঝির দিকে চেয়ে গর্জিত কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—ধরে নিয়ে চল একে হাকিমের কাছে।

রাবণ মাঝি আর স্মৃখন মাঝি মিলে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে ধরে নিয়ে চললো মোহন মাঝিকে আদালতের সামনে। যন্ত্রচালিতের দ্যত টলতে টলতে এগিয়ে চললো মোহন, বাধা দেবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই তার, কি যেন এক অজানা আশঙ্কার ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো মোহন মাঝি। স্মৃখন মাঝি তাকে ঠেলতে ঠেলতে সামনের দিকে দিলে একটা ধাক্কা।

সমাগত দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সাদা পড়ে গেল। সরকারী উকিলের বক্তৃতা চলছে, অনর্গল তিনি বলে যাচ্ছেন,—অপরাধ যদি প্রমাণ হয়ে থাকে, আসামীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। ভুলে যাবেন না আপনারা—কতখানি জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে নির্দয় ভাবে হত্যা করা হয়েছে মুলো মাঝিকে। ফলনা করুন আপনারা সেই ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য, মনে করুন আপনারা চোখের সামনে কুপিয়ে কুপিয়ে লোকটাকে হত্যা করা হচ্ছে। মাননীয় জুরি মহোদয়গণ—

বাইরের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল। উকিল বাবু বলে যেতে লাগলেন,—মাননীয় জুরি মহোদয়গণ, সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্টই দেওয়া হয়েছে, আপনারা এখন বিবেচনা করুন, প্রকাশ্য এই ধর্ম্মাধিকরণে আপনারা সৃষ্টিস্তিত অভিমত ব্যক্ত ক'রে বলুন আপনারা,—আসামী দোষী, কি নির্দোষ?

মোহন মাঝিকে টেনে হিঁচড়ে আদালতের প্রায় সামনেটায় এনে ফেলেছে ওরা। ভিড়ের মধ্যে একটা হৈ-চৈ বেধে গেল তুমুল। রাবণ মাঝি দূর থেকে হঠাৎ চীংকার ক'রে উঠলো,—হজুর!



কোর্ট ইনস্পেক্টর ভিতর থেকে বলে উঠলেন,—অর্ডার—অর্ডার।

মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুর সামনের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন,—হোয়াট্‌স্‌ দি ম্যাটার—কি হলো আবার ?

একজন কনেটবল তাড়াতাড়ি রাবণ মাঝির সামনে গিয়ে একটা ধমক দিয়ে বললে,—কিয়া হ্যায় ?

রাবণ মাঝি চীৎকার ক'রে বলে উঠলো,—হজুর, খুনী আসানী ধরা পড়েছে।

চকিতে একটা সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। মোহন মাঝিকে টানতে টানতে রাবণ মাঝি দাঁড়ালো এসে দরজার সামনে। জজসাহেব একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন,—হ ইজ্‌ জাট হাড়াম হড় ?

সরকারী উকিল বলে উঠলেন,—পাগল।

কোর্টবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন,—নিকালো—নিকালো হিঁয়াসে।

রাবণ মাঝি হাকিমের দিকে চেয়ে আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলো,—হজুর !

জজসাহেব বলে উঠলেন,—এলাও হিম্—এলাও হিম্‌ টু কান ইন প্রিজ্‌,—আসতে দিন।

মোহন মাঝিকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে আদালতের নাকশানে দাঁড় করিয়ে দিলে রাবণ মাঝি। হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো মোহন।

আদালত শুদ্ধ লোক বিস্মিতভাবে চেয়ে আছে মোহনের দিকে। টুংরা মাঝি দূর থেকে লক্ষ্য করছে, দেখে শুনে অবাক মেরে গেছে টুংরা ; মোহন মাঝিকে ওরা টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে এলো কেন হঠাৎ ! কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছুলালী একবার চমকে উঠলো মোহন মাঝিকে দেখে।

হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—হজুর, এই লোকটাই খুন করেছে ছলো মাঝিকে, আমি জানি—নিশ্চয় এ খুন করেছে, এই তোদের ফেরার আসামী।

জজসাহেব ও জুরিবাবুগণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। সরকারী উকিল বাবু একটু ভ্র কুণ্ঠিত ক'রে বললেন,—এ তুই কি বলছিস মাঝি, কে এ লোকটা ?

সর্দার রাবণ মাঝির চোখ দুটো যেন দগ্ধ ক'রে জলে উঠলো একবার, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো রাবণ মাঝি,—শয়তান—এ একটা শয়তান।

আসামী পক্ষের উকিল জজসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন,—ইঁওর অনার, ব্যাপারটা মিষ্টিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে।

বিজ্ঞ বিচারপতি একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—লোকটার নাম ?

সর্দার রাবণ মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—মোহন মাঝি, সাকিম ঘুসককাটা ; নামটা ওর লেখে লে হজুর, এরি নাম মোহন চুড়।

মোহন মাঝি, নামটা যেন সকলেরি চেনা, সাক্ষীদের জবানবন্দির মধ্যে মোহন মাঝির নাম কয়েক বারই শোনা গেছে। এরি সঙ্গে ছলালী মেঝেন গৃহত্যাগ ক'রেছিলো, কিন্তু বর্তমান মামলার সঙ্গে মোহন মাঝির সম্পর্ক কি ? রাবণ মাঝি লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে ধরে এনে এর মধ্যে জড়াতে চায় কেন ! সকলের কাছেই ব্যাপারটা যেন একটা হৈয়ালির মত হয়ে উঠলো। বিজ্ঞ বিচারপতি তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন একবার মোহন মাঝির দিকে। রাবণ মাঝি বলে উঠলো,—তোরা একে কবুল করা হজুর, যেমন ক'রে হোক কবুল করা।

গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন জজসাহেব,—আসামী ছলালী মেঝেনের বিরুদ্ধে আদালতে যে মামলা চলছে সে সূত্রে তুই কিছু জানিস মাঝি ?

মোহন মাঝি মনে মনে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে,—জানি হজুর, হুলো মাঝিকে আমি চিনতুম, দা দিয়ে কুপিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে।

সকলেই বিস্মিতভাবে তাকালো একবার মোহন মাঝির দিকে। জজসাহেব পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন,—কে—কে তাকে খুন করেছে তুই বলতে পারিস ?

দুলালীর করুণ মুখখানা আর একবার ভেসে উঠলো মোহন মাঝির মনের পর্দায়। আসামীর কাঠগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে, মোহনের ঠিক পিছনে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জজসাহেবকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো মোহন,—আমি—আমি তাকে খুন করেছি, আসামীর কোন অপরাধ নাই হজুর, হুলো মাঝিকে খুন করেছি আমি।

মুহূর্তের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠলো সকলেই। ভিড়ের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো টুংরা। মোহন মাঝি বলে কি, কি তার মতলব, সে কি দুলালীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে ? কিন্তু কেন—কোন অধিকারে ; দুলালীর সে কে ?

সরকারী উকিল বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—ইওর অনার, লোকটা অজ্ঞানভাবে আসামীকে ডিকেণ্ড করবার চেষ্টা করছে।

আসামী পক্ষের উকিল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—ইওর অনার, মোহন মাঝির পূর্ণ বিবৃতি অজ্ঞগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করা হোক।

সরকারী উকিলের দিকে চেয়ে পুনরায় বলে উঠলেন তিনি,—আর সেই সঙ্গে আমি এ কথাও নিবেদন করছি,—আনার অভিজ্ঞ বন্ধু সরকারী উকিল মহাশয় যেন দয়া ক'রে এ বিবয়ে কোন বাধার সৃষ্টি না করেন।

মোহন মাঝি সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠলো,—আমাকে তোরা কয়েদ কর হজুর—তোরা আমাকে শাস্তি দে, হুলো মাঝিকে আমি খুন করেছি, নিজের হাতে আমি তাকে খুন করেছি।

দুলালী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ সে একবার আন্তরিকভাবে চীৎকার ক'রে উঠলো,—হজুর !

জজসাহেব আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মোহন নাথিকে,—হুলো নাথিকে যে তুই খুন করেছিস—তার প্রমাণ ? তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি তোরা ?

মোহন নাথি জবাব দিলে,—হজুর, সে ছিলো আমার পরম শত্রু । আমার পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হুলো নাথি তাকে সাঙা করেছিলো । রাগ আমি সামলাতে পারি নাই হজুর, খাদ তরফ থেকে ফিরে এসে হুলোকে একদিন রাত্তির বেলা চুপি চুপি আমি শেষ ক'রে দিয়েছি ।

ব্যাপারটা অসম্ভব নয়, সকলের মনেই গভীর একটা সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো । টুংরা নাথি কিন্তু অবাক বেগে গেছে মোহন নাথির শরতানি দেখে । দুলালীকে বাঁচাবার সে কে ? সে অধিকার যদি কারো থাকে—সে টুংরার, মোহন নাথির নয় ।

জজসাহেব বাহাদুর মনে মনে সন্দেহ হয়ে উঠেছেন যথেষ্ট, ব্যাপারটা অসম্ভব নাও হতে পারে, মোহন নাথিকে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন,—হুলো নাথিকে কোন্ অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে তুই বলতে পারিস ?

মোহন নাথি বলে উঠলো,—দা দিয়ে আমি তাকে খুন করেছি হজুর ।

অসহ্য হয়ে উঠলো টুংরা নাথির, দূর থেকে সে চীৎকার ক'রে উঠলো,—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা !

প্রকাণ্ড একটা বোচকা পিঠে ঝুলিয়ে আদালতের সামনে দিকে এগিয়ে চললো টুংরা । কনেষ্টবল গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াতেই টুংরা তাকে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে জজ সাহেবের সামনে । আদালতকে শুনিয়ে কিপ্রকণ্ঠে আবার বলে উঠলো টুংরা,—মিথ্যে কথা—বিলকুল ওর মিথ্যে কথা হজুর, দা দিয়ে হুলো নাথিকে খুন করা হয় নাই, খুন করা হয়েছে তাকে টাঙ্গি দিয়ে ।

আকস্মিক একটা চাক্ষুশের ধাক্কায় আলোড়িত হয়ে উঠলো যেন সমগ্র বিচার-কক্ষ। এক মুখ দাড়ি, এক মাথা রুম্ব চুল, কাঁধে একটা কাঁড় ধরুক, পিঠে বোচকা—কে এই অদ্ভুত ধরণের কানা লোকটা? সকলেই একদৃষ্টে ই। ক’রে চেয়ে আছে টুংরার দিকে। টুয়াই নাহি দূর থেকে টুংরাকে দেখেই হঠাৎ চমকে উঠলো।

জজ সাহেব টুংরাকে দেখে বলে উঠলেন,—কে তুই?

টুংরা জবাব দিলে,—কে আমার—আমি টুংরা, ভালুকপোতার টুংরা নাহি।

—কি চাস এখানে?

জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন।

টুংরা নাহি বলে উঠলো,—চাই না আমি কিছুই, আমি শুধু বলতে চাই যে এই লোকটা মিথ্যাবাদী। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হুলো নাহিকে খুন করলুম আমি, আর ও বলে কিনা দা দিয়ে; বিলকুল ওর মিথ্যে কথা হজুর।

সকলেরি বিশ্বাসের নাত্রা যেন শেষ সীমা ছাপিয়ে উঠেছে। পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে দিয়ে এত বড় একটা দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে এরা এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলতে চায় কেন,—আশ্চর্য্য!

বিজ্ঞ বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন টুংরা নাহিকে,—হুলো যে তুই খুন করেছিস—এর কোন প্রমাণ আছে?

ঘাড় থেকে ঝোলাটা নামিয়ে তার ভিতর থেকে একখানা টাঙ্গি বের ক’রে হাকিমের সামনে ধরলে টুংরা, বললে,—বাঘ মেরে আমি এই টাঙ্গি তোদের কাছ থেকে বকশিশ পেয়েছিলুম, চিনে দেখ ঠিক সেই টাঙ্গি কিনা; এই দিয়েই আমি হুলো নাহিকে খুন করেছি। হুলো নাহির রক্তের দাগ আজো লেগে আছে টাঙ্গিতে, ভাল ক’রে চেয়ে দেখ।

জজসাহেব কোর্ট ইন্সপেক্টরের দিকে চেয়ে বললেন,—টাঙ্গিখানা কেমিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্ত রাখা হোক।

টুংরার হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি খানা কেড়ে নেওয়া হলো।

টুয়াই মাঝি হতবাক, সে হাসবে, না কাঁদবে? ছেলেটার কিন্তু সাহস আছে,—সত্য কথা বলবার সাহস আছে। টুংরার দিকে বিস্ময়ভাবে চেয়ে অক্ষুট স্বরে হঠাৎ নিজের মনেই একবার বলে উঠলো টুয়াই মাঝি,—সাবাস বেটা,—সাবাস!

কোরম্যান অব্ দি জুরি জজসাহেবের দিকে চেয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—লোকটাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি হজুর?

জজসাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন,—স্বচ্ছন্দে।

কোরম্যান প্রশ্ন করলেন টুংরা মাঝিকে,—হুলো মাঝির সঙ্গে আগে থেকে তোমার কি কোন বিবাদ ছিলো মাঝি?

টুংরা জবাব দিলে,—আগে আমি ওকে চিনতুমই না, ছুলালীকে বিয়ে করতে গিয়েই লোকটা আমার হাতে মারা পড়ে গেল। ছুলালীকে আমি ভালবাসতুম হজুর, হুলোকে তাই বরদাস্ত করতে পারিনি আমি কোন মতেই। ঘুরঘুটি অন্ধকার এক ঝড়েলীর রাত, কাঁদরের ধারে ধারে টাঙ্গি হাতে উঠলুম গিয়ে ছুলালীর কুঁড়ের সামনে; নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তখন হুলো মাঝি চালাঘরে পড়ে, চুপি চুপি টাঙ্গি দিয়ে দিলুম বেটার গলাটাকে একেবারে দু-ফাঁক ক'রে।

রাবণ মাঝি অবাক মেয়ে গেছে। হুলো মাঝিকে খুন করেছে টুংরা, না মোহন মাঝি? পাগলাটা হঠাৎ বলে কি!

জজসাহেব টুংরার জবাববন্দি নোট ক'রে যাচ্ছেন। টুংরা মাঝি বলে যেতে লাগলো;—ছুলালীর মেয়েটাকেও সেদিন খুন ক'রে ফেলতুম হজুর, কিন্তু পারলুম না, ওটা যে ভয়ানক কচি,—কোন মতেই পারলুম না।

জজসাহেব টেবিলের উপর কলমটা নামিয়ে রেখে তাকিয়ে  
জিজ্ঞাস করলেন,—সে মেয়ে কোথায়, তুই বলতে পারিস ?

টুংরা নিঃশব্দে বলে উঠলো,—কেনে পারবো না হজুর, আমি  
ওকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি সেই রাত্রেই, সেই থেকে ও বরাবর অ  
সঙ্গেই আছে। বাইরে আমি ওকে বসিয়ে রেখে এসেছি, নিয়ে আসবো ?

জজসাহেব তাকালেন একবার কোর্ট-বাবুর দিকে। উপযুক্ত পুলিশ-  
পাহারায় টুংরা মাঝিকে বাইরে যেতে দেওয়া হলো। আদালতের বটগাছের  
ছায়ায় ছালালীর মেয়েটা তখন বাবড়র সঙ্গে খেলা করছে। সামনে টুংরা  
গিয়ে ভালুকটার পাশে পিঠের বোচকাটা নামিয়ে রেখে স্বকুমারমণিকে  
ঘাড়ের ক'রে তক্ষুনি গিয়ে হাজির হলো আবার জজসাহেবের সামনে।

ছালালী কি স্বপ্ন দেখছে ? কাঠগড়ার কাঠাড ধরে ছালালী হঠাৎ  
ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো,—হু—হু—আমার হু !

থর থর ক'রে কাপতে কাপতে ছালালীর অবশ অঙ্গ এলিয়ে পড়লো  
হঠাৎ কাঠগড়ার উপর। রাবণ মাঝি গিম্ম তাড়াতাড়ি ছালালীকে ধরে  
ফেললে। মোহন মাঝি টুংরার কাছ থেকে মেয়েটাকে হুঁহাত দিয়ে  
জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ছালালীর বুকে গুঁজে দিলে। স্বকুমারমণিকে  
বুকের মধ্যে চেপে ধরে ডুকরে একবার কেঁদে উঠলো ছালালী।  
মোহন মাঝি ঘাড় নীচু ক'রে কাঠগড়ার পাশে দাঁড়ালো, চোখ দুটো  
তার ভরে উঠলো জলে। রাবণ মাঝি রক্তধাসে বুকের কাছে চেপে  
ধরে একটুখানি সরে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে হঠাৎ তাকালো একবার  
টুংরা মাঝি কাঠগড়ার দিকে ; ছালালী খুব বেঁচে গেছে আজ—ভয়ানক  
বেঁচে গেছে ; ভালই হয়েছে।

সদার রাবণ মাঝি কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে !  
বুকটা যেন তার অনেকখানা-হালকা হয়ে গেল, মেয়ে তার হলো

খুন করে নি,—টুংরা মাঝি প্রমাণ। বিচারকদের সামনে  
এগিয়ে গিয়ে রাবণ মাঝি হাত জোড় ক'রে ভারীগলায় বলে  
তোদের রাঘটা একবার শুনিযে দে হুজুর, মন খুলে একবার  
তোরা বুঝছিস,—আসামী ছালালী মেঝেন দোষী, কি নির্দোষ ?

জজসাহেব প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন একবার জুরি বাবুদের দিকে।  
মহোদয়গণ একসঙ্গে বলে উঠলেন,—নির্দোষ—নির্দোষ।

৫২ টং করে আদালতের ঘড়িতে চারটে বাজলো। জজসাহেব  
হাতের কাঠগড়ার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন,—আসামী ছালালী মেঝেন  
কম্বুর খালাস।

উজ্জ্বলিত অশ্রুর প্রবাহে রাবণ মাঝির চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠলো,  
ঐ তার ঝাপসা হয়ে আসছে।

জজসাহেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, যাবার আগে সামনের দিকে  
গেঁ তিনি বলে উঠলেন,—টুংরা মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হলো।

কোর্ট বাবুর ইঙ্গিতে আদালতের সেপাই এসে টুংরার হাতে হাত  
ড়া লাগিয়ে দিলে। কোমরে তার দড়ি বেঁধে আর একজন তাকে  
জ করে টেনে ধরলে পিছন দিক থেকে।

আদালতের কাজ শেষ। বিচার-কক্ষ খালি হয়ে গেল দু'এক মিনিটের  
বাই। ছালালীকে সঙ্গে নিয়ে মোহন গিয়ে বাইরে দাঁড়ালো।

টুংরাকে হাতকড়া দিয়ে হাজত-খানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশের  
পাক। বুদ্ধ টুয়াই মাঝির চোখ দুটো যেন ফেটে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন  
র বজ্রিণ নাড়িতে পাক দিয়ে উঠলো। টুংরাকে ওরা জেলে দেবে,  
ন কেন ফাঁসি—ফাঁসি কাঠে হয়ত লটকে দেবে টুংরাকে ; তারপর  
শেষ—তীরন্দাজ টুংরা মাঝি একেবারেই শেষ। টুয়াই মাঝি  
ভাবতে পারছে না, টুংরাকে যে কেরাবার আর কোন উপায়



নাই। করুণ ভাবে টুংরার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ টুংরাই মাঝি ভাঙা  
হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো,—টুংরা—টুংরা!

রাবণ মাঝি ভাড়াভাড়ি গিয়ে টুংরাই মাঝির সামনে দাঁড়া  
উল্কাভেদর বক্ত বলে উঠলো টুংরাই,—সদার—সদার—টুংরাকে ওরা  
নিয়ে গেল; জেল—জামি—দীপান্তর,—কাছাপানি—কালাপানি, ট

অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলে আদালতের বারান্দায়  
মুচ্ছিত হয়ে পড়লো টুংরাই মাঝি। রাবণ মাঝি চাদরের খুঁট নিয়ে টুংরা  
মাঝিকে হাওড়া করতে করতে তার কানের কাছে ডাক দিতে লাগলো  
—উত্তাজ—উত্তাজ!

টুংরা মাঝি বন্দী অবস্থার হেঁটে চলেছে পুলিশ পাহারার মাঝখানে।  
দেওয়ানী আদালতে আরগলীর হাঁক চলছে তখনো,—রাজারান মাহাতো  
হাজি—ব,—রাজারান মাহা—তো—!

টুংরা হঠাৎ জাকালো একবার পিছন কিয়ে। মোহন দার ছালা  
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার ঠিক সামনে, একদৃষ্টে ওরা করুণ ভাবে  
চেয়ে আছে টুংরার দিকে। যাক—এও ভাল, এর বেশি আর চার  
কি টুংরা! কিন্তু ছালাটা যদি একটু হাসতো,—টুংরার দিকে চেয়ে  
একটি বার শুধু একটুখানি হাসতো!

টুংরা এগিয়ে চললো। প্রকাণ্ড বটগাছটার সামনে গিয়ে থেকে একটু  
দাঁড়ালো টুংরা। বট গাছের শিকড়ের সঙ্গে লোহার ডেন দিয়ে বাঁধা  
ভালুকটার দিকে চোখ পড়তেই টুংরার চোখ ভুটো যেন ছল ছল  
ক'রে উঠলো; অতি করুণ ভাবে একটা ডাক দিলে টুংরা,—কাবড়ু!

আদালতের মেপোই পিছন দিক থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে,  
—চলো।



